আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

চতুর্থ সংস্করণ—১৯৭১
[প্রথম বাংলা একাডেমী সংস্করণ]
পৌষ, ১৩৭৮
[জানুয়ারী, ১৯৭১]

বাএ ৯১২
পাণ্ডুলিপি ঃ পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
[সংস্কৃতি বিভাগের সৌজন্যে]
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আবু আব্বাস
বিপাশা মুদ্রণ
৪৮, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১

AMADER MUKTI-SANGRAM (Our Freedom Struggle) : By Muhammad Waliullah, published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. Fourth Edition, January, 1971.

উনিশ শত একাত্তরের
আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে
আত্মোৎসর্গকারীদের
পুণ্যস্মৃতি স্মরণে

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ

সূচীপত্র

—মন্ত্রী মিশন—মন্ত্রী মিশনের উদ্দেশ্য—প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিরোধিতার কারণ—গণপরিষদের নির্বাচন—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস—কলিকাতার মহাদাঙ্গা—দাঙ্গার সূচনা—দাঙ্গায় ক্ষয়-ক্ষতি—বিহারে একতরফা দাঙ্গা—সীমান্ত গান্ধির প্রয়াস—অন্তবর্তীকালীন সরকার—লীগ প্রতিনিধিত্ব—গণ পরিষদের অধিবেশন—রাজন্যবর্গের উপর চাপ—প্রদেশ বিভাগে দাবী—স্বাধীন বাংলা—হাস্যকর ব্যবস্থা—র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ—চাকুরি ও সম্পদ বণ্টন—পরাধীনতার অবসান।

আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বিশাল ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বিধাতার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। ঐতিহাসিক যুগে তো বটেই, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগেও বিধাতার অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এদেশের প্রতি বিশ্ববাসীর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি প্রধানতঃ দুই প্রকারে এদেশের সহিত তাহাদের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছে—কেহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়া, আর কেহ বা বাহুবলে রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরূপে দ্রাবিড়, শক, হুন, আর্য, আরব, পাঠান, মোগল এবং সর্বশেষে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের আগমন ঘটে। এদেশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, এদেশের ভূমির উর্বরতা, স্বাস্থ্যের অনুকূল জলবায়ু, এদেশের হীরা-মণি-মাণিক্য, এদেশের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য এবং অনায়াসে জীবিকার্জনের অগণিত সুযোগ-সুবিধা আগন্তুকদিগকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আবহমান কাল হইতে প্রলুব্ধ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিদেশীয়দের মধ্যে সর্বশেষে আগত ইউরোপীয় খ্রীস্টানরা ব্যতীত অপরাপর সকলে তাই এদেশে স্থায়ীভাবে তাহাদের বসতি স্থাপন করিয়া কালক্রমে এদেশেরই স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। এদেশের জলবায়ু, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি তাহাদের দেহ ও মনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আজ আর তাহাদিগকে আলাদা করিয়া চিনিবার উপায় নাই।

পক্ষান্তরে বিদেশাগত খ্রীস্টানরা এদেশকে কখনও আপন মনে করিয়া লইতে পারে নাই। শাসন ও শোষণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, তদতিরিক্ত সম্পর্ক স্থাপনের কোন চেষ্টাও তাহারা করে নাই। তাই এই উপমহাদেশে একাদিক্রমে কয়েক শতাব্দী অবস্থানের পরও সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা

বিদেশীরই থাকিয়া যায়। অথচ দ্রাবিড়, শক, হুন, আর্য, মোগল, পাঠান, আরব, ইরানী, তুর্কী প্রভৃতি এদেশবাসীদের সহিত নানা সূত্রে এবং নানাভাবে মিশিয়া গিয়া একটি বিরাট জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মান্ধতা-বশতঃই হোক অথবা জাত্যাভিমানের জন্যই হোক, কিংবা শোষণের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত রাখার উদ্দেশ্যেই হোক্, খ্রীস্টানরা এই যুগধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত এবং শাসন-ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার বহু পূর্বে তাহাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠে। পূর্ববর্তীদের অনুকরণে খ্রীস্টানরাও যদি এদেশকে আপন করিয়া লইত, তাহা হইলে এদেশের হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পারশিক ও শিখেরা সম্মিলিতভাবে তাহাদের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইত কিনা তাহাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

এই সংগ্রাম যে শুধু দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল তাহাই নয়, কোন কোন পর্যায়ে ভয়াবহতার দিক্ দিয়াও ইহা ছিল সত্যই হৃদয়বিদারক। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই আমাদের ইতিহাসে মুক্তি-সংগ্রাম নামে অভিহিত। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান এই সংগ্রামেরই প্রত্যক্ষ দান। খ্রীস্টান-দেরই বিরুদ্ধে অথচ খ্রীস্টান বলিয়া নয়, বিদেশী বলিয়াই, এই সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল। সুতরাং বণিক হিসাবে এদেশে তাহাদের আগমন, অবস্থান, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে পৌণে দুইশত বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে প্রথমে কিছু বলা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায়, এই সংগ্রামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি না-ও হইতে পারে।

ইউরোপীয়দের আগমন

ভারত উপমহাদেশের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতি প্রাচীন। আফ্‌গানিস্তান, পারস্য, আরব, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ হইয়া স্থলপথে কিম্বা পারস্য ও আরবের কূল ঘেষিয়া জলপথে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য এদেশ হইতে ইউরোপে রফতানী হইত। ভেনিস ও জেনোয়া হইতে আবার এসকল দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইত। বিলি-বণ্টনের একচেটিয়া অধিকার বহু কাল ভেনিস ও জেনোয়াবাসীদেরই হাতে ছিল। পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীরা তাহাদের নিকট হইতে চড়া দামে এসকল দ্রব্য খরিদ করিত। কিন্তু উচ্চমূল্যেও অনেক সময় ইউরোপের

বাজারে ভারতীয় পণ্য পাওয়া যাইত না। কেননা, পশ্চিম এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে সেকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়শঃ, লাগিয়া থাকিত অথবা এই অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া দস্যু-তস্করের দল ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত।

পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির উপর অবশেষে আরবদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় রেষারেষি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। এই রেষারেষি শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ক্রুসেড অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের রূপ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বিজয়ী পক্ষ মুসলমান ছিল বিধায় ক্রমে ক্রমে ভারতের বহির্বাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাতছাড়া হইয়া পড়ে। সমুদ্রপথে সরাসরি ভারতে পৌঁছা যায় কিনা সম্পর্কে তখন হইতে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলিতে থাকে। একটি জলপথ সম্পর্কে পূর্ব হইতে তাহাদের একটা অস্পষ্ট ধারণাও ছিল। সেই ধারণারই বশবর্তী হইয়া কলম্বাস সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতে পৌঁছিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু তাঁহার আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে নূতন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টা জোরদার হইয়া উঠে।

কলম্বাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া স্পেন আমেরিকার একটি বৃহৎ অঞ্চল লাভ করিয়া প্রতিবেশী পর্তুগালের ঈর্ষার কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পৌঁছার পথ আবিষ্কারের জন্য পর্তুগালেই সর্বাধিক তোড়জোড় চলিতে থাকে।

পর পর কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর ১৪৯৭ সালে তদানীন্তন পর্তুগীজ রাজবংশোদ্ভব নাবিক ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল প্রদক্ষিণ করিয়া বহু কষ্টে ভারতের মালাবার উপকূলে কালিকট বন্দরে উপনীত হন। কালিকটের রাজা জামোরিন কয়েকটি শর্তে পর্তুগীজদিগকে তাঁহার রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তাহারা এসকল শর্ত পুরোপুরিভাবে কখনও পালন করে নাই। তত্রাচ প্রায় একশত বৎসর পর্তুগীজরা একচেটিয়াভাবে ভারতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া ইউরোপে বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

পরবর্তীকালে ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা লুণ্ঠনকার্যও চালাইতে থাকে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরব বণিকেরা উপকূল-বাণিজ্য হইতে বিতাড়িত হয়। সমুদ্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর পর্তুগীজরা আফ্রিকা, ভারত, এমন কি খাস আরব দেশেরও কয়েকটি স্থান দখলপূর্বক তথায় বাণিজ্যকুঠি, উপনিবেশ, সামরিক ঘাঁটি ও দুর্গাদি নির্মাণ করে। ব্যবসাবাণিজ্য অপেক্ষা লুণ্ঠন অধিকতর লাভজনক প্রতিপন্ন হওয়ায় অতঃপর এদিকেই তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়। তাহা ছাড়া এদেশে খ্রীস্টানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও তাহারা জোরক্রমে লোককে ধর্মান্তরিত করিতে থাকে। এই জঘন্য কার্যকলাপের জন্য তাহারা কালক্রমে এদেশবাসীদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য হইয়া পড়ে।

স্পেনীয়রাও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া অনুরূপ দুর্নাম অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু তবু ইহা একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, মধ্যযুগের ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনে ইহাদের উভয়ের উপরোক্ত দুইটি আবিষ্কারই সর্বাধিক কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী পন্থা হিসাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে এশিয়া ও আমেরিকার ধন-সম্পদের দ্বার ইউরোপবাসীদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের চিন্তাধারার সহিত এদেশবাসীর আরও সাক্ষাৎ ও ব্যাপক পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। বস্তুতঃ ইউরোপীয়দের আগমনই এদেশে মধ্যযুগের চির অবসান সূচিত করে।

পর্তুগীজদের দেখাদেখি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি জাতি এদেশে আগমন করে। ভারতের ছোট-খাটো স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ-রাজড়াদের মধ্যে কলহ-বিবাদের সুযোগ লইয়া তাহারা বিভিন্ন স্থানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টিত হয়। ইহাদের মধ্যে শক্তির দিক্ দিয়া ফরাসী এবং বুদ্ধি ও চাতুর্যের দিক দিয়া ইংরেজরাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমান ইংরেজের নিকট শক্তিমান ফরাসীকে হার মানিতে হইয়াছে। ইংরেজ বণিকদের ইতিহাসের এই অধ্যায় কৌতু-হলোদ্দীপক ও অগণিত মর্মস্পর্শী ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং ইহাতে এদেশীয়দের শিক্ষারও যথেষ্ট খোরাক রহিয়াছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

ভারতবর্ষে পৌঁছার সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের এক শত বৎসর পর ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের কতিপয় ব্যবসায়ী ত্রিশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করেন। পর বৎসর তাহারা ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে একখানি সনদ লাভ করিয়া ভারতের সহিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে প্রাপ্ত অপর একখানি অনুমতিপত্রের বলে ইহারা সুরাট বন্দরে তাহাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎ-কালীন ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই সর্বপ্রধান বন্দরে ইংরেজ কোম্পানীর আবির্ভাবকে সেদিন কেহ কোন গুরুত্বই প্রদান করেন নাই; বরং তাহাদের দারিদ্র্য দর্শনে অনেকে বিদ্রূপের হাসিই হাসিয়াছিলেন। কারণ, সুরাটে সে-সময় এমন বহু মুসলমান ও হিন্দু ব্যবসায়ী ছিলেন যাঁহাদের প্রত্যেকের মূলধন বিদেশী কোম্পানীগুলির সম্মিলিত মূলধনেরও বহুগুণ অধিক ছিল।

অর্থাভাবে ইংরেজ কোম্পানী প্রথম প্রথম সুরাটে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না। এজন্য তাহারা কালিকট, মসলিপট্টম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ওলন্দাজ কোম্পানীর বিরোধিতায় তাহাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে পারে না। ১৫২৩ খ্রীস্টাব্দে ওলন্দাজরা আম্বয়নাস্থিত ইংরেজদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলে পর ভারতেও তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। বিপদ কোন রকমে কাটাইয়া উঠিয়া কয়েক বৎসর পর ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাজপট্টমে কিছু পরিমাণ জমি ক্রয়পূর্বক তথায় একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। মালাবার এবং করোমণ্ডল উপকূলেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহারা সেসময় ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া যাইতে থাকেন। ব্যবসায়ে সততার জন্য এতদ্দেশীয় বণিক সম্প্রদায় তাহাদের সহিত সাগ্রহে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন। বাস্তবিকই ব্যবসায়ে সততাই ছিল ইংরেজদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই ছিল উত্তরকালে তাহাদের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রধান কারণ। এই খ্যাতি এখনও ইংরেজ ব্যবসায়িগণ অম্লান রাখিয়া চলিয়াছেন।

১৬৪৪ সালে দক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সম্রাট শাহজাহানের এক কন্যার পরিহিত বস্ত্রে হঠাৎ আগুন ধরিয়া যায় এবং ইহার ফলে তাঁহার

সর্বাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হইয়া পড়ে। দেশীয় চিকিৎসক ব্যর্থ হইলে পর, সম্রাট সুরাটস্থিত ইংরেজদের বাণিজ্য-কুঠির অধ্যক্ষকে একজন ইংরেজ চিকিৎসক প্রেরণ করিতে পত্র লিখিয়া পাঠান। বিচক্ষণ অধ্যক্ষ তাঁহাদের বাণিজ্য-পোত 'হোপ্‌ওয়েল'-এর সার্জন মিঃ গ্যাব্রিল বাউটনকে তৎক্ষণাৎ সম্রাটের শিবিরে প্রেরণ করেন। তাঁহার চিকিৎসায় শাহজাদী অতি অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। ডাঃ বাউটনের অনুরোধক্রমে গুণমুগ্ধ সম্রাট ইংরেজ বণিকদিগকে কতিপয় ক্ষেত্রে বিনা শুল্কে বাংলা দেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিয়া এদেশে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করিয়া দেন।

বাংলায় উপস্থিতি

ডাঃ বাউটন ১৬৪৪ সালের শেষভাগে সম্রাট শাহজাহানের ফরমান সহ বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হন। সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহ শুজা তখন বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার। ইহার প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে সুবাদার কাশিম খান লুণ্ঠনপ্রিয় পর্তুগীজদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদের হুগলীস্থ বাণিজ্যকুঠি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে বাংলা দেশে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার নষ্ট হইয়াই গিয়াছিল। ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে এই অচলাবস্থা নিরসনের জন্য মোগলরাও উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। পর্তুগীজদের শূন্যস্থান এইরূপে ইংরেজেরা কৌশলে পূর্ণ করিয়া লইলেন।

চিকিৎসা-খ্যাতির জন্য ডাঃ বাউটন শাহজাদা শুজার দরবারেও বিশেষ সম্মান এবং আদরের সহিত গৃহীত হন। এসময় শাহ শুজার পরিবারস্থ জনৈকা মহিলা কোন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। ডাঃ বাউটনের চিকিৎসায় ইনিও শীঘ্রই নিরাময় হইয়া উঠেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ শাহ শুজা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা নজরানার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লিখিয়া দেন। উত্তরকালে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ বণিকগণ ইহাকে মোগলদের মৃত্যু-পরোয়ানা হিসাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। সম্রাট শাহজাহান এবং তৎপুত্র সুবাদার শাহ শুজার ফরমান দুই খানি পকেটে পুরিয়া ইংরেজ কোম্পানী উহার বলে হুগলীতে একটি বাণিজ্য

কুঠি স্থাপন এবং পাটনায় একটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ব্যবসা-ক্ষেত্রে নানা সুযোগ-সুবিধা দান করিলেও মোগলেরা তাহাদের গতিবিধি ও কার্য-কলাপের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কারণ, পর্তুগীজদের ন্যায় ইংরেজদের বিরুদ্ধেও দস্যুবৃত্তির অভিযোগ প্রায়ই উত্থাপিত হইতে থাকে। অপরাধ প্রমাণিত হইলে সুবাদারগণ তাহাদের দ্রব্যাদি আটক, বাজেয়াপ্ত এবং জরিমানার ব্যবস্থা করিতেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ও বাংলার পরবর্তী সুবাদার মীর জুমলা পাটনা হইতে হুগলীগামী ইংরেজ বণিকদের যবক্ষার-বোঝাই কয়েকখানি নৌকা একবার সন্দেহক্রমে আটক করেন। হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ ইহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ীর একখানি মালবোঝাই নৌকা আটক করিয়া উহার মালপত্র স্থানান্তরিত করেন। মীর জুমলা কুঠিয়ালদের এই ঔদ্ধত্যে কুপিত হইয়া হুগলীকুঠি অধিকার করিতে আদেশ দেন। শাহজাহানের ফরমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রশ্ন জড়িত না থাকিলে ইংরেজদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার আদেশও হয়ত তিনি সেই সঙ্গে জারী করিতেন। হুগলীর কুঠিয়াল মীর জুমলার আদেশের বিষয় জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে আটক মালপত্র উহার মালিককে ফেরৎ দেন এবং মীর জুমলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সৎভাবে ব্যবসায় চালাইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্বক কোন রকমে রেহাই পান।

মীর জুমলার পরলোক গমনের পর আমিরুল ওমরাহ্ নওয়াব শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে মোগলদের সহিত আরাকান-রাজ্যের ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। শায়েস্তা খান হুগলীর কুঠিয়ালকে তাঁহার সাহায্যার্থে কতিপয় ইংরেজ গোলন্দাজ পাঠাইতে পত্র লিখেন। কুঠিয়াল অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর, শায়েস্তা খান তাঁহাকে ধমক দেন। ইংরেজদের ইহা একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে, তাহারা চিরকালই শক্তের ভক্ত। শায়েস্তা খানের ধমক খাইয়া কুঠিয়াল নিতান্ত বশংবদের ন্যায় কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেন এবং পূর্ব অসম্মতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বাংলা ত্যাগের কিছুদিন পূর্বে ১৬৭৭ সালে শায়েস্তা খান সম্রাট আওরঙ্গজেবকে দিয়া ইংরেজদের জন্য পুরাতন ফরমানগুলি

কোন কোন ক্ষেত্রে নবায়ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্বহাল করাইয়া লইয়াছিলেন।

শায়েস্তা খানের পর ফিদা খান এবং ফিদা খানের পর সম্রাটের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আজিম বাঙলার সুবাদার হইয়া আসেন। কোন এক ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানী মোহাম্মদ আজিমকে একুশ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান করিয়া নিজেদের স্বার্থের অনুকূল একটি কার্য করাইয়া লইয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে এজন্য পদচ্যুত করিয়া শায়েস্তা খানকে ১৬৭৯ সালে আবার সুবাদার করিয়া পাঠান। বস্তুতঃ নূতন নূতন ভাবধারা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজেরাই যে এদেশে উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতির আমদানী করিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করা যায় না। উৎকোচের সাহায্যে তাহারা এদেশে বহু ক্ষেত্রে তাহাদের নিশ্চিত পরাজয়কে নিশ্চিত জয়ে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন।

শায়েস্তা খানের দ্বিতীয়বার সুবাদারীর আমলে ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্য সীমা অতিক্রম করিতে থাকে। সেই সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া সুবাদার তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজেরা এদেশের রাজনীতিতে নিজেদের নাসিকা প্রবিষ্ট করাইবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। ১৬৬, সালে মিঃ হেজেজ্ নামক এক ব্যক্তি ইংরেজদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির প্রধান কর্মকর্তা হইয়া আসেন। জব চার্ণক তাঁহার অধীনে কাশিমবাজারস্থ বাণিজ্যকুঠির প্রধান নিযুক্ত হন। ইহাদের সময়ে আকবর নামক এক সুদর্শন যুবক নিজেকে আরাকানে নিহত শাহ শুজার পুত্র পরিচয় দিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আকবরের অনুচরেরা বিহার দখলের জন্য পাটনার নিকটে সিঙ্গি নামক স্থানে সমবেত হয়। ইংরেজেরা তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছেন জানিয়া, শায়েস্তা খান তাহাদিগকে যবক্ষার ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া পাটনা-কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ পিক্‌কে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টির সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, আর একবারের মত ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কোম্পানী ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা দ্বিতীয়

জেম্‌সের অনুমতিক্রমে ক্যাপ্টেন নিকোল্‌সনের অধিনায়কত্বে কয়েকখানি রণপোত ভারতবর্ষ অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। নিকোল্‌সনকে চট্টগ্রাম বন্দর দখল করিয়া উহা সুরক্ষিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাহার বেশীর ভাগ রণপোত ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে চট্টগ্রাম বন্দর দখল করা দূরে থাক্, উহা আক্রমণ পর্যন্ত করা হয় না। অতঃপর ক্যাপ্টেন নিকোলসনের মধ্যস্থতায় নওয়াবের সহিত একটা আপোষের কথাবার্তা চলে। কিন্তু ইংরেজদের গোঁয়ার্তুমির জন্য আলোচনা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় শায়েস্তা খান তাহাদিগকে সুতানটি হইতেও তাড়াইয়া দেন। ১৬৮৭ সালে জব চার্ণক নওয়াবের প্রদত্ত শর্তাদি স্বীকার করিয়া লইয়া এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার পুনরায় লাভ করেন।

ক্যাপ্টেন নিকোল্‌সনের অভিযানের ব্যর্থতা, ব্যবসায়ে ভীষণ ক্ষতি এবং জব চার্ণক কর্তৃক অবমাননাকর চুক্তি স্বীকারের কথা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে, ইংরেজ কোম্পানী 'ডিফেন্স' নামক একখানি রণতরী নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া ক্যাপ্টেন হীথ্ নামক একজন দুর্দান্ত নাবিকের পরিচালনাধীনে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ক্যাপ্টেন হীথ্ সুতানটি পৌঁছিয়াই স্থানীয় ইংরেজদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও মোগলদের সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ কোম্পানীর সমস্ত লোকজন এবং জিনিসপত্র লইয়া উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর গমন করেন। তথায় ইংরেজেরা স্থানীয় নিরীহ অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বাংলায় তাহাদের বিপর্যয়ের আংশিক ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অতঃপর আরও লুণ্ঠনের মানসে বালেশ্বর হইতে ক্যাপ্টেন হীথ্ চট্টগ্রাম উপনীত হইয়া দেখেন, উহা এত সুরক্ষিত যে, তথায় অবতরণের চেষ্টা করিলে তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ কারণে তিনি আরাকানে গমন পূর্বক আরাকান-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আরাকান-রাজ তাঁহার প্রস্তাবটি সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দেন। মোগলদিগকে ছাড়িয়া এবার ক্রোধান্ধ হীথ, আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এস্থানেও সাফল্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখিয়া অবশেষে হীথ্ ভগ্ন হৃদয়ে মাদ্রাজ রওয়ানা হইয়া যান। হীথের নির্বুদ্ধিতার ফলে এইরূপে বাংলায় ইংরেজদের কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। এদিকে তাহাদের উপর বিরক্ত

হইয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব ইতিমধ্যে মসলিপট্টম ও ভিজাগাপট্টমের বাণিজ্য কুঠি বাজেয়াফ্‌ত করিয়া লইয়াছিলেন। এদেশে কোম্পানীর বিচিত্র ইতিহাসে ইহাই তাহাদের সর্ববৃহৎ বিপর্যয়।

সুবাদার ইবরাহিম খান

নওয়াব শায়েস্তা খানের পর তাঁহার স্থলে বিখ্যাত মোগল সেনাপতি আলী মর্দান খানের পুত্র ইবরাহিম খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া আসেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে তিনি সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে উড়িষ্যায় বন্দী ইংরেজদিগকে মুক্তিদানপূর্বক চার্ণককে বাংলায় বাণিজ্যকুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লিখিয়া পাঠান। বাংলা হইতে বিতাড়িত হইয়া জব চার্ণক তখন মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন। তদনুসারে- ১৬৯১ সালে ইংরেজরা বাংলায় ফিরিয়া আসেন। এই যে তাহারা আসিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পূর্বে তাহাদিগকে আর এদেশ ছাড়িতে হয় নাই। জব চার্ণকের সময়ে তাঁহারই হাতে কলিকাতা নগরীর পত্তন হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মিঃ এলিস্‌ বাংলায় ইংরেজদের প্রধান কুঠিয়াল নিযুক্ত হন।

বাংলায় প্রত্যাবর্তনে পর ইংরেজদিগকে উপর্যুপরি দুইটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে আবার তাহাদের ব্যবসায়ে মন্দা নামিয়া আসে। ১৬৯৫ সালে কন্‌স্টান্টিনোপলের শেখুল্‌ ইসলাম সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জানান, ইংরেজরা তাঁহার সাম্রাজ্য হইতে যে বিপুল পরিমাণ যবক্ষার সংগ্রহ করে, উহা ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করা হয়। ইউরোপীয়রা উহা দ্বারা গোলাবারুদ তৈরী করিয়া তথায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। শেখুল্‌ ইসলামের অনুরোধে আওরঙ্গজেব যবক্ষার ক্রয় করিতে ইংরেজদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু আদেশ কার্যকর করিবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না। ফলে ইংরেজেরা সামান্য চড়া দামে গোপনে যবক্ষার ক্রয় করিয়া ইউরোপের বাজারে উহার নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

ঠিক এসময় ইংরেজ বোম্বেটে-সরদার ক্যাপ্টেন কীডের দৌরাত্ম্য এত চরমে উঠে যে, আওরঙ্গজেব তাহার বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য

হন। বোম্বেটে কীডের সঙ্গে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানিতে পারিয়া সম্রাট তাহার দমনের জন্য কোম্পানীগুলিকে চাপ দেন। একে একে সব বিদেশী কোম্পানী দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করেন। তাই সম্রাট এদেশবাসীকে ইউরোপীয়দের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়া এক ফরমান জারী করেন। হুগলীস্থ ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে বাংলার সুবাদারের কৃপা ভিক্ষা করায় তিনি একান্ত দয়াপরবশ হইয়া ইংরেজদের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। শিথিলতার এই ছিদ্রপথে ধূর্ত ইংরেজরা পুরাদমে ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে থাকেন।

সুবা সিংহ নামক বর্ধমানের জনৈক জমিদার তথাকার রাজাকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইহার পর উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠান রহিম খান এবং সুবা সিংহের অনুচরবৃন্দ হুগলীতে লুঠতরাজ চালায়। বিদেশীয় কোম্পানীগুলি নওয়াবের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে আপন আপন রক্ষা-ব্যবস্থা জোরদার করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে ফরাসীরা চন্দননগরে, ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় এবং ইংরেজেরা কলিকাতায় তাহাদের বাণিজ্যকুঠির চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ পূর্বক উহা সুরক্ষিত করেন। নওয়াবের এই অনুমতি পরবর্তীকালে প্রত্যাহৃত হওয়ার পূর্বেই ইহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

ইত্যবসরে রহিম খান ও সুবা সিংহ হুগলীর পর মালদহ এবং মালদহের পর রাজমহল অধিকার করায় সম্রাট বিরক্ত হইয়া ইবরাহিম খানের স্থলে স্বীয় পৌত্র আজিম উস-শানকে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইংরেজরা এই আরাম ও অর্থপ্রিয় সুবাদারকে প্রচুর নজর নিয়াজ প্রদান করিয়া সুতানটির বাণিজ্যকুঠিকে সুরক্ষিত করিবার অগ্রায় অনুমতি আদায় করেন। ইহার কিছুদিন পর তাহারা পুনরায় আজিম-উস্-শানকে মাত্র ষোল হাজার টাকা নজরানা এবং সেই সঙ্গে নানা দ্রব্য উপহার দিয়া সুতানটি, গোবিন্দপুর এবং কালিঘাট নামক গ্রাম তিনটি লাভ করেন। কিন্তু ব্যাপারটি এস্থানে শেষ হইল না। চোরাকারবারীদের স্থানীয় একটি দল ইংরেজদের অনুকরণে আজিম-উস্-শানকে মাত্র চৌদ্দ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান করিয়া উক্ত এলাকায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। সুযোগ বুঝিয়া স্থানীয়

জমিদার তাঁহার অধিকার হাতছাড়া করিতে অস্বীকৃত হন। এরূপে ব্যাপারটি ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া উঠিতে থাকিলে, সুচতুর ইংরেজরা চোরাকারবারী এবং জমিদারকে প্রচুর অর্থ দিয়া তাহাদের অন্যায়লব্ধ অধিকারকে আইনানুগ করিয়া লইয়া পাকাপোক্ত হইয়া বসেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেই বসিয়া তখন হইতে তাহারা ভারতবর্ষে নিজেদের একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার সত্যিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন।

এসময় কলিকাতায় মুসলমান জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার তথায় একজন মুসলমান কাজী (বিচারক) নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করেন। ইংরেজরা নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা হ্রাসের আশঙ্কা করিয়া ফৌজদারের অনেক খোশামোদ করিয়াও যখন তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটাইতে পারিলেন না, তখন আবার সুবাদার আজিম-উস্-শানের শরণাপন্ন হন। দুর্নীতিপরায়ণ সুবাদার এই দফায় আরও কিছু অর্থ আদায় করিয়া লইয়া ফৌজদারের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন। এইরূপে কলিকাতায় বিচারাচারের ভার ইংরেজ বণিক কোম্পানীর তখনকার মানদণ্ড অনুসারে, অর্ধশিক্ষিত এবং স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের হাতেই থাকিয়া যায়। এই বিগর্হিত ব্যবস্থা বহুদিন চালু ছিল।

ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসময় লণ্ডনে অপর একটি বণিকসঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু অচিরে উভয় কোম্পানীর মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যায়। ১৭০৫ সালে উভয় কোম্পানী একত্রিত হইয়া ইউনাইটেড্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম গ্রহণ করেন। স্বভাবতঃই এই মিলনের ফলে তাহাদের শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। কার্যতঃ, এসময় হইতে এদেশের রাজনীতিতে তাহাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ আরম্ভ হয়।

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাহাদুর শাহ্ (সুবাদার আজিম-উস্-শানের পিতা) সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। আজিম-উস্-শানের চেষ্টায় বাহাদুর শাহ্ সিংহাসন লাভ করায় তিনি তাঁহাকেই আবার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠান। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে অকর্মণ্য, সুবাদারকে সাহায্য করিবার জন্য দক্ষিণাত্য হইতে মুর্শিদ কুলী খানকে দেওয়ান করিয়া বাংলায় পাঠানো হয়। মুর্শিদ কুলি খান ইংরেজদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেন, শাহী ফরমানে

যাহাই লিখিত থাক্ না কেন, অপরাপরের ন্যায় তাহাদিগকেও বাণিজ্য শুল্ক দিতে হইবে। ইংরেজেরা ইহাতে বিচলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আলোচনা শেষ না হইতেই ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু ঘটে। আজিম-উস্-শান পিতৃ সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতে গিয়া নিহত হন। তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা শাহজাদা ফাররোখশিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খানকেই বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন।

বাঙলার মসনদে উপবিষ্ট হইয়া মুর্শিদ কুলি খান দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। সুবাদারকে কোন রকমে হাত করিতে না পারিয়া ইংরেজরা অগত্যা সম্রাট ফাররোখশিয়ারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলেন। এই প্রতিনিধি দলে উইলিয়ম হ্যামিল্টন নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি এবং সুনাম ছিল। সুবাদারের মতামতকে প্রাধান্য দিয়া সম্রাট হয়ত প্রতিনিধিদলকে শূন্য হাতেই বিদায় দিতেন, কিন্তু এসময় বিধাতা যেন আবার ইংরেজদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরে সম্রাট ফাররোখশিয়ারের সহিত উদয়পুরের মহারাণা অজিৎ সিংহের এক রূপসী কন্যার বিবাহ স্থিরকৃত হয়। বিবাহের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন সমাপ্ত-প্রায়, এমন সময় তরুণ সম্রাট এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। কাজেই বিবাহ অনিবার্য-রূপে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইয়া যায়। দেশীয় চিকিৎসকগণ সম্রাটের রোগের কোন কূল-কিনারাই করিতে পারিলেন না। অবশেষে সম্রাটের অন্যতম বিশ্বস্ত সভাসদ খান দুরাণের পরামর্শ অনুসারে উইলিয়ম হ্যামিল্টন তাঁহার চিকিৎসার জন্য দরবারে আহূত হন। তাঁহার চিকিৎসায় অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়া সম্রাট যথাসময়ে মহারাণার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

রাজপুত রমণীর প্রেমান্ধ সম্রাট এই উপলক্ষে হ্যামিল্টনকে বহু মূল্যবান উপহার দিয়া বলেন: "আপনি আর যাহা যাহা দাবী করিবেন তাহাও পূরণ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই নিন আমার প্রতিশ্রুতি-পত্র।" কৃতজ্ঞ সম্রাটের নিকট হইতে ব্ল্যাঙ্ক চেক্ লাভ করিয়া স্বজাতিবৎসল হ্যামিল্টন অক্ষরে অক্ষরে উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু

ব্ল্যাঙ্ক চেক্ প্রদান করিয়াই ফাররোখশিয়ার নিরস্ত থাকেন না'ই। অধিকন্তু এই অর্বাচীন সম্রাট সে-সঙ্গে একখানি ফরমানও জারী করিয়া ইংরেজ বণিকদিগকে কলিকাতার নিম্নে হুগলী নদীর উভয় তীরে আরও আটত্রিশ খানি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন। ইহার বিনিময়ে তাহাদিগকে বার্ষিক মাত্র আট হাজার একশত একুশ টাকা খাজনা প্রদানের কথা বলা হয়। সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান এই অনুমতির পরিণাম চিন্তা করিয়া সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে তিনি উহার বিরুদ্ধাচরণ করা সমীচীন মনে করেন নাই। ইংরেজেরাও মুর্শিদ কুলি খানকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। কাজেই সম্রাটের ফরমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সুবাদারীর আমলে তাহারা ইহা লইয়া কোন বাড়াবাড়ি করেন নাই। কিন্তু যে কোন কারণে সেই সময় তাহা না করা হইলেও, পরবর্তীকালে ইংরেজেরা প্রত্যেকটি সুযোগে এই ফরমানগুলি অন্যায়ভাবে কাজে লাগাইয়াছিলেন।

১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে অপুত্রক মুর্শিদ কুলি খানের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন অলিখিত উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। তাঁহার আমলে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ফাঁপিয়া উঠে। হুগলীর ফৌজদার একবার বিশেষ কোন এক কারণে ইংরেজদের সিল্ক-বোঝাই একখানি নৌকা আটক করিয়াছিলেন। ইংরেজরা এক দল সৈন্য পাঠাইয়া উহা প্রহরীদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসেন। এ সংবাদ সুবাদারের কর্ণগোচর হইলে তিনি ইংরেজদের সিল্ক-ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেন এবং অন্য শাস্তির কথাও চিন্তা করিতে থাকেন। কোম্পানীর ধূর্ত কুঠিয়াল তখন তাড়াতাড়ি একটা মোটা রকমের জরিমানা প্রদান এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নওয়াবের ক্রোধের উপশম ঘটাইয়াছিলেন।

নওয়াব শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খান সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার আমলে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি বাংলা হইতে রাজস্ব দাবী করিয়া পাঠাইলে পর সরফরাজ খান বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহা প্রদান করেন। তবে সরফরাজ খান ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশীয় বণিকদের নিকট হইতে ইহার একটা অংশ আদায় করিয়া লইয়াছিলেন।

আলিবর্দী খান

সুবাদার সরফরাজ খানের সেনাপতি আলিবর্দী খান তাঁহার দুর্বলচিত্ত প্রভুকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে সুবাদার হন। বর্গীদের দৌরাত্ম্য হইতে বাংলাকে রক্ষার জন্য তিনি বিদেশীয় কোম্পানীদের নিকট হইতে কয়েকবার মোটা টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নানা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও বর্গীরা একবার বাংলায় প্রবেশ করিয়া ব্যাপক-ভাবে লুঠতরাজ চালায় এবং বহু লোককে হত্যা করে। তাহাদের হাত হইতে কলিকাতা রক্ষার জন্য এ সময় ইংরেজেরা একটি খাদ খনন করেন। ইহা অধুনা মারহাট্টা খাদ নামে পরিচিত। দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার মানসে আলিবর্দী খান ব্যবসায়ী মাত্রকেই সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন। এ কারণে বিদেশীয় বণিকদের ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি সহৃদয়তার সহিত উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। ইংরেজদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিতেন, "ইংরেজেরাই এক দিন এদেশের মালিক হইবে।"

একবার নওয়াবের প্রধান সেনাপতি ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে তিনি বলেন: "স্থলে বর্গীরা যে-আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহা নিভাইবার ক্ষমতা আমার নাই, সমুদ্রের আগুন আমি কি প্রকারে নিভাইব?" কিন্তু ইংরেজদের প্রতি এই দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের গতিবিধির উপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' বলিয়া আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে যতটা সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে কুত্রাপি ততটা পরিদৃষ্ট হইবে? ইংরেজদের সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে, **Flag followed their trade** অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পতাকা তাহা-দের ব্যবসায়ের অনুগমন করিত। নিছক ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাহারা এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা তাহাদের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। ভারতের তৎকালীন স্বাধীন অর্ধ-স্বাধীন নওয়াব-সুবাদার ও রাজা

মহারাজাগণের অনুকরণে তাহারাও নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি, এদেশে তাহাদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত একাধিকবার বিপন্ন করিয়া তাহারা সেদিন যে-পথে পা বাড়াইয়াছিলেন, উহা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু অদম্য সাহস, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি ছল-চাতুরীর সাহায্যে তাহারা মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে সমর্থ হন। এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস ইংরেজদের পক্ষে যেমন গৌরবের, আমাদের পক্ষে তেমনি কলঙ্কময় ও বেদনাদায়ক।

সিরাজউদ্দৌলা

শোথ রোগে বৎসরাধিক কাল শয্যাগত থাকিয়া ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল সিংহ পুরুষ আলিবর্দী খান দেহত্যাগ করিলে পর তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। অপুত্রক আলিবর্দীর অন্যতমা কন্যা ঘসেটি বেগমের স্বামী এবং বাঙলার মসনদের অপর প্রার্থী নওয়াজিস মোহাম্মদের ইতিপূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। কাজেই মসনদে উপবেশনের সময় সিরাজ-উদ্দৌলাকে মোটেই কোন বেগ পাইতে হয় নাই। চিররুগ্ন নওয়াজিস মোহাম্মদ ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার সহকারী ও দেওয়ান। নওয়াজিস মোহাম্মদের মৃত্যুর সময় রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদে ছিলেন। নওয়াব আলিবর্দী খান তখন রোগশয্যাশায়ী—রাজকার্য পরিচালনার ভার ছিল সিরাজদ্দৌলার উপর। নওয়াজিসের মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা রাজবল্লভের নিকট হিসাবপত্র তলব করেন। রাজবল্লভকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া হিসাব-নিকাশ প্রধান সাপেক্ষে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার ঢাকাস্থ ধনসম্পত্তি আটকের আদেশ দেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ইহা জানিতে পারিয়া আদেশ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই গঙ্গা-স্নানের ভান করিয়া সরকারী এবং অবৈধ-ভাবে সংগৃহীত ধনরত্নসহ পলায়ন পূর্বক ১৭৫৬ সালের ১৭ই মার্চ কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবল্লভের পলায়নের সংবাদ সিরাজউদ্দৌলার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি কলিকাতার

গভর্নর মিঃ ড্রেকের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া কৃষ্ণ বল্লভকে তাঁহার হস্তে সমর্পণের নির্দেশ দেন। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও নওয়াবের অন্যতম সভাসদ জগৎশেঠ মাহতাব চাঁদের পরামর্শ অনুসারে মিঃ ড্রেক সিরাজউদ্দৌলার আদেশ পালন করিলেন না। নওয়াব আলিবর্দী খানের অন্তিমকাল, সিংহাসন প্রাপ্তি সম্পর্কে সিরাজের তখনও সন্দেহ-সংশয় ছিল। একারণে যৌবনের সহজাত ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি মিঃ ড্রেকের ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে অসীম ধৈর্য সহকারে বিরত থাকেন। এই দুর্বলতাই মাত্র এক বৎসর পর তাঁহার পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়ায়।

আলিবর্দী খানের সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণে সিরাজ রাজকার্যে বেশ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়াই হোক, অথবা সিরাজের বিরুদ্ধে নওয়াজিস মোহাম্মদের সহিত তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ার জন্যই হোক, কুচক্রী সভাসদগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাই তাঁহারা নওয়াজিস মোহাম্মদের অকাল মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা ও আলিবর্দী খানের অপর এক দৌহিত্র শওকত জঙ্গকে সুবাদার করিবার চক্রান্ত করেন। তাহাদেরই উস্কানীতে আলিবর্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শওকত জঙ্গ নিজেকে সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাহার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে শওকত জঙ্গ নিহত হন। এই ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ এবং সেই সঙ্গে তাহাদের নাম দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়া পড়ায় সিরাজের প্রতি সভাসদগণের ক্রোধ ও ঈর্ষা আরও বাড়িয়া যায়। সুতরাং নূতনভাবে আবার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজদের অজানা থাকে না এবং তাহারা ইহাতে উস্কানী যোগাইতে ও পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

কৃষ্ণ বল্লভের ব্যাপারে মিঃ ড্রেকের ঔদ্ধত্যের জন্য একদিন তাহাদিগকে জওয়াবদিহি করিতে হইবে ইহা ইংরেজরা জানিতেন। স্থির মস্তিষ্কে সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা চিন্তার পর শেষ রক্ষাব্যবস্থা হিসাবে তাই তাহারা পূর্বচুক্তির শর্তাবলীর ব্যতিক্রমে সিরাজউদ্দৌলার নিষেধ সত্ত্বেও কালকাতা দুর্গের সংস্কার ও সম্প্রসারণ সাধন করেন। এবার সিরাজের ধৈর্যচ্যুতি

ঘটে। তিনি কালক্ষেপ না করিয়া ইংরেজদের কাশিমবাজারস্থিত বাণিজ্য-কুঠি এবং কলিকাতা অধিকার করিয়া লইলেন। আলিবর্দীর নামানুসারে কলিকাতার নূতন নাম রাখা হয় আলিনগর। অতঃপর কলিকাতার অন্যতম মহাজন এবং জগৎশেঠ মাহতাব চাঁদের এজেন্ট আমিন চাঁদের (উমি চাঁদ) উপর ইহার শাসনভার অর্পণ করিয়া সিরাজ রাজধানী মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় আমিন চাঁদের নিজস্ব লগ্নী ব্যবসায় ছিল।

কলিকাতার ইংরেজদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাহাদের নৌ সেনাপতি ওয়াট্সন এবং স্থলবাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্লাইভ কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ মাদ্রাজ হইতে বাংলায় পৌঁছিয়া আমিন চাঁদকে বশীভূত করিয়া বিনা যুদ্ধে কলিকাতা পুনরধিকার করেন। ক্লাইভ এককালে কোম্পানীর একজন কেরাণী ছিলেন। কর্ণাটে ফরাসী ও চাঁদ সাহেবকে পরাজিত করিয়া ইতিপূর্বে তিনি তথায় ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। কলিকাতা পুনরধিকারের পর উভয় পক্ষে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, সিরাজ উহার প্রত্যেকটি শর্ত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিতে থাকেন। অপর পক্ষে ইংরেজেরা সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির জন্য আমিন চাঁদের মাধ্যমে দরবারের অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং রক্ষা করেন।

এ সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধে। কলিকাতার ইংরেজেরা সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন এবং সিরাজের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়া হুগলীর ফৌজদার মহারাজা নন্দকুমারকে বশীভূত করিয়া ফরাসীদের বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করেন। ইংরেজদের এই গর্হিত আচরণের জন্য সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বেই সিরাজ জানিতে পারেন, তাহারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছেন। অগত্যা সিরাজও তাঁহার বিশাল বাহিনী সহ পলাশী প্রান্তরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। সিরাজ তখনও বুঝিতে পারেন নাই, জগৎশেঠ, মাহতাব চাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি ইয়ার লতিফ, মহারাজা নন্দকুমার, আমিন চাঁদ, সেনাপতি রায় দুর্লভ এবং সেনাপতি মীর জাফর আলি খান গোপনে ইংরেজদের সহিত এইমর্মে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন যে, তাঁহার পরাজয়

ও অপসারণের পর মীর জাফর বাঙলার নওয়াব হইবেন। মীর জাফর প্রথম জীবনে গৃহভৃত্য হিসাবে নওয়াব আলিবর্দী খানের আশ্রয়ে থাকিয়া বক্‌শীর পদ লাভ এবং পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন। সিরাজ তাঁহাকে সেই পদেই রাখিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। পাকিস্তানে বহু অন্যায়ের উৎস এবং উহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট জনাব ইস্কান্দার মীর্জা ইঁহারই বংশধর। আইয়ুব খান ইঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেই প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ

সিরাজের সৈন্যরা পলাশী প্রান্তরের যেস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন ক্লাইভ উহার বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি আম্রকুঞ্জে তাঁহার সৈন্যসহ স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীর জাফরের দুষ্ট অভিপ্রায়-প্রসূত পরামর্শে সিরাজ স্বদীয় সেনাপতি দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ এবং তাঁহাকে রক্ষণভাগে রাখিয়া সেনাপতি মীর মর্দান, সেনাপতি সিনফ্রেঁ এবং স্বীয় প্রিয় বন্ধু রাজা মোহনলালকে আক্রমণভাগে সৈন্য পরিচালনার জন্য পাঠাইয়া দেন। সুযোগ মত পশ্চাৎ দিক হইতে ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ইংরেজদের জয় সুনিশ্চিত করিয়া তোলাই ছিল মীর জাফরের লক্ষ্য। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন প্রাতে ৮টায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নওয়াব সৈন্যের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরেজ সৈন্যরা পলায়ন করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় তাহাদের একটি গোলার আঘাতে সেনাপতি মীর মর্দান মারাত্মকভাবে আহত হইয়া শিবিরে নীত হন। মোহনলাল তখন আগাইয়া যাইয়া তাঁহার স্থান গ্রহণ পূর্বক ইংরেজদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। মোহনলাল ও সেনাপতি সিনফ্রেঁ যুদ্ধ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ নওয়াব শিবিরে এক মহা অনর্থের সূত্রপাত হয়।

প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ এতক্ষণ সেনাপতি মীর জাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায় দুর্লভরাম নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোন আদেশ-নির্দেশের অভাবে তাঁহাদের পরিচালনাধীন

সৈন্যরাও নীরব দর্শকেরই ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিল। যুদ্ধের এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে প্রধান সেনাপতিকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সিরাজউদ্দৌলার মনে ষড়যন্ত্রের কথা জাগিয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ মীর জাফরকে তাঁহার শিবিরে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে স্বীয় মুকুটটি রাখিয়া বাংলার স্বাধীনতার নামে উহার সম্মান রক্ষার জন্য আকুল আবেদন জানান। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর তখন সিরাজকে মিথ্যা অভয় দিয়া সৈন্যদের বিশ্রামের জন্য আপাততঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে পরামর্শ দেন। অতঃপর নওয়াবের পুনঃ পুনঃ আদেশে মোহনলাল ও সিনফ্রে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করা মাত্রই কোন এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় যুদ্ধরত সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। সুযোগ বুঝিয়া (কাহার কাহার মতে মীর জাফরের ইঙ্গিতে) ইংরেজ সৈন্যরা তখন ভীমবেগে নওয়াবের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। এইরূপে নওয়াবের নিশ্চিত জয় মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ পরাজয় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

ঠিক এসময় মীর জাফরের শিবিরেও বিজয়বাদ্য বাজিয়া উঠে। সন্ত্রস্ত সিরাজ যদি তখনও একবার শিবিরের বাহিরে আসিয়া সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে মীর জাফর তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে কিছুতেই নিরস্ত রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু সরলপ্রাণ নওয়াব এতটা ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি মোহন লাল কিংবা সিনফ্রে'র আগমনের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী রায় দুর্লভরামের কুপরামর্শ অনুসারে মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি উষ্ট্রপৃষ্ঠে পলাশী ত্যাগ করেন।

পলাশীতে সিরাজের পরাজয়ের দুঃসংবাদ ইত্যবসরে মুর্শিদাবাদে প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাই সন্ধ্যার কিছু পরে মুর্শিদাবাদ পৌঁছিয়া সিরাজ তদীয় পত্নী লুৎফুন্নেসা, কন্যা জোহরা এবং দুই জন বিশ্বস্ত ভৃত্য সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে রাজমহলের উদ্দেশে হীরাঝিল প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। রাজমহল এককালে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। সিরাজের মাতা আমিনা বেগম এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা মেহেদী হীরাঝিল প্রাসাদেই থাকিয়া যান। সিরাজের

নৌকাখানি মালদহ জেলার ভগবান গোলার নিকটবর্তী হইলে, বিশ্রামের জন্য তাঁহারা তীরে একটি মস্‌জিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত মস্‌জিদের মোতওয়াল্লী দানিশ শাহ্ মন্দ স্বভাবের জন্য এক বৎসর পূর্বে সিরাজ কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিল। সে সিরাজকে চিনিতে পারিয়া মালদহের ফৌজদার এবং মীর জাফরের ভ্রাতা দাউদ খানকে সংবাদ পাঠায়। হাতের কাছে অনায়াসলব্ধ শিকার পাইয়া দাউদ খান সিরাজকে সপরিবারে বন্দী করিয়া মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমের হেফাজতে তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। পলায়নের অষ্টম দিবস বন্দী অবস্থায় সিরাজ মুর্শিদাবাদে আনীত হন। সে রাত্রেই মীরজাফর-তনয় পাপিষ্ঠ মীরণের নিষ্ঠুর আদেশে নওয়াব আলীবর্দী খানের অন্নজলে প্রতিপালিত, নিমকহারাম মোহাম্মদী বেগ জাফরগঞ্জ প্রাসাদের একটি নির্জন কক্ষে অত্যন্ত নৃশংসভাবে সিরাজের মস্তক তাঁহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। পলাশী-প্রান্তরে আট দিন পূর্বে বাংলার যেই স্বাধীনতা সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, ৩রা জুলাই তাহা এক শত নব্বই বৎসরের জন্য এইরূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়।

এদিকে সিরাজউদ্দৌলার পলায়নের পর মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে ক্যাপ্টেন ক্লাইভ ও সিরাজের নিমকহারাম সভাসদগণের উপস্থিতিতে মীর জাফর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ঘোষিত হন। মীর জাফর অতঃপর ক্লাইভের সহিত পরামর্শ করিয়া সিরাজের ধনাগার লুণ্ঠন করেন। এই সরকারী ধনাগারে এক কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, চারি বাক্স হীরা-জহরৎ এবং দুই বাক্স চুনী-পান্না ইত্যাদি পাওয়া যায়। ইহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকা নৌকাযোগে কলিকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে প্রেরিত হয়। উপরন্তু সুবাদারী পদের মূল্য স্বরূপ মীর জাফরের নিকট হইতে ইংরেজেরা এই সময় আরও সাড়ে তিন কোটি টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। এই হিসাবের মধ্যে ক্লাইভ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে প্রদত্ত ঘুষের টাকা ধরা হয় নাই। মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের একটি গোপন স্থানে যেই আট কোটি টাকা লুকায়িত ছিল, ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ ত্যাগের পর মীর জাফর তদীয় পত্নী মণি বেগম, আমির বেগ খান, রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ প্রমুখ আরও কয়েকজন নিজেদের মধ্যে তাহা ভাগ-বাটোয়ারা

করিয়া লইয়াছিলেন। রাতারাতি এইরূপে কে কেমন বড় লোক হইয়া পড়িয়াছিলেন পরবর্তী দুইটি উদাহরণ হইতে তাহা বুঝা যায়:

মীর জাফরের দেওয়ান রামচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময় মাসিক ৬০ টাকা বেতনে নওয়াব সরকারের কার্য করিতেন। দশ বৎসর পর মৃত্যুকালে তিনি নগদে এবং হুণ্ডিতে ৭২ লক্ষ টাকা, ৮০টি স্বর্ণ-কলস এবং তিন শতের উপর রৌপ্য-নির্মিত কলস রাখিয়া যান। নবকৃষ্ণও সিরাজের আমলে ৬০ টাকা মাহিনার একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। লুণ্ঠিত অর্থে অন্যান্যরাও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া রাখিয়াছিলেন।

সিরাজ পরিবারের হত্যা

নিজের এবং স্বীয় পুত্র-পৌত্রাদির জন্য বাংলার মসনদ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে মীর জাফর আলির আদেশে সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ-পরিবারের সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ও মাত্র ১২ বৎসর বয়স্ক বালক মির্জা মেহেদীকে দুই খণ্ড তক্তার নিষ্পেষণে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়। ইহার কিছুদিন পর আলিবর্দী-কন্যা ঘসেটি বেগম ও সিরাজের মাতা আমিনা বেগম ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদের পথে পদ্মার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া মীর জাফরের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটান। প্রকাশ, সিরাজ-তনয়া জোহরাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা এবং লুৎফুন্নেসাকে মুর্শিদাবাদে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। লুৎফুন্নেসা জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কবরের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত করেন।

ইংরেজদের সহায়তায় মীর জাফর নওয়াব হইলেন, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য রাজকোষও উজাড় করিয়া দিলেন, কিন্তু এত করিয়াও তিনি রেহাই পাইলেন না। ইংরেজদের ছোট বড় সকলে নিত্যনুতন দাবী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে থাকেন। মীর জাফরও সাধ্যমত তাহাদের দাবী মিটাইতে লাগিলেন। অর্থাভাবে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তদুপরি ইংরেজেরা শাসনকার্যেও অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। সিরাজউদ্দৌলার পতন

ও মীর জাফর কর্তৃক মসনদে উপবেশনের ব্যাপারটি যাহারা মামুলীভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের অলক্ষ্যে ইংরেজেরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশের মালিক হইয়া বসিয়াছেন—মীর জাফর তাহাদের একজন ক্রীড়নক মাত্র।

পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা স্বদেশগতপ্রাণ খাদিম হোসেন সর্বাগ্রে ইংরেজ বিতাড়নের সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি মীর জাফরের আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়ায়, ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন নক্স এবং মীরণ দুই দল সৈন্যসহ পূর্ণিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সম্মিলিত বাহিনীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না চিন্তা করিয়া খাদিম হোসেন তাঁহার ধনরত্নসহ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন। ক্যাপ্টেন নক্স এবং দুশ্চরিত্র মীরণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পর দিন প্রাতে মীরণের শিবিরের উপর বজ্রপাত হয়। আকাশে কোথাও একখণ্ড ভাসমান মেঘ পর্যন্ত ছিল না। বজ্রাঘাতের ফলে মীরণ তাঁহার কতিপয় অনুচরসহ সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন। বাংলা দেশে জনশ্রুতি আছে, সিরাজ-মাতা আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগমকে যখন পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁহারা মীরণকে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়াছিলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের দৃষ্টান্ত অন্ততঃ এদেশে আর নাই।

অত্যাচারী মীরণের মৃত্যু সংবাদকে মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা বিধাতার একটি আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া নানাভাবে তাহাদের আনন্দ ব্যক্ত করিল। বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ বলপূর্বক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া দেয়, লুক্কায়িত স্থান হইতে মীর জাফরকে বাহির হইয়া আসিতে বলে এবং হেরেমের মহিলাদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালিবর্ষণ করে। এ সময় মীর কাশিম আলি হঠাৎ তথায় আসিয়া না পড়িলে মীর জাফরের প্রাণ রক্ষা পাইত কিনা সন্দেহ। মীর কাশিম এবং হেরেমের মহিলারা তাহাদের নিকট বারংবার করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পর জনতা শান্তভাব ধারণ করে। এদিকে রাজপ্রাসাদ আক্রমণের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের বহু স্থানে লুঠপাট আরম্ভ হইয়া যায়।

মীর কাশিমের চেষ্টায় তিন দিন পর শহরে শান্তি ফিরিয়া আসে। বাংলা দেশে ইহাই বোধহয় প্রথম গণ বিক্ষোভ। কিন্তু ইহাতেও মীর জাফরের টনক নড়ে না।

বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুর আচরণ ও শাসনকার্যে অযোগ্যতার জন্য মীর জাফর আপামর সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়েন। মুর্শিদাবাদের গণ-বিক্ষোভের পর ইংরেজরা বুঝিতে পারেন, মীর জাফরকে জোর করিয়া মসনদে উপবিষ্ট রাখিলে সমগ্র দেশব্যাপী গণ-বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।

অধিকন্তু তাহাদের নিত্য নূতন দাবী মিটাইবার ক্ষমতাও তাঁহার আর অবশিষ্ট ছিল না। এই অবস্থায় কাউন্সিল নামক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ পরিচালক বোর্ড তাঁহাকে অপসারিত করিয়া তৎস্থলে তাঁহার জামাতা মীর কাশিম আলিকে মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মীর কাশিম মসনদের মূল্য বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহার পর কর্ণেল ক্যালাডের পরিচালনাধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া মীর জাফরের প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহার আত্মসমর্পণের দাবী জানায়। মীর জাফর নখর-দন্তহীন সিংহের ন্যায় কিছুক্ষণ তর্জন গর্জন করিয়া অগত্যা কর্ণেল ক্যালাডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সেদিনই তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া কলিকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মীর কাশিম আলিকে ১৭৬০ সালের ৩০শে অক্টোবর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করেন। কলিকাতার মীর্জাপুর নামে অভিহিত এলাকায় একটি দ্বিতল বাড়ীতে মীর জাফর নির্বাসনে আয়ু ও পাপ ক্ষয় করিতে থাকেন। মীর জাফরেরই নামানুসারে ইংরেজেরা এই এলাকার নাম দেন মীর্জাপুর।

মীর কাশিমের সুবাদারী

মীর কাশিম আলি খানের পিতামহ গুজরাটের গভর্ণর এবং তাঁহার পিতা দিল্লী দরবারের একজন বিশিষ্ট আমীর ছিলেন। তিনি মীরণের সহোদরার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার গ্রেফতারের ব্যাপারে ইনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ পূর্বক যে পাপ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি

আজীবন অনুতাপ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ বলেন: "মীর কাশিম অত্যন্ত কর্মঠ, কর্মদক্ষ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারের খুঁটিনাটি পর্যন্ত তিনি খোঁজ-খবর রাখিতেন। তিনি তাঁহার দেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি এত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, কোন অবস্থায় পরম শত্রুর প্রতিও অবিচার হইতে দিতেন না। কিন্তু রাজস্ব এবং বিচার বিভাগেই তিনি সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজদের অনুগ্রহে তিনি মসনদে উপবেশন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মন্দ স্বভাব ও অশোভন আচরণের জন্য তাহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। বিপদে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন, ইহাই ছিল তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান দুর্বলতা।"

মীর কাশিম আলিকে দিয়া যে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার নয় ইহা বুঝিয়া লইতে ইংরেজদের কয়েক সপ্তাহের অধিক সময় লাগে নাই। কাজেই কালবিলম্ব না করিয়া ইংরেজেরা তাঁহার অপসারণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। শিঘ্রই উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও বিহারে যবক্ষারের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তবে ইহাও কথা ছিল যে, নওয়াব স্বীয় প্রয়োজনে বৎসরে কুড়ি হাজার মণ যবক্ষার খরিদ করিতে পারিবেন। একবার নওয়াবের জনৈক কর্মচারী প্রকাশ্য বাজার হইতে নওয়াবের জন্য পাঁচ মণ যবক্ষার ক্রয় করায় পাটনা-কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ এলিস ইহাকে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ অভিহিত করিয়া উক্ত কর্মচারীকে লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কলিকাতা কাউন্সিলের বেশীর ভাগ সদস্য ধৃত কর্মচারীকে প্রকাশ্যস্থানে বেত্রাঘাত করিয়া তাহার কান দুইটি কাটিয়া দিতে আদেশ দেন। ১৭৬১ সালের মধ্যভাগে এই বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হয়। নিজের দেশে তাঁহার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া মীর কাশিম তখনই প্রতিজ্ঞা করেন, যে কোন প্রকারে হোক, তিনি ইংরেজদের হাত হইতে এদেশের উদ্ধার করিবেনই। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মীর কাশিম তাঁহার প্রতিজ্ঞায় অচল-অটল ছিলেন। কিন্তু দেশোদ্ধার তিনি করিতে পারেন নাই।

যবক্ষারের ব্যবসায়ের ন্যায় বাণিজ্য শুল্কের ব্যাপারেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। কালক্রমে কোম্পানীর প্রত্যেকটি কর্মচারী কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন। কোম্পানীর ন্যায় তাহারাও নওয়াব-সরকারে কোন শুল্ক দিতেন না। ফলে প্রতিযোগিতায় দেশীয় বণিকেরা হার মানিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় হইতেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে থাকেন। নওয়াবের প্রধান আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার ফলে অর্থাভাবে শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠে। নওয়াব কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্যবর্গের শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন জানাইলেন। কিন্তু কোন ফল তো হইলই না বরং তাঁহার শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদের উপর নূতন নূতন বিপদ ও উৎপীড়ন নামিয়া আসিল। নওয়াব অসীম ধৈর্য সহকারে ইহার পরও ইংরেজদের সহিত আপোষ-মীমাংসার কথাবার্তা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই ইংরেজেরা স্থির করেন তাহারা নওয়াবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্যায় জেদ ও অধিকার বজায় রাখিবেন।

গোপনে এ-সংবাদ পাটনায় মিঃ এলিসের নিকট প্রেরিত হওয়া মাত্রই তথাকার সৈন্যরা মিঃ এলিসের পরামর্শে পাটনা দখল করিয়া লইয়া ভীষণ লুঠতরাজ এবং বহু নিরীহ লোককে হত্যা করে। অসতর্ক মীর কাশিম পাটনার পুনরুদ্ধারের জন্য তাড়াতাড়ি সেনাপতি মার্কারকে পাঠাইয়া দেন। নওয়াব-সৈন্যের আগমনের কথা শুনিয়া ইংরেজ সৈন্যরা অযোধ্যার দিকে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে মাঞ্জী নামক স্থানে পেঁছিলে, নওয়াব-সৈন্য তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। বন্দী ইংরেজদিগকে পাটনা আক্রমণ, দখল, লুঠতরাজ ও নরহত্যার অপরাধে প্রচলিত আইন-স্বীকৃত কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একখানি চিঠি—

মীর কাশিম ১৭৬৩ সালের ২৮শে জুন কলিকাতার গভর্ণরকে এসম্পর্কে নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন—

"মিঃ এলিস আমার প্রাণের দুশমন, ইহাই এতকাল আমার ধারণা ছিল। কিন্তু তাহার কার্যদৃষ্টে মনে হয়, তিনি আমার সত্যিকারেরই বন্ধু

ছিলেন। আপনাদের বে-আইনী চালানের যে তিন শত বন্দুক আমি আটক করিয়াছিলাম, উহার একটিও আমাকে দিতে আপনারা রাজী হন নাই। কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ হতভাগ্য এলিস একটি অহেতুক সংঘর্ষ বাধাইয়া পরাজিত ইংরেজ সৈন্যদের বন্দুক, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। আপনারা তাঁহার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন, আমার সৈন্যরা তাঁহাকে উহা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছে।"

——"বন্ধুগণ! আপনারা সত্যই এক আজব চীজ। যিশু খ্রীস্টের নামে শপথ করিয়া আপনারা আমার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের সৈন্যদের মাহিনা দেওয়ার জন্য আপনারা আমার নিকট হইতে একটি বিরাট এলাকা পর্যন্ত লইয়া গেলেন। কথা ছিল, ইহারা আমারই স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাইতেছে, আমার ধ্বংসের জন্যই আপনারা ইহাদিগকে আমার অর্থে পুষিয়া আসিতেছেন। ইহারা ইতিমধ্যে আমার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সুতরাং আমি আশা করি, উক্ত এলাকার গত তিন বৎসরের রাজস্বটা আপনারা আমার সরকারে দাখিল করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত গত কয় বৎসর পর্যন্ত ইংরেজ গোমস্তারা আমার দেশবাসীর উপর যেই অত্যাচার চালাইয়াছে এবং অন্যায়ভাবে তাহাদের নিকট হইতে যেই অর্থ আদায় করিয়া লইয়াছে, উহার ক্ষতিপূরণও আপনারা আমাকে দিবেন এবং সেসঙ্গে বর্ধমান ও অন্যান্য স্থান আমাকে ফেরৎ দিবেন।"

পাটনার ঘটনার পর যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি মীর কাশিম আবার আপোষের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইংরেজদের হঠকারিতার জন্য তাঁহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল না। তিন বৎসর পূর্বে যাঁহাকে অকর্মণ্য, অনুপযুক্ত, অথর্ব প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিয়া ইংরেজেরা জোরক্রমে গদীচ্যুত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মীর জাফরকেই তাহারা হঠাৎ আবার মীর কাশিম আলির স্থলে বাংলার সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইহার বিনিময়ে প্রভুভক্ত মীর জাফর স্বীয় জামাতা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর যাবতীয় ক্ষতির পূরণ, ইংরেজদের স্থল বাহিনীকে ২৫ লক্ষ এবং নৌ-বাহিনীকে সাড়ে

১২ লক্ষ টাকা বক্‌শিশ দিতে প্রতিশ্রুত হন। বলা বাহুল্য, ইংরেজেরা ইহার এক কানাকড়িও মাফ করেন নাই।

গিরিয়ার যুদ্ধ

ইংরাজ ও মীর জাফরের সৈন্যদের সহিত মীর কাশিমের প্রথম যুদ্ধ হয় কাটোয়ার অপর পারে। এই ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধে মীর কাসিমের সেনাপতি মোহাম্মদ তকী খান পরাজিত এবং নিহত হন। ১৭৬৩ সালের আগস্ট মাসে ইংরেজ সৈন্যরা গিরিয়া নামক স্থানে আবার মীর কাশিমের সৈন্যদের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধে মীর কাশিমের বিচক্ষণ সেনাপতিগণ যথা—আসাদ উল্লাহ, মীর নওশের খান, শের আলি, মার্কার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণ অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইংরেজেরা নওয়াবের একাধিক সেনাপতিকে উৎকোচের সাহায্যে বশীভূত করিয়া গোপন তথ্যাদি জানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পরামর্শে নাকি ইংরেজেরা অত্যন্ত আকস্মিক-ভাবে গভীর নিশীথে বিশ্রামরত নওয়াব সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। পরাজয়ের পর নওয়াবের হতাবশিষ্ট সৈন্যরা উদুয়ানালা অভিমুখে চলিয়া যায়। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি মেজর এডাম্‌স তাঁহার সৈন্য-সামন্ত সহ উদুয়ানালার দুই ক্রোশ দূরে ফুদ্‌কীপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন।

একাধিক ঐতিহাসিক বলেন: "মীর কাশিমের ৪০ হাজার সৈন্যের সহিত উদুয়ানালায় ইংরেজদের প্রকৃতপক্ষে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর অতিরিক্ত আস্থা, উদুয়ানালার সুরক্ষিত অবস্থান, সর্বোপরি যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে মিথ্যা আশাবাদ মীর কাশিমের সেনাপতিগণকে নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। নওয়াবের সৈন্যদিগকে অসতর্ক এবং আমোদ-প্রমোদে মত্ত দেখিয়া একদা গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে ইংরেজ সৈন্য ভীমপরাক্রমে তাঁহার সৈন্য-শিবিরের উপর আপতিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নওয়াবের ১৫ হাজার সৈন্য বিনষ্ট এবং তাহাদের প্রায় সব কামান হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত

এড়াইবার জন্য অতঃপর মীর কাশিমের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ বিস্তর সমরোপকরণ ফেলিয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করে। যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজেরা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিলামে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন।"

উদুয়ানালার পরাজয়ের সংবাদ মীর কাশিমকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দী ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বল্পকালীন রাজধানী মুঙ্গের হইতে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে সিরাজের ন্যায় তাঁহারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী জগৎ শেঠও মহারাজা স্বরূপ চাঁদকে হাত-পা বাঁধিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। এরূপে বাংলা তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়। বাকী থাকে বিহার ও উড়িষ্যা। মাসাধিক পর তিনি মেজর এডাম্‌সকে লিখিলেন: "আপনাদের সহিত আমি কোন চুক্তি বা বিশ্বাস ভঙ্গ করি নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নৈশ ও অতর্কিত আক্রমণের সাহায্যে মিঃ এলিস প্রমুখ ব্যক্তিগণ আমার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। এখন আমি আপনাদিগকে জানাইতে চাই, যদি আপনারা এভাবে কার্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন, বন্দী ইংরেজদের মাথা কাটিয়া আমি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

মেজর এডাম্‌স তদুত্তরে জানান: "কতিপয় ইংরেজ আপনার হাতে বন্দী আছে। আপনিও ইহা জানিয়া রাখুন, যদি তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হয়, তবে ইংরেজরা আপনাকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। তাহারা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আপনাকে খুঁজিয়া বেড়াইবেন।"

অনেকের ধারণা, ইংরেজেরা এদেশে শুধু ছল-চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা সত্য নয়। ইংরেজ বণিক কোম্পানীর ইতিহাস তাহাদের অসম সাহসিকতা, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাহাদের স্বদেশপ্রীতির অসংখ্য দৃষ্টান্তে পূর্ণ ও সমৃদ্ধ। ছল-চাতুরী তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল না। সংখ্যাল্পতা হেতু বিনা রক্তক্ষয়ে এবং সহজে স্বার্থোদ্ধারের জন্য তাহারা সুযোগ পাইলেই ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন সত্য, কিন্তু এই সুযোগ সৃষ্টি করিত এদেশীয়রাই।

পাটনার কুঠিয়াল মিঃ এলিসের কথাই ধরা হোক্। তিনি একজন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। মীর কাশিমের এত বড় শত্রু আর কেহ ছিলেন না। মীর কাশিমের সৈন্যরা পাটনা অধিকার করিলে মিঃ এলিস তাহাদের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি মেজর এডাম্‌সকে লেখেন: 'আমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী, ইহা আমরা জানি। কিন্তু আমরা এজন্য আদৌ বিচলিত নই। আপনার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ, আমাদের সুবিধা বা নিরাপত্তার খাতিরে আপনার পরিকল্পনার কোন রদবদল করিবেন না।" মৃত্যুপথের যাত্রী মিঃ এলিসের এই কথা কয়টি হইতে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের যেই পরিচয় পাওয়া যায়, তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে উহার অভাব ছিল বলিয়াই মুষ্টিমেয় ইংরেজদের হাতে তাহাদিগকে পদে পদে অপদস্থ হইতে হইয়াছে। অদৃষ্টকে দোষ দিয়া তাহারা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। দেশপ্রেম এবং মনোবলের দারুণ অভাবই মুসলমানদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল।

উদুয়ানালার পর পাটনায় প্রস্থান না করিয়া মীর কাশিম যদি মুঙ্গেরে ইংরেজদিগকে রুখিয়া দাঁড়াইতেন কিম্বা সমস্ত শক্তির উৎস যাহারা, সেই জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ-শক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেন অথবা গেরিলা যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৈন্যদলে ভাঙ্গন দেখা দিত না, এবং মুঙ্গেরের অস্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলিও তাঁহার হাতছাড়া হইয়া পড়িত না। মীর কাশিম বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিলেন—কিন্তু যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজী বুঝিতেন না। পাটনায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার পূর্বেই তাঁহাকে আবার ইংরেজদের সম্মুখীন হইতে হয়। এবারও ইংরেজেরা জয়লাভ করেন। অতঃপর তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া ৩০ হাজার সৈন্য ও প্রচুর ধনরত্ন সহ শাহপুরার নিকট গঙ্গা নদী অতিক্রম পূর্বক অযোধ্যার নওয়াব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য-প্রার্থী হন। ইংরেজেরা গোপনে সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী বেনী বাহাদুরকে হাত করিয়া তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পারেন নাই।

মীর কাশীমের সহিত সুজাউদ্দৌলার এ মর্মে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যেদিন অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী

গঙ্গা নদী অতিক্রম করিবে, সেদিন হইতে যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি মীর কাশিম তাহাদের ব্যয় বাবদ দৈনিক ১১ লক্ষ টাকা দিতে থাকিবেন। ১৭৬৪ সালের এপ্রিল মাসে সম্মিলিত বাহিনী শোণ নদী অতিক্রম করিলে ১৯ হাজার ইংরেজ ও দেশীয় সিপাহী তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এযুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা এবং রোহিলাখণ্ডের ইতিহাস বিখ্যাত হাফিজ রহমত উল্লাহ্‌র পুত্র ইনায়েৎ উল্লাহ্‌ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু তবুও সম্মিলিত বাহিনীর ৫০ হাজার সৈন্য শত্রুপক্ষের মাত্র ১৯ হাজারের মুকাবিলায় যেন ঝড়ঝঞ্ঝা-কবলিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মুষড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

পরাজয়ের পর সম্মিলিত বাহিনী বর্ষা যাপনের জন্য বক্সারে শিবির সন্নিবেশ করে। এক স্থানে সৈন্যদের ব্যয়ের টাকা লইয়া মীর কাশিমের সহিত সুজাউদ্দৌলার বিবাদ দেখা দেয়। সুজাউদ্দৌলার আচরণে সন্দেহ করিয়া মীর কাশিম অতঃপর তাঁহার সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেন। সুজাউদ্দৌলার আদেশে মীর কাশিমেরই জনৈক সেনাপতি তাহাকে বন্দী করিয়া সুজাউদ্দৌলার হাতে সমর্পণ করেন। শেখ মোহাম্মদ আসু নামক মীর কাশিমের জনৈক ভৃত্য তাড়াতাড়ি মীর কাশিমের স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও অবশিষ্ট ধনরত্ন সহ গোপনে রোহিলাখণ্ড পলায়ন করে। ১৭৬৪ সালের অক্টোবরে মীর কাশিম মুক্তি লাভ করিয়া রোহিলাখণ্ডে তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত একত্রিত হন। এদিকে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়া সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যাভিমুখে সসৈন্যে প্রস্থান করেন। বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলার ভাগ্যও নির্ণীত হইয়া যায়।

মীর কাশিমের শেষ জীবন

রোহিলাখণ্ডে না হোক, অন্য কোন স্থানে মীর কাশিম পরিজনবর্গ সহ আজীবন নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বদেশের মুক্তিস্পৃহা তাঁহাকে অনিশ্চয়তার পথে আবার ঠেলিয়া দেয়। পরিজনবর্গকে শেখ আসুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করিলেন। দীর্ঘ ১২ বৎসর কাল তিনি সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে ব্যাপক সফর করিয়া হিন্দু ও মুসলমান রাজ-রাজড়াদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিবার অনেক

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজা-মহারাজা এবং নওয়াব-সুবাদের দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে বিদেশীয়দের ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন আশু বিপদের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। রাজপুতনায় উষর মরুভূমির বক্ষে, সিন্ধুর বিজন প্রান্তরে, মধ্য ভারতের গভীর ঝাড়-জঙ্গলে, উত্তর ভারতের গিরিগহ্বরে তিনি কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন, হাটে বাজারে, মন্দিরে-মসজিদে দেশের নামে, স্বাধীনতার নামে, ইসলামের নামে দেব-দেবীর নামে হিন্দু-মুসলমানের নিকট কত আকুল আবেদন জানাইলেন, কিন্তু কাহারও অন্তরে সামান্য দাগ পর্যন্ত কাটিতে পারিলেন না।

অবশেষে রণশ্রান্ত বীর, দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক মীর কাশিম দেশোদ্ধারের আশায় জলাঞ্জলী দিয়া মোগলদের গোরস্থানে আশ্রয় লাভের জন্যই যেন দিল্লী গমন করিলেন। ১৭৭৭ সালের ৬ই জুন দিল্লীর আজমীরি দরওয়াজার বাহিরে একটি মৃতদেহ অনাদরে পড়িয়া আছে দেখিয়া কিছুসংখ্যক লোক তথায় একত্রিত হয়। তাঁহার মাথার নীচে একটি গাঁঠরী ছিল। পথচারীরা অনুমান করিয়া লইল, নিদ্রিত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের ফলে লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছে। গাঁঠরীটি খোলা হইলে উহার মধ্য হইতে একখানি বহু পুরাতন অথচ অত্যন্ত মূল্যবান কাশ্মিরী শাল বাহির হইয়া পড়ে। উহারই এক কোণে সোনালী অক্ষরে লেখা ছিল: নাসিরুলমুলক, ইমতিয়াজউদ্দৌলা নসরৎজঙ্গ মীর কাশিম আলি খান বাহাদুর। দিল্লীতেই তিনি সমাহিত হন। দিল্লী-আজমীর রেলওয়ে নির্মাণের সময় বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর হাতে তাঁহার কবরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য মীর কাশিমের ত্যাগ ও সাধনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার গ্রেফতার এবং হত্যার জন্য তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়নের ব্যাপারে কৃত অপরাধ হইতে ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে মুক্তি দেন নাই। শুধু মীর কাশিমকেই নয়, পলাশীর ষড়যন্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রত্যেকটি লোককে কোন না কোন প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মীরণকে অপমৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে। ইংরেজদের হাতে পদে পদে অপদস্থ ও নির্মমভাবে শোষিত এবং জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগে কয়েক বৎসর অশেষ যন্ত্রণা ভোগের পর মীর জাফরের পাপাত্মা তাহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইংরেজদের নির্মম শোষণের শিকার হইয়া বহু লক্ষপতি আমিন চাঁদ কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। মহারাজ নন্দ কুমার মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। মীর কাসিমের আদেশে কোটিপতি জগৎশেঠ ও তদীয় পিতৃব্য পুত্র মহারাজ স্বরূপ চাঁদ মুঙ্গের গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারান। মোহাম্মদী বেগ উন্মাদ অবস্থায় কূপে ঝম্প প্রদান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইয়ার লতিফ অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হন এবং রায় দুর্লভ কারাগারেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। সর্প দংশনে দানিশ শাহের মৃত্যু ঘটে। ক্লাইভ্ টেম্‌স নদীতে আত্মহত্যা করেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংস মামলায় অভিযুক্ত হইয়া অপহৃত ধনদৌলত হারাইয়া অপরের দানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকেও কোন না কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।

এদিকে বক্সারের অপ্রত্যাশিত বিজয় ইংরেজকে চট্টগ্রাম হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত একটি বিশাল এলাকার উপর অপ্রতিহত ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। রণশ্রান্ত ইংরেজ সৈন্যরা যদি বক্সার যুদ্ধের পর সুজাউদ্দৌলার পশ্চাদ্ধাবন করিত, তাহা হইলে সমগ্র অযোধ্যাও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পদানত হইয়া পড়িত, ইহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যায়। যাঁহারা মনে করেন, শুধু মনে করেন না, অন্তরে বিশ্বাসও করিয়া থাকেন, শৌর্য-বীর্য, বুদ্ধিচাতুর্য এবং বল-বিক্রমের উপর মুসলমানদেরই শুধু একচেটিয়া অধিকার, কাটোয়া, গিরিয়া, উদুয়ানালা, পাটনা, শোণ ও বক্সারের যুদ্ধের বিবরণী পাঠ করিলে তাঁহারা নিজেদের ভুলসংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। বস্তুতঃ পর পর কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজরা এদেশীয় সৈন্যদের সাহস ও মনোবলের যেই পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহারা যদি ইহা মনে করিয়া থাকেন যে, ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় দেশীয় সৈন্যরা রাজবাড়ীর শোভাযাত্রী ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা হইলে সেজন্য তাহাদিগকে অপবাদ দেওয়া যায় না।

পলাশীর পর হইতে ইংরেজেরা মীর জাফরের নাম ভাঙ্গাইয়া সাক্ষাৎ-ভাবে শোষণ এবং পরোক্ষভাবে এদেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। মীর কাশিম আলিও তাহাদের শোষণ বন্ধ কিম্বা শাসন-ক্ষমতা খর্ব করিতে পারেন নাই। মীর জাফরের দ্বিতীয়বারের সুবাদারী ছিল একেবারে অর্থহীন। জাঁকালো রকমের উপাধিটি, কুশাসন ও অরাজকতার অপবাদ ছাড়া ইংরেজরা তাঁহাকে আর কোন দায়িত্ব বহন করিতে দেন নাই। বাংলার এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর প্রাণসংহারকারী ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইংরেজদের শোষণ ও মীর জাফরের কুশাসনেরই উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে এত বড় দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় নজীর নাই।

কোম্পানীর অর্থলিপ্সা

ভারতের ঐশ্বর্যের কথা ইংলণ্ডে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড তাই আশা করিয়াছিলেন বাংলা, বিহার ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাহাজ-বোঝাই হইয়া ধনরত্ন ইংলণ্ডে পৌঁছিতে থাকিবে। বক্সার যুদ্ধের পর এ কারণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের নিকট হইতে টাকার জন্য তাগিদের পর তাগিদ আসিতে থাকিলে, মিঃ হেস্টিংস, সর্বপ্রথম বেনারসের রাজা চৈৎ সিংহের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে বিপুল অর্থ আদায় করেন। এইরূপ অন্যায়ভাবে আদায়কৃত অর্থের সমস্তটাই যে বিলাতে পাঠান হইত, তাহা নয়। কোম্পানীর কর্মচারীরাই উহার বেশীর ভাগ আত্মসাৎ করিয়া বসিতেন। নেহাৎ দারিদ্র্যের ভিতর হইতে হঠাৎ প্রাচুর্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, এদেশে ইংরেজদের ক্ষেত্রেও উহার কোন ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় নাই। সামান্য কয়েক টাকা মাহিনার এক এক জন কুঠিয়ালকে দেখিলে শ্বেতাঙ্গ রাজা-মহারাজ নওয়াব-সুবা বলিয়া ভ্রম হইত। ফলতঃ তাঁহারা যে শুধু এদেশীয় নৃপতিগণের রাজ্য দখল করিয়াই লইয়াছিলেন তাহা নয়, উপরন্তু তাঁহাদের বিলাসিতারও যোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়া বসিয়াছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরাণীর পদ হইতে গভর্নর-জেনারেলের পদে উন্নীত মিঃ হেস্টিংস্

বিলাসিতার দিক দিয়া সাবেক কালের সুবাদারগণকেও হার মানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার একটি হেরেমও ছিল।

এই বিলাসিতার ব্যয় নির্বাহ এবং কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের টাকার দাবী মিটাইবার জন্য হেস্টিংস্ অতঃপর অযোধ্যার নওয়াবের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ তলব করেন। নওয়াব দাবীর পর দাবী মিটাইয়া তাঁহার রাজকোষাগার একেবারে উজাড় করিয়া দিলেন, কিন্তু তবুও হেস্টিংসের লোভের নিবৃত্তি হইল না। অগত্যা অসহায় নওয়াব স্বীয় সিংহাসন বজায় রাখার জন্য তাঁহার মাতা ও পিতামহীর ধনরত্নের সন্ধান হেস্টিংসকে বলিয়া দেন। হেস্টিংস্ এই দুই অসূর্যম্পর্শা বিদূষী মহিলার নিকট হইতে যেভাবে কোটি কোটি টাকা ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা চিরকাল তাঁহার প্রতি মানুষের অবিমিশ্র ঘৃণার উদ্রেক করিবে।

এই বিপুল অর্থ সংগ্রহের পরও কোম্পানীর লালসার পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। তাই অযোধ্যার নওয়াবের সহযোগিতায় ইংরেজেরা বিনা কারণে হঠাৎ রোহিলাখণ্ডের উপর আপতিত হন। বীর রোহিলারা প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সম্মিলিত বাহিনীকে বাধা দিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না— সমগ্র রোহিলাখণ্ড তাহাদের হাতে নির্মমভাবে লুণ্ঠিত হইল। ইংরেজদের ভাগে কি পরিমাণ অর্থ পড়িয়াছিল তাহা বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক যে, উহার পরিমাণ ছিল বহু কোটি টাকা। এই যুদ্ধে বীরবাহু হাফিজ রহমত উল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ স্বীকার করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করেন। মীর কাশিমের এক পুত্রও এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেস্টিংসের এসকল দুষ্কর্মের কথা প্রকাশ পাইলে ইংলণ্ডের কয়েক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিয়া পার্লামেণ্টে অভিযোগ আনয়ন করেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মী মিঃ বার্ক ইঁহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগিতায় এবং সাহায্যে হেস্টিংস ইহার বিরোধিতা করেন এবং ইহার ফলে হেস্টিংসের দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও লর্ড সভার পক্ষপাতিত্বমূলক বিচারে শেষ পর্যন্ত তিনি বেকসুর মুক্তি লাভ করেন। ১৭৭১-১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কি পরিমাণ ধনরত্ন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে চালান দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কাহারও পক্ষে অনুমান করা এক্ষণে আর সহজ নয়।

ইংলণ্ড হইতে লোহালক্কড় ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের জিনিসপত্র বোঝাই হইয়া আগত প্রত্যেকটি জাহাজ প্রত্যাবর্তনের সময় এদেশ হইতে স্বল্প দামে ক্রীত ও অপহৃত মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। প্রায় এক শত বৎসর এই চৌর্যবৃত্তি চলিয়াছিল। গ্রস্‌ভেনর নামক একখানি বৃহদাকার জাহাজ অপহৃত বহু স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করে। উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটবর্তী হইলে সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠে। বাত্যাবিতাড়িত হইয়া ইহা একটি ডুবো পাহাড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে ডুবিয়া যায়। অধিকাংশ নাবিকেরই কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই ঘটনার প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পর ১৯৪৫ সালে হঠাৎ এ-মর্মে বিলাতী সংবাদপত্রগুলিতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, উক্ত গ্রস্‌ভেনর হইতে স্বর্ণরৌপ্য উদ্ধারের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। কোম্পানীর ধারণা, তাঁহারা সমুদ্রে গ্রস্‌ভেনরের অবস্থান নির্ণয় এবং নিমজ্জিত ধনরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিলপত্র হইতে তাঁহারা ইহাও জানিতে পারেন, গ্রস্‌ভেনরে শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্যের যেই সকল পিণ্ড ছিল, তখনকার বাজারে উহার দাম ছিল এক কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। সংবাদে আরও বলা হইয়াছিল, কোম্পানী গ্রস্‌ভেনরের স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি উদ্ধার করিতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে মোটা রকমের রয়্যালটি দিয়াও দুই কোটি টাকার উপর লাভ করিতে পারিবেন!

গ্রস্‌ভেনরের ন্যায় কত যে জাহাজ বোঝাই হইয়া এদেশের ধনরত্ন ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম জীবনে সামান্য বেতনের কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে যখন উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত, তখনও তাঁহাদের মাহিনা এত অধিক ছিল না যে, অবসর গ্রহণ কালে তাঁহাদের নিকট লক্ষ টাকার অধিক থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহারা উভয়ে কোটি কোটি টাকা সহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন! লণ্ডনে অবস্থিত লর্ড ক্লাইভের দুই শত বৎসরের পুরাতন বাড়ীটি কয়েক লক্ষ

পাউণ্ডের বিনিময়ে হস্তান্তরের কথা উঠিয়াছে। শুধু কি ধনরত্ন লইয়া গিয়া ইংরেজেরা সন্তুষ্ট ছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। এদেশের নওয়াব বাদশাহগণের ব্যবহৃত বহু দ্রব্য অদ্যাবধি ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহের শোভা বর্ধন করিতেছে। আমাদের জাতীয় সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হওয়ার যোগ্য কত মূল্যবান দ্রব্য এবং গ্রন্থ যে বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইংলণ্ডের অন্যান্য লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, উহার কোন হিসাব-নিকাশ হয় নাই। ইংলণ্ডের রাজমুকুটে বিশ্ববিখ্যাত হীরক, কোহিনূরের অবস্থানের কথা সর্বজনবিদিত। ইহাও ভারত হইতে অপহৃত। পলাশীর যে আম্রকুঞ্জে বসিয়া ক্লাইভ তাঁহার পরামর্শদাতাগণ সহ মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন, সেই আম্রকুঞ্জের শেষ বৃক্ষটি পর্যন্ত লর্ড কার্জনের আমলে কর্তিত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাসাদে স্থান লাভ করে। অধিকৃত রাজ্যের মন্দির, মসজিদ ও স্মৃতি সৌধগুলির গাত্র হইতে মূল্যবান প্রস্তর ও মণিকাঞ্চন অপহরণকে কোম্পানীর কর্মচারীরা বীরত্ব প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন।

পলাশীর পূর্বে ইংরেজরা দক্ষিণাপথের কর্ণাট প্রদেশের গৃহ-বিবাদ এবং রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া তথায় বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা অন্যত্র বলা হইয়াছে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এবং কর্ণাটে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয় মহীশূরের উপর। দক্ষিণাপথে সে-সময় তিনটি প্রবল শক্তি ছিল, যথা— মহারাষ্ট্রা, হায়দরাবাদের নিজাম ও মহীশূরের হায়দর আলি। ইঁহাদের মধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তা ছাড়া সিংহাসন লইয়া কর্ণাটের ন্যায় সেখানেও বিবদমান পক্ষদ্বয়ের একটি ইংরেজদের এবং অপরটি ফরাসীদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে হায়দর আলি স্বীয় বুদ্ধি ও সাহস গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহীশূর রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইয়া নিজাম, মহারাষ্ট্রা এবং বৃটিশের ঈর্ষা ও ভয়ের কারণ হইয়া পড়েন।

আহমদ শাহ আবদালির হাতে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রারা কিছু কালের জন্য শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মহারাষ্ট্রা

নায়কগণের মধ্যেও সেসময় ভাঙ্গন ধরে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শীঘ্রই আবার তাহারা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চতুর্দিকে প্রভাব বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজে স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার চেয়ে বড় কথা, যুদ্ধে অজেয় বলিয়া ইংরেজ সৈন্যদের একটা সুনাম তৎপূর্বেই সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সুনামই তাহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে দেশ জয়ে সাহায্য করিয়াছে। হায়দর আলি, নিজাম অথবা মহারাট্টাদিগকে আরও ক্ষমতাশালী হইতে দেওয়া মোটেই ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। এজন্য কৌশলে তাহারা তিনটি প্রধান শক্তির মধ্যে ভীষণ কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দেন।

অপরপক্ষে নিজেরাও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে থাকেন। মহা-রাট্রাদের সহিত একটি যুদ্ধে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। হায়দর আলিও ইংরেজদিগকে পর পর দুইটি যুদ্ধে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছি-লেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতে সত্যিকারের চেষ্টা করেন নাই। মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি না ঘটিতেই হঠাৎ হায়দর আলীর মৃত্যু হয়। বিদেশী, লুণ্ঠনপ্রিয় ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী বলিয়া তিনি ইংরেজদিগকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। হায়দর আলীর ন্যায় লোকের যখন এদেশে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটায় উহা যে সামগ্রিকভাবে সারা ভারতবর্ষের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

টিপু সুলতান

কিন্তু হায়দার আলীর মৃত্যুতে সংগ্রামের অবসান ঘটে না। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজ সেনাপতি মাথুসকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৪ সালে ইংরেজরা সন্ধির প্রার্থনা জানাইলে উদার প্রাণ টিপু তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বন্দী ইংরেজ ও অধিকৃত অঞ্চল তাহাদিগকে ফেরৎ দেন। সন্ধির সময় ইংরেজরা

প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহারা টিপুর সহিত ভবিষ্যতে কোনরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু ইহার মর্যাদা রক্ষা করার কোন উদ্দেশ্য তাহাদের মোটেই ছিল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে জর্জ ওয়াশিংটনের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়ার পর লর্ড কর্ণওয়ালিশ নিজামের নিকট একখানি পত্রে তাঁহাদের মিত্রগণের যে তালিকা দিয়াছিলেন তাহাতে টিপু সুলতানের নাম ছিল না। টিপু সুলতান ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ১৭৮৯ সালে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজ, মহারাষ্ট্রা ও নিজাম সম্মিলিতভাবে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই তিনটি শক্তির সহিত দীর্ঘ চারি বৎসর তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া কিরূপে টিপু মহীশুরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন সেই ইতিহাসই তাঁহার স্বদেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবারের সন্ধি অনুসারে টিপু তাঁহার রাজ্যের একটা অংশ ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

সন্ধি হইল বটে, কিন্তু ইংরেজেরা টিপুর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন না। ১৭৯৯ সালে ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্রারা আবার চারিদিক হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া দস্যু-তস্করের ন্যায় লুণ্ঠন করিতে করিতে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। মিত্রশক্তি-বর্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পৌরুষের অবমাননা করা অপেক্ষা টিপু সুলতান বীরের ন্যায় যুদ্ধ করাই স্থির করেন। টিপুর সৈন্যরাও বীরের মতই যুদ্ধ করিল। কিন্তু তিন তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করা সহজ ব্যাপার ছিল না। যুদ্ধাবসানে টিপুর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ সৈন্যদের শবদেহের সঙ্গে একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে পলাশী প্রান্তরে বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছিল, তাহা এইরূপে শ্রীরঙ্গপত্তমে প্রায় দুইশত বৎসরের জন্য অস্তমিত হইয়া পড়ে। টিপু সুলতানের বন্দী পুত্রগণকে ভেলোর দুর্গে আটক রাখা হয়। ১৮০৬ সালে ভেলোরে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করিলে তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে ইহারা কলিকাতায় নির্বাসিত হন। ইঁহাদের বংশধরগণ এখনও সেখানে আছেন।

নিজাম ও মহারাট্টা

টিপুর পতনকে ভারতবর্ষের পক্ষে বিধাতার একটি অভিশাপ বলা হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের পর ইহা অনুমান করিয়া লইতে কাহারও পক্ষে আর কোন অসুবিধাই হয় নাই যে, উত্তরকালে বৃটিশরাই এদেশের একচ্ছত্র মালিক হইবেন। সত্য বটে, এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইংরেজদিগকে আরও বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু মহীশূরের যুদ্ধের উপর তাহারা যতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, ততটা অপর কোনটির উপর করেন না। টিপুকে যে শুধু তাহারা একটি বৃহৎ শক্তি বলিয়া মনে করিতেন তাহাই নয়, উপরন্তু টিপুর স্বদেশপ্রেম, রণচাতুর্য এবং দূরদর্শিতা তাহাদের ভয়ের প্রধান কারণ ছিল। জনৈক ইংরেজ লেখক বলেন, টিপু যদি ৩১ বৎসর পূর্বে মহীশূরের সিংহাসন লাভ করিতেন, তাহা হইলে এদেশে বৃটিশের নাম নিশানাও থাকিত না।

টিপু সুলতানের পতনের পর ইংরেজেরা তাঁহার সঙ্কুচিত মহীশূর রাজ্যটি হিন্দু রাজার অধীনে ছাড়িয়া দেন। ইহার পর দুর্বল নিজামকে দিয়া তাহাদের অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করাইয়া লইয়া তাহারা মহারাট্টাদের ধ্বংসের উপায় আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মহারাট্টারা নিজামের ন্যায় সহজে বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তবে সমগ্র ভারতবর্ষের উপর ইংরেজদের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রভাব ইত্যবসরে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও মহারাট্টারা শেষ পর্যন্ত অসম্মানজনক শর্তে ইংরেজদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। সুযোগ পাইলেই ইংরেজরা এসকল সন্ধির শর্তাবলীর ভুল ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়া তাহাদের অধিকার বিস্তার করিয়া লইতে থাকেন। একাকীর তো কোন প্রশ্নই উঠে না, এমন কি সম্মিলিতভাবেও মহারাট্টা নায়কগণের পক্ষে বৃটিশের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা পর্যন্ত চিন্তা করা ক্রমে ক্রমে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষে তখন আর যে সকল রাজ্য ছিল, উহারা ছিল আরও দুর্বল এবং অসঙ্ঘবদ্ধ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দানের কোন যোগ্যতা এবং ক্ষমতা এই সকল রাজা ও নওয়াবগণের কাহারও ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন নেতৃত্ব

পলাশী প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯৯ সালে মহীশুরাধিপতি টিপু সুলতানের মৃত্যু পর্যন্ত ৪০ বৎসরের ঊর্ধকাল এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করিয়াছেন নওয়াব, বাদশাহ এবং রাজা মহারাজাগণ। ফরাসী সম্রাট লুই'র ন্যায় দেশকে ইঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং নিজেদেরকে জনসাধারণের অবিসম্বাদিত এবং স্বাভাবিক নেতা বলিয়া মনে করিতেন। রাজনৈতিক চেতনাহীন জনসাধারণ ইঁহাদের জয়-পরাজয়ের সহিত নিজেদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত মনে না করিয়াও তাঁহাদের জয়ে উল্লাসিত এবং পরাজয়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইত। কিন্তু তাহারাই যে নওয়াব-বাদশাগণের শক্তির প্রধান উৎস, ইহা একবারের জন্যও তাহাদের মনে স্থান পাইত না। যদি বা কালেভদ্রে কেহ এরূপ ধারণা ব্যক্ত করিত, তাহা হইলে জল্লাদের হাতে মৃত্যুই ছিল তাহার লঘুতম প্রাপ্য।

কথিত আছে, পলাশী প্রান্তরে যখন বাংলার ভাগ্য পরীক্ষা চলিতেছিল, তখন মাত্র তিন মাইল দূরে গুরু মহাশয় তাহার পাঠশালায়, মওলবী সাহেব তাহার মক্তবে, কৃষক তাহার ক্ষেতে, তাঁতী তাহার তাঁতশালায় নির্বিকার চিত্তে আপন আপন কাজ করিয়া যাইতেছিল। মীর জাফর আলি খানের সুবাদারী প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া জনৈক সরলপ্রাণ কৃষক তাহার সহকর্মীদের বয়সের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া বলে, "এই নিয়ে আমি ছয় জনকে নওয়াব হতে দেখলাম। মসনদের উপর বসলে ঘাড় এক দিন তলোয়ারের নীচে যাবেই। নওয়াবীটা যাত্রার পালা বদল মাত্র।"

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজেরা নওয়াবের নামে জনসাধারণের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন চালাইতে থাকিলে, কোন এক গ্রামের অধিবাসীরা

জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ লইয়া এক দিন মীর জাফরের দরবারে উপস্থিত হয়। মীর জাফর অভিযোগ পত্রখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক বলেন, "ইহার বিচারের ভার আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ন্যস্ত করিতে পারিলে আপাততঃ তোমাদের সকলের মস্তক এবং আমার মসনদ নিরাপদ থাকে।" মীর কাশিম অনুরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে অগ্রসর হইয়া মসনদ খোয়ান।

পিণ্ডারী নেতৃবর্গ

বিশাল ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভয়ে সন্ত্রস্ত, সে সময় তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্বের দায়িত্ব লইয়া যিনি সর্বাগ্রে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাঁহার নাম আমীর খান। তিনি ছিলেন একদল পিণ্ডারীর নেতা, আফগান বংশসম্ভূত এবং রোহিলাখণ্ডের অধিবাসী। পিণ্ডার শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং উৎপত্তির ইতিহাস অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে। দক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির পতনের বহু পূর্বেও পিণ্ডারীদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অনিয়মিত সৈন্য এবং বাংলার প্রতিপত্তিশালী জমিদারগণের লাঠিয়ালদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। দক্ষিণাত্যে মোগলদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ইহারা মহারাট্টাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাট্টাদের পক্ষে আহমদ শাহ আব্‌দালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মহারাট্টাদের ন্যায় ইহারাও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পিণ্ডারীদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। মহারাট্টা নায়কগণের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে হীরু ও বরুণ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পিণ্ডারীদের এক বিরাট অংশ মাধবজী সিন্ধিয়ার সঙ্গে ভিড়িয়া পড়ে। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ১৮০০ সালে হীরু এবং বরুণ পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর পিণ্ডারীদের নেতৃত্ব আমীর খান, করিম খান এবং চিতু খানের করতলগত হয়। চিতু খানের বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়া দৌলত রাও সিন্ধিয়া তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র জায়গীর এবং নওয়াব উপাধি দান করেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়া হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে

করিম খান তাঁহার পক্ষ হইয়া এমন বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন যে, সমগ্র মধ্য ভারতে তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে প্রচুর ধনরত্ন এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি তাঁহার হস্তগত হয়। ভুপালের রাজ-পরিবারে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ তিনি সেখানেও প্রচুর অর্থ এবং ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন নৃপতির ন্যায় দরবারের অনুষ্ঠান এবং একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ইহাতে অশ্বারোহী পদাতিক দুই-ই ছিল।

আমীর খানের কোন রাজ্য ছিল না বলিয়া কাহারও প্রতি কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। যখন ইচ্ছা তিনি রাজপুতানা, মধ্য প্রদেশ এবং বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাইতেন। এই অঞ্চলের অরাজক অবস্থা এবং বৃটিশ বিদ্বেষ তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত একটি রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে। তদনুসারে তিনি বেপরোয়া লুঠতরাজ ছাড়িয়া দিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। রাজ-পুতানার ছোটখাটো সামন্ত নৃপতিগণ সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। দুই চারিটি সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া আমীর খান বৃটিশের সহিত একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। উক্ত সন্ধির প্রধান শর্তানুসারে আমীর খানকে রাজপুতানার ক্ষুদ্র টঙ্ক রাজ্যটি প্রদান করা হয়। স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পর হইতে আমীর খানের উত্তরাধিকারিগণ মাসোহারা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

আমীর খান বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম হইতে সরিয়া পড়িলে তাঁহার অনুচরগণের অনেকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু করিম খান ও চিতু খান মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য লুঠতরাজও অব্যাহত রাখেন। করিম খানের সহিত সিন্ধিয়ার বিবাদ বাধিলে পর সিন্ধিয়া তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কিছুদিন পর মুক্তি লাভ করিয়া তিনি রঘুজী ভোঁসলার রাজ্যে হানার উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে চিতুর সহিতও তাঁহার মত-বিরোধ দেখা দেয়। চিতু

দলবলসহ ভিন্ন হইয়া পড়িলে করিম খান পিণ্ডারীদের প্রাক্তন সরদার হীরুর পুত্র দোস্ত মোহাম্মদ ও ওয়াসিল মোহাম্মদের সঙ্গে যোগ দেন।

ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাপে দেশীয় নৃপতিগণ পিণ্ডারীদের দমনের জন্য অর্থ ও লোকজন দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। ১৮১৭ সালের বর্ষাকালে পিণ্ডারীরা চিতু, করিম এবং ওয়াসিল মোহাম্মদের নেতৃত্বে একত্রিত হয়। কিন্তু মতানৈক্যের দরুন এমন বিপদের দিনেও তাঁহারা সর্বসম্মত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অতর্কিত আক্রমণের সাহায্যে ইংরেজ সৈন্যরা কোটার নিকটে এক স্থানে করিম খানের স্ত্রী, তাঁহার অনেকগুলি হাতী, পতাকা এবং প্রচুর রণসম্ভার হস্তগত করেন। করিম খান ও ওয়াসিল মোহাম্মদ মাত্র পাঁচ হাজার অনুচরসহ পলায়ন করিয়া কোন রকমে রক্ষা পান। অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজদের হাতে দেশীয় অসতর্ক বিরাট বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের বহু দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে রহিয়াছে।

চিতুর সৈন্যরা তখনও প্রায় অক্ষত অবস্থায় ছিল। ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে তিনি শেষবারের জন্য দেশীয় নৃপতিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হন সাফল্যের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অতঃপর তিনি অনুচরগণসহ উদয়পুরের দিকে প্রস্থান করেন। তথা হইতে তিনি ইন্দোরে উপনীত হন। গুজরাটের পথটি ইংরেজ সৈন্যরা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে দেখিয়া তিনি ইন্দোর হইতে হায়দরাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন।

এদিকে করিম খান ও ওয়াসিল মোহাম্মদের অনুচরগণ তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া মালব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। নামদার খান নামক অপর এক জন পিণ্ডারী নেতা তথায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। পিণ্ডারীদের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত ইংরেজদের পক্ষ হইতে এসময় ঘোষণা করা হয়, পিণ্ডারী সরদারগণ তাহাদের অনুচরসহ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়া দিবেন। ভূপালের নওয়াবের মধ্যস্থতায় নামদার খান সর্বাগ্রে আত্মসমর্পণ করেন। ওয়াসিল মোহাম্মদ সে সময় সিন্ধিয়ার আশ্রয়ে গোপনে গোয়ালিয়রে বসে করিতে-ছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া ইংরেজেরা তাঁহাদের রেসিডেন্টের মারফৎ

সিন্ধিয়ার উপর চাপ দিতে থাকেন। সিন্ধিয়া অগত্যা ওয়াসিল মোহাম্মদকে তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করেন। নজরবন্দী হিসাবে গাজীপুরে অবস্থানের সময় পলায়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ওয়াসিল মোহাম্মদ বিষপানে আত্মহত্যা করেন বলিয়া প্রকাশ করা হয়।

যথাসময়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী করিম খানের আশ্রয়স্থল জাওয়াদ আক্রমণ করে। ইংরেজ সৈন্যরা তাঁহার গ্রেফ্‌তারের জন্য সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিল। জঙ্গলে কিছুকাল অবস্থানের পর করিম খান স্যার জন ম্যালকমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে গোরক্ষপুর জেলায় বার্ষিক ২০ হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন শান্তি ও প্রাচুর্যের ভিতর দিয়া কাটিয়া যায়।

ব্যাঘ্র কবলিত চিতু খান

এদিকে নওয়াব চিতু খান তাঁহার অনুচরগণকে লইয়া আশ্রয়ের সন্ধানে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। কিন্তু কোথাও নিজকে নিরাপদ মনে করিতে না পারিয়া সপুত্রক মালব রাজ্যে প্রবেশের জন্য অবশেষে তিনি নর্মদা নদী অতিক্রম করেন। বাগ্‌লী উপত্যকায় পৌঁছিয়া তিনি দেখিতে পান, ইংরেজ ও সামন্তরাজগণের সৈন্যরা তথায় কড়া পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক মনে হওয়ায় চিতু তাঁহার পুত্র হইতে সেস্থানে ভিন্ন হইয়া পড়েন। পিতার পরামর্শ অনুসারেই পুত্র সেদিনই ইংরেজ সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন পর হোলকারের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য বাগ্‌লী হইতে কান্তপুর যাইবার সময় পথিপার্শ্বে আরোহীশূন্য একটি সুন্দর অশ্ব দেখিতে পায়। দলের কেহ কেহ দেখা মাত্রই উহাকে চিনিয়া ফেলে। তৎক্ষণাৎ তাহারা চিতুর সন্ধানে দলবদ্ধভাবে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা প্রথমে একখানি তরবারি, তারপর রক্তচিহ্নযুক্ত ছিন্ন পোশাক, কিছু টাকাকড়ি, নাগপুর

রাজার শীলমোহরযুক্ত একখানি দানপত্র এবং মানুষের দেহের কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশ দেখিতে পায়। দানপত্রে চিতুর নামোল্লেখ ছিল। হোলকারের সৈন্যরা প্রাপ্ত দ্রব্যাদি হইতে অনুমান করিয়া লয়, তাঁহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। তবু নিজেদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তাহারা রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া পাহাড়ের একটি গুহার নিকট উপস্থিত হয়। গুহার মুখে তাহারা একটি নরমুণ্ড দেখিতে পায়। নরখাদকটি সেই সময় গুহায় ছিল না। তাহারা মস্তকটি সহ স্যার ম্যালকমের শিবিরে গমন করে। চিতুর পুত্র বন্দী হিসাবে তখনও শিবিরেই অবস্থান করিতেছিল। সনাক্তের জন্য মস্তকটি তাহার নিকট উপস্থিত করা হইলে সে উহা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে। শিবিরের পার্শ্বেই চিতুর মস্তকটি সমাহিত করা হয়।

চিতুর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে আত্মগোপনকারী পিণ্ডারী নেতৃবর্গ ইংরেজকে বাধাদানের নীতি পরিহারপূর্বক নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়া সাধারণ নাগরিক হিসাবে জীবিকার্জনের সুযোগ দান করিয়াছিলেন; সমকালীন বিদেশীয় লেখকগণের লেখনীর ভিতর দিয়া এই মহান সত্যটি কোথাও প্রকাশ পায় নাই যে, টিপু সুলতানের অসমাপ্ত কাজ ইহারাই স্বেচ্ছায় নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলি একের পর এক করিয়া যখন ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া এদেশে তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল, তখন ইতিহাসে দস্যু-তস্কর নামে অভিহিত পিণ্ডারী দেশপ্রেমিকগণই নিজেদের অস্তিত্বের বিনিময়ে তাহাদিগকে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ. কিন্তু পরবর্তীকালে মধ্য ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার তাগিদই তাঁহাদিগকে লুঠতরাজের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে উৎসাহ যোগাইয়াছিল। সংগৃহীত অর্থ তাঁহারা ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেন নাই।

পিণ্ডারীদের পতনের পর উত্তর ও মধ্য ভারতে মুসলমানদের প্রতিরোধ-শক্তি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তখন দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়েন। অবস্থার

নিকট নতি স্বীকারপূর্বক হিন্দুদের ন্যায় তাঁহারাও ইংরেজদের সহিত সর্ব ব্যাপারে সহযোগিতা করিবেন কিনা এই প্রশ্ন যখন তাঁহাদের মনকে আলোড়িত করিতেছিল, সে সময় সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী নূতন আদর্শ লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। এই আদর্শও ছিল ত্যাগের এবং আত্মবিসর্জনের—ভোগের নয়।

সৈয়দ আহমদের বাল্যজীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কিছু জানা যায় না। যেই পরিবারে তাঁহার জন্ম, তাহার সহিত পিণ্ডারী-সরদার আমীর খানের আত্মীয়তার বন্ধন ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। আনুমানিক ১৭৮৭ সালে বেরেলীতে তাঁহার জন্ম হয়। রোহিলাখণ্ডে ইংরেজ ও অযোধ্যার নওয়াবের অত্যাচারের কথা তখনও লোকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। এ কারণে বাল্যকালেই সৈয়দ আহমদের মন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। খুব সম্ভব তিনি প্রথম জীবনে আমীর খানের দলভুক্ত ছিলেন। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হিসাবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি অসিবিদ্যা ও অশ্ব পরিচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহাদের মতে আমীর খান ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলে পর আহমদ বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন।

বেরেলীতে কিছু দিন অবস্থানের পর ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। এত অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য দিল্লী গমনের কথাও বিশেষ অর্থপূর্ণ। দিল্লী পৌঁছিয়া তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা শাহ্ আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে কোরআন, হাদিস, ফেকাহ্ প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া তিনি মওলানা আজিজের প্রিয়তম শিষ্যরূপে গণ্য হন।

মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে যেই সকল দোষত্রুটি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, পাঠ্যাবস্থায়ই তাহা সৈয়দ আহমদের নজরে পড়ে। শিক্ষা সমাপনান্তে তাই তিনি ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি একাধারে পণ্ডিত, বাগ্মী, অমায়িক, সুদর্শন ও সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সভা-সমিতিতে ভীষণ ভীড় হইত এবং বক্তৃতার পর বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। রোহিলাখণ্ডের জায়গীরদার স্বনাম-

খ্যাত ফয়েজ উল্লাহ খানের জায়গীরেই তাঁহার প্রচার বিশেষ কার্যকর হয়। সৈয়দ আহমদের বক্তৃতার ফলে রোহিলারা হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ভেদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। ইংরেজরা রোহিলাদের দেশপ্রেমের কথা জানিতেন। ১৮১৬ সালে বেরেলীর প্রজাবিদ্রোহের কথাও তাহারা তখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রোহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধতার ভিতরে বিপদের বীজ উপ্ত হইতে দেখিয়া তাহারা ফয়েজাবাদ ও বেরেলীতে সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া রাখিলেন। ইহার পর সৈয়দ আহমদ রোহিলাখণ্ড হইতে অযোধ্যা হইয়া টঙ্কে গমন করেন। তথায় কিছু দিন অবস্থানের পর তিনি দিল্লী উপনীত হন। এই ঘটনার প্রায় ৩৫ বৎসর পর সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের বেপরোয়া গোলাগুলীর আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত আকবরবাদী মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া তিনি দিল্লীতে প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। এই সময় মওলানা আবদুল আজিজের নিকট-আত্মীয় মওলানা ইসমাইল ও মওলানা আবদুল হাই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দুই বৎসর পর পবিত্র হজ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে তিনি বহু অনুচরসহ দিল্লী হইতে প্রথমে বেরেলী এবং সেস্থান হইতে পাটনা আগমন করেন। পাটনার অধিবাসীরা এমন বিপুলভাবে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করে যে, তৎপূর্বে কোন নওয়াব-বাদশাহের ভাগ্যেও অনুরূপ কিছু জুটে নাই। পাটনায় অবস্থানের সময় তাঁহার দর্শন লাভের জন্য তথায় এত জনসমাগম হইতে থাকে যে, ইহাদের বাসস্থানের জন্য সরকার স্বয়ং বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। সৈয়দ আহমদ পাটনায় একটি স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক সানুচর গঙ্গার তীর ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। কলিকাতায় তাঁহার দর্শনপ্রার্থীদের অসম্ভব রকমের ভীড় হইত। কলিকাতা হইতে তিনি বহু অনুচরসহ মক্কা রওয়ানা হন। এই উপলক্ষে শুধু তাঁহার অনুচরদের জন্যই এগারখানি জাহাজ ভাড়া করিতে হইয়াছিল। মক্কা হইতে তিনি মদীনা, দামেস্ক, জেরুজালেম ও তুরস্কের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপল গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কনস্টান্টিনোপলে নজর-নিয়াজ বাবদ তিনি নয় লক্ষাধিক টাকা পাইয়াছিলেন।

আরবে অবস্থানকালে তিনি মধ্য প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক আল্লামা আবদুল ওহাবের কতিপয় খ্যাতনামা অনুবর্তীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। মধ্যপ্রাচ্যে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া যেইদিন সৈয়দ আহমদ বোম্বাই অবতরণ করেন, সেইদিন উহা একটি জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। অগণিত নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা কুড়াইতে কুড়াইতে সৈয়দ আহমদ বোম্বাই হইতে বেরেলী পৌঁছেন। বেরেলীতেই তিনি সর্বপ্রথম 'মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম' এই মহাবাণী প্রচার করেন। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সৈয়দ আহমদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই একটি মাত্র ছত্রই যথেষ্ট। স্থায়ী-ভাবে বসবাসের জন্য অতঃপর তিনি বেরেলী হইতে দিল্লী গমন করেন।

এ সময় পাঞ্জাব হইতে মুসলমানদের উপর শিখদের অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ তথায় পৌঁছিতে থাকে। সমগ্র পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের একটি বৃহৎ অংশ তখন শিখদের করতলগত ছিল। সৈয়দ আহমদ নির্যাতিত মুসলমানদের করুণ আর্তনাদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। একমাত্র আল্লাহ্‌তালার সাহায্যের উপর নির্ভর পূর্বক তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দিয়া অনুমান পাঁচ শত মাত্র অনুচর সহ টঙ্ক গমন করেন। পিণ্ডারী সরদার আমীর খানের পুত্র ছিলেন তখন টঙ্কের নওয়াব। তাঁহার সহিত পরামর্শের পর তিনি সিন্ধুর খয়েরপুরে উপনীত হন। খয়েরপুরের মীর রুস্তম আলি খান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। টঙ্কের নওয়াবের অনুকরণে রুস্তম আলি খানও তাঁহাকে মোটা রকমের অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। সিন্ধু হইতে সীমান্ত প্রদেশ এবং তথা হইতে কাবুলে উপস্থিত হইয়া তিনি আফগান-আমীরের সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু আমীর তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেন নাই। বিস্ময়ের বিষয়, ভারতবর্ষের মুসলমানরা তাহাদের ঘোর বিপদের দিনে পর্যন্ত আফগানদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য পায় নাই।

সীমান্ত প্রদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পেশোয়ারের গভর্ণর ইয়ার মোহাম্মদ খানকে তাঁহার দলে যোগদান করিতে আহ্বান জানান। ইয়ার মোহাম্মদ খান তাঁহার চাকরীদাতা রণজিৎ সিংহের বিরোধিতা করিতে কিছুতেই রাজী হইতেছিলেন না। কিন্তু হঠাৎ এক দিন শিখ সেনাপতি বুদ সিংহের পরিচালনাধীন বাহিনীর সহিত সৈয়দ আহমদের অনুচরদের

একটি সংঘর্ষে শিখেরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাতে ইয়ার মোহাম্মদ ভীত হইয়া তাঁহার সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৮২৯ সালে ইয়ার মোহাম্মদ খান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিষ প্রয়োগে সৈয়দ আহমদকে হত্যার চেষ্টা করেন। সৈয়দ আহমদের বিক্ষুব্ধ অনুচরেরা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে পেশোয়ার আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ইয়ার মোহাম্মদ খান নিহত হন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা সুলতান মোহাম্মদ পেশোয়ারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সৈয়দ আহমদের বাহিনী তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল, এমন সময় রাজকুমার শের সিংহ এবং এককালে নেপোলিয়নের সেনাপতি জেনারেল ভেন্তরা এক বিরাট শিখ বাহিনী সহ সুলতান মোহাম্মদের সাহায্যার্থে পেশোয়ারে উপস্থিত হন।

পেশোয়ার অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া সৈয়দ আহমদের অনুচরেরা গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে। ইহাদের দমনের জন্য শিখ সেনাপতি হরি সিংহ, জেনারেল এলার্ড, জেনারেল এভিতাবিলা প্রমুখ দেশী বিদেশীয় অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ সীমান্তে প্রেরিত হন। আপাততঃ জয়ের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সৈয়দ আহমদ তাঁহার অনুচরবর্গসহ সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণ করেন। তথা হইতে তিনি পুনরায় পেশোয়ার আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর সুলতান মোহাম্মদ পরাজিত হইয়া পেশোয়ার হইতে পলায়ন করিলে উহা সৈয়দ আহমদের অধিকারে চলিয়া যায়। পেশোয়ারের এই যুদ্ধে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী মুজাহিদ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জুন মাসে পেশোয়ারের পতন হয়। নভেম্বর মাসে সৈয়দ আহমদ উহা সুলতান মোহাম্মদ খানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানের অঙ্গীকারে ফেরৎ দেন। পেশোয়ার হইতে অতঃপর তিনি ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পরবর্তী পাঁচ মাস শিখদের সঙ্গে তাঁহার অনুচরদের যেই কয়বার সংঘর্ষ হয় তাহার একটিতেও শিখেরা জয়ী হইতে পারে নাই। এ সময় সৈয়দ আহমদের সশস্ত্র অনুচরের সংখ্যা অর্ধ লক্ষের কোঠা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

বাহুবলে সৈয়দ আহমদকে কাবু করা অসম্ভব মনে করিয়া রণজিৎ সিংহ উপজাতীয়দের মধ্যে গোপনে প্রচুর টাকাকড়ি বিলি-বণ্টন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বেতনভুক মুসলমান দালালেরা লোকজনকে বুঝাইতে থাকে, সৈয়দ আহমদ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া তদস্থলে তাঁহার নিজের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বৃটিশ ভারত হইতে যুদ্ধক্ষম লোকজন আনাইতেছেন এবং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই তিনি উপজাতীয় পিতা-মাতাদিগকে ইহাদের সহিত নিজেদের কন্যার বিবাহ দিতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাহা ছাড়া ইহাও বলা হইতে থাকে, সৈয়দ আহমদ যদি বৃটিশের দালাল না হইবেন, তাহা হইলে তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া এই দূর দেশে কেন আসিয়াছেন? শিখদের ন্যায় ইংরেজেরাও তো বিধর্মী ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, রণজিৎ সিংহের বেতনভুক দালালদের এই অপপ্রচার ব্যর্থ যায় নাই। অর্থলোভী উপজাতীয় পিতামাতা চড়া দামে কন্যা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় সৈয়দ আহমদের বিরোধিতা শুরু করিয়া দেয়। ইহাদের দেখাদেখি অন্যান্য লোকজনেরাও তাঁহার দল ত্যাগ করিতে থাকে। সতর্কতার খাতিরে তাই তিনি শুধু বহিরাগত অনুচরদিগকে লইয়াই শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকেন। পর পর অনেক কয়টি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি পাঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ এলাকা শিখদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হন। অধিকৃত এলাকায় তিনি অমুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তা সহ ইসলামসম্মত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কিন্তু উহা অকার্যকর প্রমাণিত হয়। কারণ, তীব্র বিরোধিতার মাধ্যমে ধর্মান্ধ উপজাতীয় লোকজনরা পর্যন্ত উহা গ্রহণে তাহাদের অসম্মতি ব্যক্ত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে যুক্তিযুক্ত কারণে ধর্মান্ধ অমুসলমানরাও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অনীহা প্রকাশ করে।

বালাকোটের বিপর্যয়

১৮৩১ সালের মে মাসে সৈয়দ আহমদ স্বল্প সংখ্যক অনুচর সহ কাশ্মীরের পথে বালাকোট নামক স্থানে পৌঁছিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার কোন এক মিত্রসরদারকে আক্রমণের অভিপ্রায়ে শিখ সেনাপতি রাজকুমার শের সিংহ তাঁহার সৈন্যসামন্ত সহ নিকটেই এক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সৈয়দ

আহমদ তাঁহার মূল বাহিনীর জন্য সংবাদ পাঠাইয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় সে স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাজকুমার শের সিংহ ইহার কিছুই জানিতেন না। কিন্তু রণজিৎ সিংহের বিঘোষিত পুরস্কারের লোভে জনৈক পাঞ্জাবী মুসলমান তাঁহার উপস্থিতির কথা গোপনে শিখ সেনাপতির কানে পৌঁছাইয়া দেয়। শের সিংহ মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে দুইদিক হইতে সৈয়দ আহমদের শিবির আক্রমণ করেন। সৈয়দ আহমদও তাঁহার অনুচরগণকে লইয়া বীর বিক্রমে শিখদের উপর আপতিত হইলেন। নিছক সংখ্যাধিক্যের জন্যই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে শিখদের জয় হয়। সৈয়দ আহমদ স্বয়ং তাঁহার প্রধান শিষ্য মওলানা ইসমাইল ও বেশীর ভাগ অনুচরসহ এই যুদ্ধে শহীদ হন। যুদ্ধ অবসানের কয়েক ঘণ্টা পর মূল মুজাহিদ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখে, শিখেরা তাহাদের ঘাঁটিতে ফিরিয়া গিয়াছে।

সৈয়দ আহমদের মৃত্যু সংবাদ দাবানলের ন্যায় উপজাতীয় অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়া মাত্রই অর্থলোভী সরদার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লা-মওলবীগণের প্ররোচনায় ধর্মান্ধ লোকেরা মুজাহিদ বাহিনীর হতাবশিষ্ট লোকজনকে যত্রতত্র আক্রমণ করিতে থাকে। ফলে ইহাদের হাতে বহু মুজাহিদ প্রাণ হারান। এমতাবস্থায় মুজাহিদগণ বিশেষ করিয়া পূর্ব ভারতীয় অনুচরবর্গ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সোয়াত এবং অন্যান্য এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। টঙ্কের নওয়াবের অনুরোধে সৈয়দ আহমদের পত্নী এবং আত্মীয়-স্বজনদের কেহ কেহ তথায় গমন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণকে অদ্যাবধি সেস্থানে দেখা যায়। বালাকোটেই সৈয়দ আহমদ সমাধিস্থ হন।

বালাকোটে শিখদের এবং উপজাতীয় এলাকায় স্বধর্মাবলম্বীদের হাতে বিপর্যয়ের পর মুজাহিদ বাহিনীর সংগ্রামশক্তি কিছু দিনের জন্য আংশিকভাবে লোপ পায়। স্বভাবতঃই এসময় দলের মধ্যে ভাঙ্গন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। উপজাতীয়দের বিরুদ্ধাচরণের দরুন পূর্ব এবং উত্তর ভারতের মুজাহিদগণের অনেকের মনে জেহাদের পরিণতি সম্পর্কেও সংশয় জাগিয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। জেহাদে একবার বহির্গত হইলে মনস্কাম পূর্ণ হওয়ার পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন অধর্মাচরণেরই সামিল, ইহাই ছিল বাঙ্গালী মুজাহিদগণের

বিশ্বাস। তাই তাহাদের অধিকাংশকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে দেখা যায় নাই।

ইহারা এবং যুক্তপ্রদেশ ও রোহিলাখণ্ডের কিছু সংখ্যক মুজাহিদ আটকের পুরাতন কেল্লা হইত প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে, সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে, বৈদিক যুগের হিন্দু মুণি-ঋষিগণের তপস্যার ক্ষেত্র, মহাবন পর্বতের পাদ-দেশে অবস্থিত সিতানা নামক স্থানটি নিজেদের বাসস্থানের জন্য মনোনীত করে। সৈয়দ আহমদও একবার এস্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ইহারাও জানিত না যে, একদিন এই গণ্ডগ্রামটিকেই কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রাম দানা বাঁধিয়া উঠিবে। এই গ্রামটির অস্তিত্ব মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে কয়েক দফায় বহু সহস্র লোক ক্ষয় এবং এদেশবাসীর কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকা নষ্ট করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ বৃটিশ ভারতের কেন, পৃথিবীর কোন দেশে সিতানার ন্যায় একটি গ্রাম পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধকাল বৃটিশের ন্যায় কোন বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে তো নয়ই, কোন দুর্বল শক্তির বিরুদ্ধেও এমন পরাক্রমের সহিত সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে সিতানার স্থান তাই এত উচ্চে।

তখ্‌তবন্দের শাহ্‌ জামিন শাহ্‌ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অন্যতম বিশ্বস্ত শিষ্য ছিলেন। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি সিতানায় আসিয়া তাঁহার আস্তানা প্রতিষ্ঠিত করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে জামিন শাহের খ্যাতি সমগ্র এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহার আস্তানার জন্য বিস্তর ভূ-সম্পত্তি দান করে। সম্ভবতঃ তাঁহারই জীবদ্দশায় বিভিন্ন উপজাতি একটি জীর্গায় (সম্মেলনে) সমবেত হইয়া সিতানাকে একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করে। সীমান্ত প্রদেশে নিরপেক্ষ অঞ্চলের দাম ও মর্যাদা খুব বেশী। কারণ, এরূপ এলাকার মর্যাদা কেহ কোন দিন নষ্ট করে না। ফলে দুই জন পরম শত্রু পর্যন্ত নিরপেক্ষ এলাকায় একই গৃহে সহোদরের মত বাস করিতে পারে।

জামিন শাহের মৃত্যুর পর সিতানার আস্তানাটি তাঁহার পৌত্র সৈয়দ ওমর শাহের ভাগে পড়ে। তাঁহার আহ্বানে বহু মুজাহিদ স্থায়ীভাবে

বসবাস করিবার জন্য আবার তথায় উপস্থিত হয়। জামিন শাহ এবং ওমর শাহের চেষ্টায় মুজাহিদগণের প্রতি উপজাতিদের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটে এবং তাহারাও ক্রমে ক্রমে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করিতে থাকে। শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে তাহারাও আবার শিখদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বহু খণ্ড যুদ্ধের পরও চূড়ান্ত জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

সিতানার গুরুত্ব ইতিমধ্যে অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাওয়ায় সোয়াতের অধিবাসীরা জামিন শাহের অপর এক পৌত্র সৈয়দ আকবর শাহকে তথায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার উপর উহার শাসনভার ন্যস্ত করে। সৈয়দ আকবর শাহ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সোয়াতের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের কিছুদিন পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার আমলেই সোয়াতের লক্ষাধিক অধিবাসী জেহাদের নীতি পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করে। তাঁহার জীবদ্দশায় বৃটিশেরা শিখ-শক্তি ধ্বংস করিয়া পাঞ্জাব দখল করায়, এই সর্ব প্রথম মুজাহিদ বাহিনী বৃটিশের মুখোমুখী হইয়া পড়ে। সৈয়দ আহমদ প্রধানতঃ তাঁহার অনুচরদিগকে বৃটিশের বিরুদ্ধেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবী মুসলমানদের আহ্বানে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শিখদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সৈয়দ আহমদ বলিতেন, ইবাদতের ন্যায় জেহাদেরও কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। জেহাদের প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়া মাত্রই সক্ষম নারী পুরুষের জন্য তাহা একটি অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

উপরে বলা হইয়াছে, সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর সীমান্তে জেহাদের আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। জামিন শাহের আমন্ত্রণে পাটনা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ আলেম ও প্রচারক সিতানায় গমন করেন। সিতানায় ইহাদের উপস্থিতি এবং সাময়িক অবস্থান মুজাহিদগণের প্রাণে নব আশার সঞ্চার করে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে যে এলাকার অধিবাসীদের নিকট হইতে সৈয়দ আহমদ সর্ব প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষয়, অতঃপর সে এলাকার লোকজনেরাই বেশী সংখ্যায় মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানের জন্য আগাইয়া আসিতে থাকে।

ইহার কারণও ছিল। রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরেজেরা মিত্রতামূলক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শিখরাজ উহা বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিয়াছেন। ইংরেজেরা বাহ্যতঃ উহা পালন করিয়া থাকিলেও পাঞ্জাব অধিকারের প্রশ্ন সর্বদা তাহাদের মনে জাগ্রত ছিল। তাহাদেরই অধিকৃত এলাকা হইতে দলে দলে যখন অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সহ লোক সীমান্তের উপজাতীয় এলাকায় যাইতে থাকে, তখন তাহারা এই মনে করিয়া ইহাদিগকে বাধা দেন নাই যে, ইহাদের হাতে রণজিৎ সিংহের শক্তি ক্ষয় হইলে তাহারাই লাভবান হইবেন সর্বাধিক। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ইংরেজেরা পাঞ্জাব দখল পূর্বক তাহাদের অধিকারভুক্ত এলাকার সীমা উপজাতীয় অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। তাহারা যেমন এই সর্ব প্রথম সীমান্তের পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিলেন, তেমনি মুজাহিদ বাহিনী এবং সেই সঙ্গে উপজাতিগুলিও বুঝিতে পারে, রণজিৎ সিংহ অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী বৃটিশের সহিত অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। লোক-চরিত্র বিচারের ক্ষমতা উপজাতীয়দের সত্যই বিস্ময়কর। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে তাহাদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উপজাতিরা না পারিল সঙ্ঘবদ্ধ হইতে, না পারিল তাহারা ভারতবর্ষ হইতে আগত মুজাহিদদিগকে আপন জন হিসাবে মনে করিতে। এজন্যই কোন কোন উপজাতিকে এক সময় বৃটিশের পক্ষ হইয়া মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এবং অন্য সময় মুজাহিদদের পক্ষ হইয়া বৃটিশ ও অন্যান্য উপজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে।

তিতুমীর

সৈয়দ আহমদ যখন তাঁহার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অনুচরবর্গ সহ সীমান্ত অঞ্চলে শিখদের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে রত, বাংলাও তখন একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল না। রাজধানী কলিকাতার অনতিদূরে তিতুমীর নামক জনৈক দেশ-প্রেমিক জনসাধারণের সমবায়ে একটি ছোটখাটো দল গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তিতুমীরের প্রকৃত নাম ছিল নিসার আলি। চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর

গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত মুসলমান গৃহে তাঁহার জন্ম এবং স্থানীয় একটি জমিদার পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসক-শ্রেণীর অন্যায় আচরণ দর্শনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। শরীরে তাঁহার যথেষ্ট শক্তি এবং বুকে অদম্য সাহস ছিল। অন্নবস্ত্রের চিন্তাও তাঁহার ছিল না। একটি বিপ্লবী দল গঠনের কাজে হাত দিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরা নিঃস্ব এবং নিরবলম্ব হইয়া পড়িলেও একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই। দেশের ডাকে এবং ধর্মের নামে তাহারা জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে কখনও কুণ্ঠিত হইবে না। বলা বাহুল্য, তাঁহার সামান্য চেষ্টায় একটি দল গঠিত হইয়া যায়। কিন্তু গ্রাম্য দলাদলির দরুন এসময় তিনি একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িত হইয়া পড়েন। বিচারে তাঁহার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি কতিপয় অনুচর সহ মক্কায় গমন করেন। সেস্থানে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সঙ্গে তাঁহার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দলের পুনর্গঠন উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে ব্যাপক সফর করেন। তাঁহার আবেদন কোথাও ব্যর্থ হয় নাই। সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক পেশোয়ার দখলের সংবাদ বাংলায় পৌঁছিলে, তিতুমীরের অনুচরদেব সাহস অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজও জোরেসোরে চলিতে থাকে। পাঞ্জাবী মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার যেভাবে বৃটিশকে বাদ দিয়া সৈয়দ আহমদকে শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করিয়াছিল, বাংলায় হিন্দু জমিদারদের ঔদ্ধত্যও অনুরূপভাবে তিতুমীরকে বৃটিশের পরিবর্তে তাহাদেরই বিরুদ্ধে প্রথমে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য করে। তিতুমীর চব্বিশ পরগণার জনৈক অত্যাচারী হিন্দু জমিদারের সমুচিত শাস্তির বিধান করিয়া অন্যান্য জমিদারের ভীতির কারণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ত্রস্ত জমিদারগণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। ইহাদের আবেদনক্রমে জেলা কর্তৃপক্ষ তিতুমীরকে দমনের জন্য কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইয়া দেন। তিতুমীরের অনুচরেরা ইহাদের কয়েক জনকে হত্যা এবং অবশিষ্ট পুলিশকে তাড়াইয়া দেয়। এই ঘটনার পর পার্শ্ববর্তী অপর দুইটি জেলায়ও হিন্দু

জমিদারদের প্ররোচনায় কর্তৃপক্ষ তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত অকারণে বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন।

১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে চব্বিশ পরগণার জেলা-কর্তৃপক্ষ ইহাদের উচ্ছেদের জন্য 'ক্যালকাটা মিলিসিয়া' নামক সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল প্রেরণ করেন। ইহাদের সাহায্যার্থ পরে কিছু সংখ্যক গোরা সৈন্যও প্রেরিত হয়। তিতুমীরের অনুচরেরা ইহাদের অনেককে যমালয়ে প্রেরণ করেন। এ সংবাদ কলিকাতা পৌঁছিলে কর্তৃপক্ষ এবার বেশ কিছু সৈন্য ঘটনাস্থল অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বাধে। তিতুমীরের অনুচরেরা অসাধারণ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু সুশিক্ষিত ও নানা মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণের মুখে একটি দিনও টিকিয়া থাকিতে পারিল না। স্বয়ং তিতুমীর বহু সংখ্যক অনুচরসহ তাঁহার বাঁশের কেল্লার মধ্যে নিহত হইলেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট অনুচরদের বেশীর ভাগ রাজদ্রোহের অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য ও সহকর্মীর ফাঁসি হইয়া যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সত্যিকার সংগ্রামে তিতুমীরের দান অনুল্লেখযোগ্য বিবেচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি স্বীয় রক্তে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের যে পথ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন, উত্তরকালে সেই পথই বাহিয়া ভারতবাসীদিগকে তাহাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইয়াছে। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিতুমীর তাই একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম।

এ সময় নিম্ন বাংলায় বিশেষ করিয়া ফরিদপুর, ঢাকা ও বাখরগঞ্জে ফরাইজী আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম হাজি শরিয়ত উল্লা। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। এই আন্দোলন প্রবর্তনের পশ্চাতে তাঁহার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কিন্তু বিধর্মী বৃটিশের অধিকৃত ভারতবর্ষে জুম্মার নামাজের সার্থকতা এবং বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ফরাইজীরা রাজনৈতিক কারণে শাসকগোষ্ঠির কোপানলে পতিত হয়। ফরাইজীরা বৃটিশ ভারতবর্ষকে 'দারুল হারাব' ঘোষণা করিয়া জুম্মার নামাজ হইতে মুসলমানদিগকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে সরকার এই মতবাদের বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক আলেমের নিকট হইতে

ফৎওয়া সংগ্রহ করেন এবং ফরাইজীদিগকে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়া তোলেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ফরাইজী আন্দোলন দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষে গিয়া দাঁড়ায়। গোড়ার দিকে তাহাদের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের মতানুসারীদের তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ছিল না। এমন কি ইহাদিগকে দলে টানিবার জন্য পাটনা কেন্দ্রের পরিচালকবর্গ বিশেষভাবে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাইজীরা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। পরে ফরাইজী-দের গতিবিধির উপর সরকারের পক্ষ হইতে নানা বিধি-নিষেধ আরোপিত হইতে থাকিলে পাটনা কেন্দ্রের পরিচালক পীর এহিয়া আলি তাহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যের বিপদের কথা বুঝাইয়া দেন। ইঁহারই আহ্বানে তাহারা পাটনা কেন্দ্রের নেতৃত্ব স্বীকার পূর্বক তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর নিম্ন বাংলায়ও সৈয়দ আহমদের মতানুসারীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে ফরাইজীদের যোগদানের ফলে পাটনা কেন্দ্রের শক্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এ সময় হইতে কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়, ইহারা একে অপরকে ত্যাগ করে নাই। হাজি শরিয়ত উল্লাহর স্থলাভিষিক্ত পীর দুদু মিয়ার সময় ফরাইজী আন্দোলন বাংলার অনেক জেলায় বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁহার পুত্র পীর বাদশা মিয়া অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং তদহেতু কারাবরণ করিয়া পূর্ব পুরুষগণের ঐতিহ্য রক্ষা করেন।

সৈয়দ আহমদ কিম্বা তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে কেহই নিজেদের ওহাবী বলিয়া কখনও পরিচয় দিয়া যান নাই। বস্তুতঃ তাঁহারা আবদুল ওহাবের মতামত সব ক্ষেত্রে গ্রহণও করেন নাই। তাঁহারা মুজাহিদ নামেই অভিহিত হইতে গৌরবানুভব করিতেন। তথাপি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে ওহাবী আখ্যা দিয়া তাঁহাদের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের অহেতুক বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এক্ষেত্রে কিছুটা সফলকামও হইয়াছিলেন। এ জন্য ওহাবী মতবাদের প্রবর্তক আবদুল ওহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়া রাখা আবশ্যক।

আবদুল ওহাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে আরবের নজদ নামক ক্ষুদ্র প্রদেশবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত সরদারের পুত্র আবদুল ওহাব মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান-সমূহে অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়েন। অবসর সময়ে দামেস্ক শহরের নিকটে কোন এক নির্জন স্থানে বসিয়া তিনি ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেন। প্রথমে তিনি স্বীয় বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট এবং পরে প্রকাশ্যে এ সকল অনাচারের নিন্দা করিতে থাকেন। আরবের এক বৃহৎ অংশ তখন তুরস্ক সুলতানের শাসনাধীন ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তুর্কীরা বিশেষ করিয়া তুর্কী শাসক শ্রেণী তাহাদের বহু আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিল। কথায় কথায় ইহারা ইসলামের দোহাই দিত এবং নিজেদের কায়েমী স্বার্থে ইহাকে ব্যবহার করিত। তাহারা জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্ধতা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত অথচ ভিতরে বাহিরে নিজেরাই ইসলাম হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। আবদুল ওহাব ইহাদিগকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিতে গিয়া শীঘ্রই রাজরোষে পতিত হন। তুর্কী শাসন-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অবাঞ্ছিত লোক আখ্যা দিয়া দামেস্ক শহর হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি এস্থান, সেস্থান পরিভ্রমণে বহু দিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দেরাইয়ার সরদার মোহাম্মদ ইবনে সৌদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহারই সাহায্যে তিনি বেদুঈনদের সমবায়ে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনী গঠন পূর্বক প্রথম সুযোগে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দেন।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া ক্ষতিকর বিবেচিত হইত বলিয়া তুর্কীরা আরবের মরু অঞ্চলে তাহাদের সাক্ষাৎ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকারের চেষ্টা কোন সময় করেন নাই। তাহা ছাড়া বেদুঈনদিগকে সাধারণ নাগরিকের ন্যায় সংসার ধর্ম পালনে বাধ্য করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। ধর্মপরায়ণ বলিয়া বেদুঈনদের কোন সুখ্যাতি না থাকিলেও, তীর্থস্থানে তুর্কী পাশা ও বে'র অনাচারের বিরুদ্ধে তাহারা প্রাণপণ জেহাদের শপথ গ্রহণ পূর্বক আবদুল ওহাবের দলের পুষ্টিসাধন করিতে থাকে। এরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে মরু অঞ্চলে বিশেষ করিয়া নজদ্ প্রদেশে আবদুল ওহাবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত

হইয়া যায়। মোহাম্মদ ইব্‌নে সৌদের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়া আবদুল ওহাব সমগ্র নজ্‌দের শাসন ক্ষমতা তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে স্বয়ং সর্বময় কর্তা হইয়া রহিলেন।

পবিত্র কোরআনে নির্দেশিত নিয়ম কানুন অনুসারে এই নূতন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা রচিত ও প্রবর্তিত হয়। চতুর্থ খলিফার আমলের পর এই সর্বপ্রথম কোরআনকে ভিত্তি করিয়া একটি দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা চলে। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের তুর্কী শাসনকর্তা আবদুল ওহাবের অনুচরদের দমনের জন্য এক অভিযান প্রেরণের আদেশ দেন। কিন্তু অভিযাত্রী বাহিনী ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়া বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে। এই সংঘর্ষের পর আবদুল ওহাব একটি নিয়মিত সৈন্য বাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য যুদ্ধের সময় শত্রুদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তির চারি-পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দেশের উৎপন্ন শস্য, আমদানী এবং রফ্‌তানীর উপরও কর ধার্য হইতে থাকে। দুঃখের বিষয়, নূতন নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হওয়ার স্বল্পকাল পরেই হঠাৎ আবদুল ওহাব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে অনুচরেরা তাহাদের প্রিয়তম নেতাকে হারাইল বটে, কিন্তু আদর্শ ও সঙ্কল্প তাহারা অচল অটলই রহিল। উপরন্তু নূতন মতবাদ অনুসারীর স্বাভাবিক গোঁড়ামী লইয়া ইহারা রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির জন্যও অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠে। ১৭৯১ সালে মক্কার শাসন কর্তা শেরিফের বিরুদ্ধে এক অভিযানে বহির্গত হইয়া ইহারা তাঁহার প্রভূত ক্ষতি সাধন করেন। ইহার মাত্র ছয় বৎসর পর বাগ্‌-দাদের গভর্ণরকে একটি ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহারা ইরাকের একটি এলাকা নজ্‌দের অধিকারে লইয়া যায়। ১৮০১ সালে লক্ষাধিক মুজাহিদ মক্কানগরী আক্রমণ পূর্বক কয়েক মাসের মধ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া তথা হইতে তুর্কী শাসনের বিলোপ সাধন করে। দুই বৎসর পর তাহারা মদিনা দখল করিয়া হেজাজ প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের উপরও নিজেদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। কবরপূজা এবং অনুরূপ কার্যাদি বন্ধের উদ্দেশ্যে তাহারা মক্কা ও মদীনার দরবেশ এবং পীর-ফকিরের

কবরের উপর নির্মিত কতিপয় সৌধ ভাঙ্গিয়া দেয়। এমন কি হজরত মোহাম্মদের রওজারও একটা অংশ তাহাদের হাত হইতে সে সময় রক্ষা পায় না।

আবদুল ওহাবের অনুচরদের এ সকল কার্যে দুই শ্রেণীর মুসলমানরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়। যথা, কবরের পাশে দাঁড়াইয়া যাহারা ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিত এবং যাহারা কবরের হেফাজতের নামে দর্শনপ্রার্থীদের নিকট হইতে টাকা-পয়সা আদায় করিয়া উহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। তুর্কীদেরও ক্রোধের অন্ত ছিল না—ধর্মীয় কারণে নয়, বরং পবিত্র মক্কা ও মদীনার উপর হইতে তাহাদের ক্ষমতার বিলুপ্তিতে। তুর্কীর সুলতান ছিলেন তখন মুসলমানদের স্বমনোনীত খলিফা। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যস্থান দুইটি হস্তচ্যুত হইয়া পড়ায় তাঁহার খিলাফতের দাবী অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বাহুবলে মক্কা ও মদীনা পুনরধিকার সহজ হইবে না মনে করিয়া, তুর্কীরা আবদুল ওহাবের অনুচরদের বিরুদ্ধে এমন সব মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া সারা বিশ্বের মুসলমানদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্রতী হন, যে সকল অভিযোগ ন্যায়তঃ তাহাদেরই বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা যাইত। তুর্কীরা দীর্ঘকাল তিনটি মহাদেশে পরিব্যাপ্ত একটি বিশাল সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য কায়েম রাখিয়া প্রচারকার্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা আবদুল ওহাবের মতানুসারীদিগকে যেভাবে চিত্রিত করিয়া মুসলিম জগতের কাছে উপস্থিত করিলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহারা তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইল। এই অপপ্রচারের দরুন ১৮০৩ হইতে ১৮০৬ সাল পর্যন্ত আরবের বাহির হইতে খুব বেশী সংখ্যক লোক হজব্রত পালন করিবার জন্য মক্কায় গমন করে নাই।

আবদুল ওহাবের অনুচরেরাও এসময় সুবোধ বালকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারা তুর্কীদের হাত হইতে গোটা সিরিয়া প্রদেশটি ছিনাইয়া লইয়া তুরস্কের তৎকালীন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইহা দেখিয়া মিসরের খেদিভ মোহাম্মদ আলি পাশা তুরস্ক সুলতানের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে পরাস্ত হইয়া ইহারা সিরিয়ায় ফিরিয়া আসে। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে খেদিভের অন্যতম সেনাপতি স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী টমাস কীথ এক বিশাল

বাহিনী লইয়া মদীনা আক্রমণ ও উহা অধিকার করেন। পর বৎসর মক্কা নগরীও তাঁহাদের অধিকারে চলিয়া যায়। পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবদুল ওহাবের অনুচরদের সামরিক শক্তি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং নজ্‌দ ব্যতীত আরবের অন্যান্য এলাকা একটির পর একটি করিয়া তাহাদের হাতছাড়া হইয়া পড়ে।

সামরিক শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা অতঃপর শুধু ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করে। আবদুল ওহাবের ন্যায় যে ব্যক্তি ইসলামের নামে অনাচার এবং ধর্মকর্মে শৈথিল্যের জন্য তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, মুসলমানদের উপর অমুসলমানদের শাসন তিনি যে বরদাশত করিতে পারেন না ইহা খ্রীস্টানদের অনুমান করিয়া লইতে মোটেই কষ্ট হয় নাই। একবার যদি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিধর্মী বিদ্বেষ জাগরিত হয়, তাহা হইলে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাহাদের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ইসলামের জন্য মায়াকান্না শুরু করিয়া দেন। তাই দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যখনই কোন মুসলমান দেশপ্রেমিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ইংরেজেরা তাঁহাকে ওহাবী আখ্যা দিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহার বিরুদ্ধে সেলাইয়া দিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদান ও বিকল্পে নির্যাতনের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বশংবদ আলেমদের নিকট হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, তুর্কীদের বেতনভুক শেরিফের আজ্ঞাবহ কর্মচারীর নিকট হইতে নিজেদের জন্য সার্টিফিকেট আনাইয়াছেন; এমন কি, খাস আরব দেশ হইতেও প্রচারক আনিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নিজেদের রচিত অলীক কাহিনী তাহার মুখে প্রচার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারিগণকে দিয়া তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সাহায্যে প্রতি জেলায় আঞ্জুমানে ইসলামিয়া, হেজবুল্লাহ সমিতি ও আঞ্জুমানে এশায়াতে ইসলাম প্রভৃতি কায়েম করাইয়া দেশপ্রেমিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে উহাকে ব্যবহার করিয়াছেন।

এক কথায়, আজকাল যেমন কমিউনিস্টদের হাত হইতে পবিত্র ইসলামকে রক্ষার নাম করিয়া নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইউরোপ

ও আমেরিকার নামসর্বস্ব খ্রীস্টান শক্তিগুলি কোটি কোটি পাউণ্ড এবং ডলার অকাতরে খরচ করিতেছে, গত শতাব্দীতেও ঠিক তেমনি ওহাবীদের হাত হইতে ইসলামকে রক্ষার দায়িত্ব ইংলণ্ডের খ্রীস্টানরা স্বেচ্ছায় নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্‌তালা তাহাদিগকে জান্নাতে ফেরদৌস বখ্‌শিস করেন কিনা বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে, এই ইসলাম-রক্ষা অভিযানে তাহারা শত শত মুসলমানকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া অথবা সুদূর আন্দামানে নির্বাসনে পাঠাইয়া অন্ততঃপক্ষে তাহাদের পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে। ইহাদেরই হাতে নির্যাতনের ভয়ে মুজাহিদগণ অতঃপর কখন সাধু-ফকিরের বেশে এবং কখনও ব্যবসায়ীর বেশে প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। তবু এদেশে বৃটিশ শাসন তাহারা সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই।

ঝড়ের পূর্বাভাস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশের ভারতবর্ষের ইতিহাস বহু জটিলতায় পূর্ণ। এ সময়ে একদিকে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষের উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি অন্যদিকে আবার তাহাদের বিতাড়নের প্রচেষ্টাও দানা বাঁধিয়া উঠে। সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ডযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং বিদ্বেষ প্রচারের ভিতর দিয়াই ইংরেজদের প্রতি এদেশবাসীর মনোভাবের প্রতিফলন হইতে থাকে। বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিলে ইংরেজদের পক্ষে এদেশে তখন টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিয়া বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত ও একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে তাহা নিয়োগের জন্য সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ব্যতীত অপর কাহারও সেই ক্ষমতা ছিল না কিন্তু তিনি আর তখন জীবিত ছিলেন না। অবশ্য ১৮৫৭-৫৮ সালে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে তাহাও শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের এই মহান ব্যর্থতার ইতিহাস অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে উহার পূর্ববর্তী অর্ধ-শতাব্দীর প্রধান ঘটনাগুলিরই মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহীশূরের সর্বশেষ যুদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহার প্রবর্তিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি পুরোপুরি-ভাবে কার্যকর করিতে অগ্রসর হন। এই নীতি অনুসারে এদেশীয় রাজন্য-বর্গকে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজদের উপর ভরসা করিয়া থাকিতে আহ্বান জানান হইত। ইহার বিনিময়ে ইংরেজেরা তাঁহাদের রাজ্যের সীমা অক্ষুন্ন এবং বৈদেশিক কিংবা দেশীয় অন্যান্য সামন্ত রাজার কল্পিত আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষার আশ্বাস দিতেন। যিনি এই নীতি স্বীকার করিয়া লইতেন, তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে নিজের খরচে একদল ইংরেজ সৈন্য পুষিতে হইত এবং ইংরেজদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া কিংবা সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে তাঁহার সমস্ত অধিকার লোপ পাইত। তৎকালীন বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে হায়দরা-বাদের নিজামই সর্বপ্রথম এই অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণপূর্বক নিজের এবং তৎসঙ্গে সমগ্র দেশের জন্য সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন।

লর্ড ওয়েলেস্লীর আমলে এদেশে ইংরেজদের রাজ্যের সীমা বেশ সম্প্রসারিত হয়। টিপু সুলতানের পতনের পর ইংরেজেরা তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি অধিকার করেন। মহারাষ্ট্র নায়কগণের অন্তর্দ্বন্দের সুযোগ লইয়া লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহাদের প্রত্যেককে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। তাঁহারা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ফলে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে পেশওয়া এবং পর বৎসর সিন্ধিয়া ভোঁসলা পরাজিত হইয়া উক্ত নীতি গলাধঃকরণে বাধ্য হন এবং তাঁহাদের রাজ্যের সীমা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

লর্ড হেস্টিংসের আমলে ইংরেজেরা নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং তরাই অঞ্চলের একটা বৃহৎ অংশ তাহাদের দখলে আনয়ন করেন। এসময় সিকিম রাজ্যটিও তাহাদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। তাঁহারই আমলে পিণ্ডারীদের সামরিক শক্তি চিরদিনের জন্য লোপ পায়। গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে ইঁহারই কার্যকাল ছিল দীর্ঘতম।

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পেশ্ওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে লর্ড হেস্টিংস তাঁহাকে অষ্টীর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। বাজীরাও

অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এইরূপে মহারাট্টা শক্তি চিরকালের জন্য খর্ব হইয়া পড়ে। অতঃপর পাঞ্জাব, সিন্ধু, নেপাল ও আসাম ব্যতীত ভারতে আর কোন উল্লেখযোগ্য স্বাধীন রাজ্যই রহিল না। অযোধ্যা ইতিপূর্বেই ইংরেজদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। হেস্টিংসের আমলে ১৮১৬ সালে বেরেলীর জনসাধারণ অতিরিক্ত করভাবে অতিষ্ঠ হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বহু সংখ্যক পিণ্ডারীও ইহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ইহাদিগকে দমন করিতে হেস্টিংসকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এই সময় ইংরেজ সৈন্যরা রোহিলা খণ্ডে আর এক দফা অপরাধী নিরপরাধী নির্বিশেষে সকলের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। এদিকে দ্বিতীয় বার পরাজয়ের পর পেশওয়া তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া কানপুরের নিকটে বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক স্বনামধন্য নানা সাহেব ইঁহারই দত্তক পুত্র।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে হোল্‌কারকে সাহায্য দানের জন্য ভরতপুরের রাজার উপর তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তাই ১৮২৬ সালে তাঁহারা হঠাৎ ভরতপুর আক্রমণপূর্বক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাদেরই বশংবদ অপর এক ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। নানা কারণে ১৮২৪ সালে ইংরেজদের সহিত ব্রহ্মরাজ্যেরও যুদ্ধ বাধে। ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণে বর্মার সৈন্যরা আসাম ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। অতঃপর বাষ্পীয় পোতে করিয়া একদল ইংরেজ সৈন্য রেঙ্গুনের নিকট উপস্থিত হয়। বর্মার সৈন্য এবং জনসাধারণ তৎপূর্বে কখনও বাষ্পীয় পোত না দেখায় অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ফলে একপ্রকার বিনা যুদ্ধেই রেঙ্গুন অধিকৃত হয়। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরেজদের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে আসাম, আরাকান, টেনেসেরিয়মের উপকূল ও মার্তবানের কিয়দংশ ইংরেজ শাসনাধীনে চলিয়া যায়। তখন হইতে ব্রহ্মদেশের অন্যান্য অংশেও ইংরেজদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বার্মার অধিকৃত এলাকাগুলি ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেলের শাসনাধীন রাখা হয়।

৫—

ফারসী ভাষার নির্বাসন

গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে জয়ন্তিকা, কাছাড়, কুর্গ, এবং সঙ্কুচিত মহীশূর রাজ্য ইংরেজ শাসনাধীন হইয়া পড়ে। তিনি দেশের সকল নিম্ন আদালতে ফারসী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন এবং উচ্চ আদালতের জন্য ইংরেজী ভাষা নির্দিষ্ট করেন। এই ব্যবস্থার দরুন বহু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান হঠাৎ বেকার হইয়া পড়েন। মুসলমানদের সামরিক শক্তি খর্ব, রাজনৈতিক চেতনাশক্তি লোপ এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটাইয়া ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির উপর তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া তোলার জন্য হেস্টিংস হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর কয়েক জন গভর্ণর জেনারেল মুসলমান জমিদারগণের জমিদারী, জায়গীর, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও মুসলমান যুবকদের জন্য সামরিক বিভাগের সর্বপ্রকার চাকুরীর দ্বার বন্ধ এবং অন্যান্য যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার উপর আবার অফিস-আদালত হইতে ফারসী ভাষার নির্বাসন ঘোষিত হওয়ায়, নিজস্ব বলিতে মুসলমানদের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। ফলে তাহাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জাগিয়া উঠে। রাজনৈতিক দিক ছাড়া ইহার আরও একটা দিক ছিল। দেশের শাসনক্ষমতা হইতে বিচ্যুত এবং জমিদারী, তালুকদারী ও বড় বড় পদ হইতে বঞ্চিত হওয়ার পরও বহু বৎসর মুসলমানরা এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারার উপর তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিতেছিল। ফারসী ভাষার নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে।

লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় সৈয়দ আহমদের মুজাহিদ বাহিনীর সহিত শিখদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাংলায় তিতুমীরেরও পতন ঘটে প্রায় একই সময়ে। কিন্তু তাঁহাদের অনুচরবর্গের প্রচারের ফলে এবং ফারসী ভাষার নির্বাসনের দরুন মুসলমানদের মধ্যে বিজাতীয় বিদ্বেষ পূর্বাপেক্ষা অধিক এবং ব্যাপকতর আকারে প্রকট হইয়া উঠে। তৎকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনকে মুসলমানদের অস্তিত্বের পক্ষে ইংরেজদের নিষ্ঠুরতম আঘাত হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহা হইতে দূরে থাকার এবং সাধ্যমত উহার বিরোধিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইংরেজী

শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্য হারাম এবং ভারতবর্ষকে 'দারুল-হারাব' অর্থাৎ বিধর্মী শাসনাধীন দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়া এ-সময় ফৎওয়া (ধর্মীয় নির্দেশ) জারী হয়।

মুসলমানদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠান সে সময় না থাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার দায়িত্ব একান্ত স্বাভাবিকভাবে সৈয়দ আহমদের অনুচরবর্গেরই উপর বর্তায়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য ইহাদিগকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল যে কঠোর সাধনা এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার নজীর বিরল। কেহ কেহ বলেন, নূতন করিয়া মুসলমানরা যখন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হয়, তখন সৈয়দ আহমদের ন্যায় কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোক যদি উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ১৮৫৭ সালের পূর্বেই ইংরেজদিগকে সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষা অধিক এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হই । দেশের ও জাতির স পেক্ষা প্রয়োজনের দিনে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মুসলমানরা তজ্জন্য নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে নাই। বরং সেই অভাব পূরণের জন্যই যেন প্রত্যেকটি কর্মী জীবনপণ করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

অপরপক্ষে ইংরেজরাও এ সময় এমন দুইটি ভুল করিয়া বসেন যেজন্য মুজাহিদগণের কাজ সহজতর হইয়া পড়িয়াছিল। এই ভুল দুইটি ই রেজ বিদ্বেষ-বহ্নি বিস্তারে ঘৃতাহুতির ন্যায় কাজ করিয়াছে।

আফগানিস্তানের আমীর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর গভর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ১৮৩৯ সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কান্দাহার ও গজনী অধিকার করেন। আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খান ভয়ে পলায়ন করেন। ইংরেজেরা তৎস্থলে আফগানদের অশ্রদ্ধ ভাজন শাহ শুজাকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু দোস্ত মোহাম্মদের পুত্র আকবর খান বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করেন। ব্যাপক বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া ইংরেজ বাহিনী ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়। পথে আফগানেরা অতর্কিত আক্রমণের

সাহায্যে পনর হাজার ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করে। ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন অতিকষ্টে এ-নিদারুণ সংবাদ ভারতে বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হন। এই দুঃখ ও ক্ষোভের নিরসন এবং পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলার জন্য ইংরেজেরা এ সময় আর একটি ভুল করিয়া বসিলেন।

মোগল আমলের প্রতাপশালী জমিদারগণেরই সমতুল্য সিন্ধুর স্বাধীন আমীরগণ ইংরেজদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি স্যার চার্লস্ নেপিয়ার কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই ১৮৪৩ সালে ইমামপুর দুর্গ অধিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে আমীরগণের রাজ্য আক্রমণ করেন। আমীরগণ ইহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। ইংরেজেরা এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন ইহা কখনও তাঁহারা কল্পনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। উপরন্তু তাঁহারা এই বিশ্বাসই মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন যে, বিপদ-আপদে তাঁহারা ইংরেজদের নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন। এ কারণে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নাই।

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অনুপস্থিতিতে যুদ্ধে তাঁহাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইংরেজেরা নিঃসঙ্কোচে সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ নিজেদের অধিকারে লইয়া যান। স্যার চার্লস্ নেপিয়ার এই উপলক্ষে নির্বিচারে সিন্ধুর জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, ভারত উপমহাদেশ হইতে ইংরেজদের প্রস্থানের পরও করাচীর একটি প্রধান সড়ক নেপিয়ারের নামটি সগৌরবে বহন করিয়া চলিয়াছে।

বিনা কারণে এবং অতর্কিতে সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকারের সংবাদ প্রচারিত হইলে, পশ্চিম ভারতেও ইংরেজ বিদ্বেষ দানা বাঁধিতে থাকে। সিত্তানা এবং পাটনা কেন্দ্র এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে কোন রকম ত্রুটি করে নাই। বস্তুতঃ সিন্ধুবিজয় এবং অযোধ্যা অধিকারের মধ্যবর্তী সময়েই মুজাহিদ নেতৃবর্গ সংগঠন ব্যাপারে সর্বাধিক তৎপরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৮৪৩ সালের শেষভাগে পাটনা কেন্দ্রের শাখা হিসাবে মালদহে একটি প্রচার-অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় অনুরূপ অফিস স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে সেই চেষ্টা পরে

পরিত্যক্ত হয়। সৈয়দ আহমদের জন্মভূমি বেরেলীর উপরও মুজাহিদগণের নজর পড়িয়াছিল। কিন্তু সমগ্র রোহিলাখণ্ডের উপর ইংরেজেরা প্রথমাবধি কড়া দৃষ্টি রাখিয়াছিল। তদুপরি ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের প্রজা-বিদ্রোহ ইংরেজদিগকে রোহিলাদের সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিল। এ সকল কারণে মুজাহিদ নেতৃবর্গ তথায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অফিস খোলা সমীচীন মনে করেন নাই। তবে সেস্থানেও গোপন প্রচারকার্য সমানভাবেই চলিতে থাকে।

সিন্ধু অধিকারের পর ইংরেজ শাসক শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ব্যক্তিগণ আশঙ্কা করিতে থাকে, কোন না কোন অজুহাতে অতঃপর তাঁহারা অযোধ্যা রাজ্যটিও গ্রাসের চেষ্টা করিবেন। ওয়াজেদ আলি শাহ ছিলেন তখন অযোধ্যার নওয়াব। বহু বৎসর পূর্ব হইতে অযোধ্যার উপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। পূর্ববর্তী তিনজন নওয়াবের নিকট হইতে নানা অজুহাতে তাঁহারা বিভিন্ন সময় রাজ্যের কয়েকটি এলাকা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোম্পানী তাঁহাদের বিপদ আপদে যখনই অযোধ্যার যে কোন নওয়াবের সাহায্য চাহিয়াছেন, তাহাই পাইয়াছেন। হেস্টিংস কর্তৃক অযোধ্যার বেগমদের নিকট হইতে জোরক্রমে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থের কথা বাদ দিলেও, কোম্পানী নেপাল ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিন কোটি টাকা, আফগান যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হাতী, ঘোড়া ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পাইয়াছেন। তবু তাঁহারা অযোধ্যা গ্রাসের চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন নাই। মুজাহিদ নায়কগণ নানাভাবে নওয়াবকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁহার এতটা শ্রদ্ধা এবং আস্থা ছিল যে, তিনি তাঁহাদের সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। ইংরেজেরা তাঁহার 'ভালো মানুষী' ও দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার দরবারে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতে থাকেন। দূরদর্শী মুজাহিদ নায়কগণ তখনই ধরিয়া লইয়াছিলেন, চক্ষু-লজ্জার খাতিরে যদি সরাসরিভাবে দখল নাও করা হয় তবু ইংরেজদের হাত হইতে অযোধ্যার নিষ্কৃতি নাই। এজন্য নওয়াবের অসন্তুষ্টির ঝুঁকি

লইয়া অযোধ্যায়ও তাঁহারা ইংরেজ-বিরোধী প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন কিন্তু ওয়াজেদ আলির পদচ্যুতির পূর্বে ইহা তথায় বিশেষ কার্যকর হইতে পারে নাই ; কারণ প্রজারঞ্জক নৃপতি হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

শিখ যুদ্ধ

১৮৩৯ সালে ইংরেজবন্ধু, শিখরাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর পর, তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্র দিলীপ সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রণজিৎ সিংহের শক্তিশালী সৈন্যদিগকে বালক দিলীপ শাসনে রাখিতে পারিলেন না। তাহারা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ১৮৪৫ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কতিপয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে শিখদের পরাজয় ঘটে। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে উভয় পক্ষের মধ্যে যেই সন্ধি হয়, উহার শর্ত অনুসারে ইংরেজেরা কাশ্মীর, হাজরা জেলা, জলন্ধর, দোয়াব প্রভৃতি স্থান লাভ করেন। বিজয়ী ইংরেজেরা পাঞ্জাবের অবশিষ্টাংশের উপর দিলীপ সিংহের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিখ সৈন্যসংখ্যা অনেক হ্রাস করিয়া দেন এবং স্যার হেনরী লরেন্স লাহোরে শিখ দরবারে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। অতঃপর ইংরেজেরা প্রায় চারি কোটি টাকার বিনিময়ে জম্মুর শাসনকর্তা গোলাব সিংহের নিকট সমগ্র কাশ্মীর বিক্রয় করিয়া দিয়া তাহাদের অর্থ সঙ্কট দূর করেন। এইরূপে জম্মু ও কাশ্মীর একই ব্যক্তির শাসনাধীন হইয়া পড়ে। বর্তমানের ন্যায় তখনও জম্মু এবং কাশ্মীর যথাক্রমে অমুসলিম ও মুসলিম-প্রধান রাজ্য ছিল। কাশ্মীরের তদানীন্তন শাসনকর্তা নওয়াব ইমাম উদ্দীন কিছুতেই গোলাব সিংহ ডোগরার হাতে কাশ্মীর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইতেছিলেন না। ইহা দেখিয়া স্যার হেনরী লরেন্স মালিক ফতেহ খান তিওয়ানাকে জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজদের সঙ্গে কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। মালিক ফতেহ্ খান ছিলেন নওয়াব ইমাম উদ্দীনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহারই চেষ্টায় নওয়াব ইমাম উদ্দীন কাশ্মীর ছাড়িয়া দেন এবং তথায় গোলাব সিংহের স্বৈরাচারী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের পর লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত ছিল সে-সময় গোঁড়া

সাম্রাজ্যবাদী একটি রাজনৈতিক দলের উপর। ইঁহাদের সমর্থনের ভরসায় তিনি ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অর্ধস্বাধীন রাজ্যগুলি অধিকারের ফন্দি আঁটেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে ১৮৪৮ সালে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পর বৎসর চালিনওয়ালা নামক স্থানে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এবার আর সন্ধির কথা উঠিল না। ডালহৌসী সমগ্র পাঞ্জাবকে বৃটিশ শাসনাধীন করিয়া দিলীপ সিংহের জন্য বার্ষিক একটা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে বিলাতে প্রেরণ করেন। দিলীপ সিংহ খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক ইংলণ্ডেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। দিলীপ সিংহের মাতা রাণী ঝিন্দন কাশীতে নির্বাসিতা হইলেন। শিখ সেনাপতি খান সিংহ এবং দিলীপ সিংহের অন্যতম মন্ত্রী গঙ্গারাম প্রমুখ লাহোর দরবারের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইল।

লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলেই বৃটিশের রাজ্যের সীমা উপজাতীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইহার পরিসর ছিল পূর্বে নেহাৎ কম। এক্ষণে উহা কয়েক শত মাইলে গিয়া দাঁড়ায়। দুই জন ইংরেজ কর্মচারীর উপর অত্যাচারের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া লর্ড ডালহৌসী ১৮৫০ সালে সিকিমের একটা বিরাট অংশ গ্রাস করেন। ইহার পর ৮৫২ সালে তিনি ব্রহ্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রেঙ্গুন, বেসিন এবং পেগু অধিকার করেন।

যে সকল দেশীয় নৃপতির রাজ্য দখল করিবার পূর্বে তাঁহাদের সামরিক শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া একই সঙ্গে উভয় অভিলাষ পূর্ণ করেন। পক্ষান্তরে যে সকল সামন্ত নৃপতির সামরিক শক্তি তাঁহার নিকট বিপজ্জনক বিবেচিত হয় নাই, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয় এবং অযথা অর্থব্যয়ও হয়, এজন্য তিনি কুখ্যাত স্বত্বলোপ নীতির উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেন।

অপুত্রক অবস্থায় কোন সামন্ত রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার রাজ্য ইংরেজদের অধিকারে চলিয়া যাইবে, ইহাই ছিল উক্ত নীতির প্রধান বিধান। হিন্দুদের ক্ষেত্রে দত্তক পুত্র ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিকট-উত্তরাধিকারীকেও

স্বীকার না করাই ছিল ডালহৌসীর উদ্দেশ্য। এই নীতির বলে তিনি মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাতারা, কারৌলী, সম্বলপুর, উদয়পুর, নাগপুর, বাঘাট, ঝাঁসী প্রভৃতি রাজ্যগুলি বৃটিশ অধিকারে লইয়া যান। তবে বাঘাট এবং উদয়পুর সম্পর্কিত তাঁহার সিদ্ধান্ত পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। কারৌলী সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্স পরিবর্তন করিয়াছিলেন। আর্কটের নওয়াব তাঞ্জোরের রাজা এবং পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, লর্ড ডালহৌসী প্রথমোক্ত দুইজনের আইনসম্মত উত্তরাধিকারিগণের এবং শেষোক্ত ব্যক্তির দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহারই আমলে ১৮৫৩ সালে এদেশে সর্বপ্রথম রেলওয়ে লাইন সংস্থাপিত, বিখ্যাত গঙ্গা খাল খননের কাজ সমাপ্ত এবং টেলিগ্রামযোগে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এসকল জনহিতকর কার্য করিতে যাইয়াও তিনি দরিদ্র জনসাধারণের নিন্দা অর্জন করেন। কারণ, ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি মোটেই সুবিচার করেন নাই।

কিন্তু লর্ড ডালহৌসী তাঁহার সর্বশেষ এবং নিষ্ঠুরতম আঘাত হানেন অযোধ্যারই উপর। ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তনের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, অযোধ্যা অধিকারের ইচ্ছা তাঁহার মনে ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই সমৃদ্ধিশালী মিত্ররাজ্যটি দখলের কোন অজুহাতই তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। নওয়াব ওয়াজেদ আলি তখন জীবিত এবং তিনি অপুত্রকও ছিলেন না। কাজেই স্বত্বলোপ নীতি প্রয়োগের কোন অবকাশ তথায় ছিল না। অযোধ্যার সৈন্যবলও এত অধিক ছিল না যে, ইংরেজদের পক্ষে বিপজ্জনক বিবেচিত হইতে পারে। তাই তিনি এক্ষেত্রে পূর্ব-অনুসৃত নীতির কোনটিই অবলম্বন না করিয়া ওয়াজেদ আলি শাহকে অযোগ্য শাসক ঘোষণাপূর্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও কলিকাতায় নির্বাসিত করেন।

বিস্ময়ের বিষয়, অযোধ্যায় ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে ইংরেজ রেসিডেণ্ট ছিলেন তিনি, কিম্বা ওয়াজেদ আলি শাহের যে সকল ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা, অথবা অযোধ্যার ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কেহই

তাঁহার বিরুদ্ধে কোন দিন কোন অভিযোগ করিতে পারেন নাই। তদুপরি অযোধ্যাবাসীরাও তাঁহাকে একজন প্রজারঞ্জক নৃপতি হিসাবে শ্রদ্ধা করিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ওয়াজেদ আলি শাহের সিংহাসনচ্যুতির ব্যাপারে লর্ড ডালহৌসী কত বড় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই দীর্ঘ আট বৎসর পরে লর্ড ডালহৌসী যেইদিন ভারতের উপকূল ত্যাগ করেন, সেদিন বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীরা দুই হাত তুলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া থাকিলে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। লর্ড ক্যানিং পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন।

লর্ড ডালহৌসীর ভারত ত্যাগের কয়েক মাস পরেই সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কেন এবং কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ বিষয় কয়টির মধ্যে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অনুচরগণের (মুজাহিদ) প্রচারকার্য সম্পর্কে উপরে আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাহাদের সম্পর্কে পুনরায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে আমরা শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া রাখিতেছি। ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত আমাদের স্বাধীনতার মহাসংগ্রামের বহু বৎসর পর পর্যন্ত এদেশবাসীদের উপর শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচার চলিয়াছিল। নীলকরদের অত্যাচার কোন কোন দিক দিয়া মগ ফিরিঙ্গি এবং বর্গীদের অত্যাচারকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের সেই নির্মম অত্যাচার কাহিনী এক্ষণে ইতিহাসের বিষয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। তথাপি বাংলা ও বিহারের নিভৃত পল্লীতে এখনও ভগ্নোন্মুখ দুই চারিটি নীলকুঠি বিদেশীয়দের সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং অনাচারের কথা বৃথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অত্যাচারী নীলকরদের ন্যায় নিপীড়িতদেরও কেহ আজ আর জীবিত নাই। তাই নীলকরদের বংশধরগণকে দেখিলে আজ আর কাহারও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে না।

নীলকরদের অত্যাচার

আমাদের স্বাধীনতার মহা সংগ্রামে নীল চাষীদের দান নেহাৎ কম নয়। আজকাল যেমন পাটের চাষ হয়, তখনকার দিনে এতটা ব্যাপকভাবে না হইলেও তেমনি নীলের চাষ হইত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কৃষকদের নিকট হইতে স্বল্প মূল্যে নীল খরিদ করিয়া চড়া দামে বিক্রয়ের জন্য উহা বিদেশে চালান দিতেন। ইহাতে তাঁহাদের লাভ হইত প্রচুর। নীলের ব্যবসায়ের উপর বহুকাল তাঁহাদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। বিশাল ভারতবর্ষ তাঁহাদের অধিকারে যাওয়ার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন। অতঃপর ইহা অন্যান্য ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পড়ে। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ইহারা বাংলার বহুস্থানে নিজেদের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কুঠির মালিকরাই আমাদের দেশে নীলকর নামে অভিহিত হইতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিলেন ব্যবসায়ীদেরই একটি সঙ্ঘ। নীলকরেরাও ছিলেন ব্যবসায়ী এবং তাঁহাদেরই স্বজাতি। সুতরাং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায় তাঁহাদেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি যে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

নীলকরেরা লাভের অঙ্ক বাড়াইয়া তোলার জন্য নিরীহ চাষী ও মজুর দিগকে নীলচাষ করিতে এবং নীলক্ষেতে স্বল্প মজুরীতে কাজ করিতে বাধ্য করিতেন। কেহ অস্বীকৃত হইলে তাহার উপর ইহারা অকথ্য অত্যাচার করিতেন। অশ্লীল গালাগালি হইতে আরম্ভ করিয়া কিল, ঘুষি. প্রহার, হাত-পা বাঁধিয়া প্রখর রৌদ্রে সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ফেলিয়া রাখা, দিনের পর দিন নীলকুঠির কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অনাহারে বা অর্ধাহারে আবদ্ধ করিয়া রাখা; এমনকি তাহাদের পরিজনবর্গের উপর পাশবিক অত্যাচার পর্যন্ত বাদ থাকিত না। তা'ছাড়া নীল চাষে বাধ্য করার জন্য ইহারা অনিচ্ছুক চাষীদিগকে আগাম অর্থাৎ দাদন গ্রহণে বাধ্য করিতেন। দলিলে দ্বিগুণ, তিন গুণ টাকার অঙ্ক লিখিয়া অবাধ্য চাষীদের নিকট হইতে যথাসময়ে সুদসহ উহা আদায় করিয়া লইতেন।

ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করিলে ঔদ্ধত্যের জন্য উল্টা অভিযোগকারীরই শাস্তি হইত। তদুপরি কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে নালিশ করা

তখন আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল। দুই বেলা যাহাদের অন্নের সংস্থান ছিল না, তাহাদের পক্ষে তখনকার দিনে কলিকাতায় যাইয়া শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হইত না। সর্বোপরি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের আইন-আদালতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুবিচার লাভের আশাও এই দেশবাসীরা করিতে পারিত না। এমতাবস্থায় নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের অবসানের জন্য মন্দিরে মসজিদে আরাধনা করা ছাড়া অসহায় কৃষকদের সামনে দৃশ্যতঃ অপর কোন পথ ছিল না। কিন্তু ইহা যে বৃথা সান্ত্বনার ন্যায় সাফল্য লাভেরও পথ, ইতিহাসে উহার নজীর নাই। অত্যন্ত বিলম্বে চাষীদের এই জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

নীলকরদের অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জনসাধারণের একাংশ এবং শিক্ষিত সমাজের কিছু সংখ্যক লোক অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। ঠিক এইসময় মিঃ পিটার্স বাংলার ছোটলাট হইয়া আসেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়া তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় সফরে বহির্গত হন। সর্বত্র সহস্র সহস্র লোক মিছিল করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা তাঁহাকে জানান। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নীলকরদের অত্যাচার বন্ধের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। নীলকরেরা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার উপর এমনই এক চাপের সৃষ্টি করেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে নীলকরদেরই অনুকূলে আইন রচনা করিতে হয়। হিতের পরিবর্তে দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়া যাইতেছে এবং আবেদন-নিবেদনে ফল লাভের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া গেল বলিয়া বাংলার চাষীকুল অবশেষে স্বহস্তে ইহার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদনে আশাতীত সাড়া পাওয়া যাইতে থাকে সকল মহল এবং বিভিন্ন স্থান হইতে। ঠিক এসময় বাধিল আমাদের স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম। বহু কৃষক উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এরূপে বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে নীল আন্দোলন ডুবিয়া গেল আপাতদৃষ্টিতে।

জাতীয় মহাসংগ্রামে ইংরেজদের হাতে ভারতবাসীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নীলকরদের ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পায়। সংগ্রামকালীন ক্ষতির পূরণের

জন্য তাহারা আবার জোরেসোরে অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই নূতন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কৃষক সমাজ পূর্বাপেক্ষা এক শক্তিশালী আন্দোলনের সৃষ্টি করে। বাংলা, বিহার ও যুক্ত প্রদেশের ত্রিশ লক্ষের অধিক লোক এই আন্দোলনে যোগদান করে। গ্রামে গ্রামে প্রকাশ্যে ও গোপনে সভাসমিতি এবং সলা-পরামর্শ চলিতে থাকে। কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া কোন কোন নীলকর কুঠি ছাড়িয়া শহরে প্রস্থানপূর্বক ইহাদের দমনের জন্য শাসন-কর্তৃপক্ষকে প্ররোচিত করিতে থাকেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে যাঁহারা চাষীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বেশীর ভাগ ছিলেন মুসলমান। এবারও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিলনা। তবে আন্দোলন পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের উপর। এতদ্ব্যতীত অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলদর্পণ-সম্পাদক দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ হিন্দু শিক্ষিত সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে নানাভাবে এই আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। নীলবিদ্রোহী নেতা রণশ্রান্ত তোরাব আলির উপর ছিল পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব। রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ্‌ নামক জনৈক খ্রীস্টান ধর্মযাজক ছিলেন নীলচাষীদের একজন দরদী এবং উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। চাষীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির জন্য তিনি শ্বেতাঙ্গ সমাজের ক্রোধানলে পতিত হইয়া আদালতের বিচারে অর্থ ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

নিরক্ষর এবং প্রায় সব ক্ষেত্রে নিরন্ন কৃষকদিগকে দিয়া আন্দোলন পরিচালনা করা কত দুরূহ ব্যাপার তাহা অনেকের পক্ষে অনুমান করা পর্যন্ত শক্ত। নীল আন্দোলনের পরিচালকগণ এ ব্যাপারে কতটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা শুধু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে উপলব্ধি হইতে পারে যে, কৃষকেরা কোন সময় হিংসার পথে অগ্রসর হয় নাই। আবেদন নিবেদনের পর্যায় হইতে সত্যাগ্রহ এবং অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ পর্যন্ত তাহারা অহিংস ছিল। আন্দোলনের দ্রুত বিস্তার দর্শনে বৃটিশ সরকার অবশেষে একটি আইন রচনা করিয়া কৃষকদের কিছুটা সুবিধা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে অত্যাচারের পরিমাণ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও শোষণের ব্যবস্থা অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়।

চাষীদের বরাতজোরে ইহার পর জার্মানীতে হঠাৎ কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈয়ারীর ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদেশে ভারতীয় নীলের চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে নীলের চাষ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মহাসংগ্রামের পটভূমিতে আরও যেই সকল কারণ এসময় সুস্পষ্ট ছিল, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাও আলোচিত হইল: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন এদেশীয় সিপাহীরা চরম বিপদের দিনে নিজেরা ভাতের ফেন খাইয়া ইংরেজ সৈন্যদিগকে খাইতে দিয়াছে ভাত। ইংরেজ সৈন্য অপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াও তাহারা মাহিনা লইয়াছে কম। একই অপরাধের জন্য তাহাদের মধ্যে শাস্তিরও বেশ তারতম্য ছিল। ছুটি, পেন্সন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে দেশীয় সিপাহীদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকেই ঠেলিয়া দেওয়া হইত পুরোভাগে। অথচ যুদ্ধজয়ের পর ইংরেজ সৈন্যরা তাহাদিগকে নিজেদের কুলি-মজুর বলিয়াই মনে করিত। এসব কারণে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে।

স্বার্থোদ্ধারের জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সময়-অসময় যে সকল প্রতিশ্রুতি দিতেন কার্য হাসিলের পর নানা খোঁড়া অজুহাতে তাহা পালন করিতে চাহিতেন না। অযোধ্যা দখলের পর এই বলিয়া নওয়াবের সৈন্যবাহিনী তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই আশ্বাসের মর্যাদা তাঁহারা রক্ষা করেন নাই। শাসনকার্যের উচ্চস্তরে নিজেদের মনোনীত লোককে বসাইবার জন্য তাঁহারা নওয়াবের বহু অভিজ্ঞ কর্মচারীকে বিনা কারণে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেসময় তাঁহারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ছাঁটাই কর্মচারিগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাদের জন্য পেন্সন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল, এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাঁহারা আদৌ আগ্রহশীল নহেন, তখন ইহারা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। বিদ্রোহের ধ্বজা উত্থিত হইলে ইহারা তাই দলে দলে উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

ডালহৌসীর অনুসৃত স্বত্বলোপ নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে মহা এক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের কেহই রাজ্য ও উত্তরাধিকার

সম্পর্কে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। ভারতের শিক্ষিত সমাজও এজন্য বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয় না। বলা অনাবশ্যক, উচ্চপদগুলি ভারতবাসীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজদের জন্য সে সময়ে সংরক্ষিত রাখা হইত।

ইংরেজদের রাজ্যের সীমা বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড হইতে দলে দলে খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ এদেশে আসিতে থাকেন। শাসক-গোষ্ঠির আশ্রয়পুষ্ট এই ধর্মযাজকগণ কোথাও মিথ্যা প্রলোভনে, কোথাও বল-প্রয়োগে লোকজনকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিতেন। গোটা ভারতবর্ষকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের এক সভাপতি ভারতের হিন্দু-মুসলমানদিগকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার সম্ভাবনার কথা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে পর্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ধর্মভীরু ভারতবাসী মাত্রই তাই আপন আপন ধর্মের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। ইহা ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আরও কতিপয় বিশেষ অভিযোগ ছিল। যথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা কারণে এবং অতি কম সংখ্যক ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য কারণে ইংরেজেরা তাহাদের জমিদারী, জায়গীর, লাখেরাজ এমন কি ওয়াক্ফ সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াফ্‌ত, ১৮১৮ সালের কুখ্যাত রেগুলেশনের বলে বিনা বিচারে কারাগারে দীর্ঘকাল আটক এবং ফারসী ভাষার স্থলে আদালতে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন ইত্যাদি।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রধান-অপ্রধান কারণে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। সৈয়দ আহমদের অনুচরগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। আমাদের ইতিহাসের সেই অধ্যায় পরম গৌরবমণ্ডিত। স্বাধীনতা লাভের দুর্বার প্রেরণা সেদিন ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণকে যে-ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা আজও ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে।

কিন্তু সেই সংগ্রামী দেশ-প্রেমিকদের হাজার করা একজনও আজ আর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাঁচিয়া নাই এবং তাঁহাদের আদর্শ জাতির সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য কোন চেষ্টাও চলিতেছে না। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিদেশীয় লেখকগণের পক্ষপাতিত্বমূলক এবং অলীক রচনা পাঠ এবং অবলম্বণে আমাদের দেশেরও কোন কোন লেখক ইঁহাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষপাত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। ইহাদের জানা উচিত, দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলিয়াই যুদ্ধবিদ্যায় অপারদর্শী এবং বহুক্ষেত্রে শুধু লাঠি, তরবারী, তীর-ধনুক লইয়া; এমন কি, শূন্যহাতে ভারতবর্ষের দশ লক্ষাধিক বীর সন্তান তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম

বিদেশীয়দের রচিত ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম মূলতঃ ইংরেজদের স্বৈরাচার, কুশাসন, শোষণ, হত্যা, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনমতের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহাদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী কেন এরূপ তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল উহার কিছু কিছু আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। এই সংগ্রাম কার্যতঃ দুই বৎসর চলিয়াছিল। সেই সময় ইংরেজেরা সংগ্রামী ও নির্লিপ্ত জনসাধারণের উপর যেই অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন, উহার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই বিরল। স্থানাভাববশতঃ এই গ্রন্থে উহার অতি সামান্য অংশ মাত্র যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ নরনারী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের দূরে থাক, এমন কি দেশের বিভিন্ন এলাকায় যাঁহারা নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন, এই একই কারণে তাঁহাদেরও শতকরা ৯৫ জনের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই।

ভারতবাসীদের এই মুক্তি প্রচেষ্টার সবচেয়ে উজ্জ্বল দিকটি হইতেছে এই যে, যাঁহারা ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে এই মহাসংগ্রামের উদ্যোক্তা, তাঁহাদের সকলে দূরের কথা, কয়েকজনও সংগ্রামের পূর্বে বা সংগ্রাম চালু অবস্থায় কোথাও একত্রিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কত বড় বিচক্ষণ ও কৌশলী হইলে একে অন্যের নিকট হইতে বহু শত মাইল দূরে থাকিয়াও এত বড় একটা ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা চিন্তা করিলে বিদ্রোহের নায়কগণের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক স্বতঃই নত হইয়া আসে।

শত্রুকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময় আঘাত করিবার জন্য ইঁহাদের সকলের উৎসাহের অবধি ছিল না। কিন্তু এ-আঘাত হানিতে হইবে কখন, তাহা

ঠিক করা নিশ্চয়ই একটি মহা শক্ত ব্যাপার ছিল। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অপ্রচুর এবং ইংরেজদের শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত নেতৃস্থানীয় প্রত্যেকটি লোকের উপর। এই বিশাল ভূখণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহের বাণীই বা কে কিরূপে বহন করিবেন? কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল যেখানে মহৎ, আদর্শ ছিল যেখানে শুধু সর্বোচ্চ ত্যাগের, সঙ্কল্প ছিল যেখানে হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল সেখানে কোন বাধা-বিপত্তিই টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। যাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল এই সংগ্রাম পরিচালনার ভার তাঁহাদের পশ্চাতে ছিল অগণিত নরনারীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশীর্বাদ। যুদ্ধাস্ত্র এবং অর্থকড়ি তাঁহাদের ছিল না বটে, কিন্তু যোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তার কষ্টি-পাথরে যাচাই ও বিচার সাপেক্ষে তখনকার মত সর্বাধিনায়কের পদ উন্মুক্ত রাখিয়া রক্তবর্ণের পদ্মকে তাঁহারা নির্বাচিত করিলেন বিদ্রোহের প্রতীক এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থান, এক ছাউনী হইতে অন্য ছাউনীতে এই প্রতীক বহন করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইল সকল সম্প্রদায় হইতে বাছাই করা সাধু-ফকির মৌলবী, পুরোহিত, হেকিম, কবিরাজ, ভিস্তি, ফলবিক্রেতা প্রভৃতির ছদ্মবেশধারী সহস্রাধিক লৌহ মানবের উপর।

বলা বাহুল্য, ইঁহাদের এক বৃহৎ অংশ ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর খলিফাগণের হাতে গড়া। স্থিরকৃত হইল, পলাশী যুদ্ধের শত-বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন প্রাতে একযোগে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্রোহের ধ্বজা উত্থিত হইবে এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে ইংরেজদের সর্বশেষ ব্যক্তির বিতাড়নের পূর্বে সংগ্রামের বিরতি ঘটিবে না।

কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরের সিপাহীদের যেন দেরী আর সহই হইতেছিল না। না হওয়ারই কথা। নেতৃবর্গ যখন আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি লইয়া সদ্য-আবিষ্কৃত ভাণ্ডারের শস্যলুণ্ঠনরত পিপীলিকার ন্যায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ সিপাহীদের মধ্যে প্রচলন করা হয় এনফিল্ড রাইফেলের। এই রাইফেলের টোটার কার্তুজ তৈরী হইত শূকর ও গরুর চর্বির সংমিশ্রণে। রাইফেলে ভর্তির পূর্বে উহা দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। দেশীয় সিপাহীরা শূকর এবং গরুর চর্বির নামে ক্ষিপ্ত হইয়া

গেল। তাহারা এন্‌ফিল্ড রাইফেল প্রত্যাহারের দাবী জানাইল। কিন্তু দাম্ভিক ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে কোন আমলই না দিয়া অবাধ্যতার পাল্টা অভিযোগে তাহাদের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। সিপাহীদের ধৈর্যের বাঁধের উপর ইহা ছিল একটি প্রচণ্ড আঘাত।

উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ-তনয় সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ৩৪ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই পদাতিক বাহিনীটি তখন ব্যারাকপুরে অবস্থান করিতেছিল। বিদ্রোহের নির্দিষ্ট তারিখ তাহার জানা ছিল কিনা বলা যায় না। তবে অযথা কালক্ষেপ করিয়া ধর্মের সর্বনাশ দেখিতে তাহার আর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় অর্থাৎ বিদ্রোহের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখের প্রায় তিন মাস পূর্বে, মঙ্গল পাণ্ডে তাঁহার ইংরেজ এড্‌জুট্যাণ্টকে গুলী করিয়া বিদ্রোহের সূচনা করিলেন। সামরিক বিভাগীয় বিচারে সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হইল। ইহার পর ব্যারাকপুরের দেশীয় সিপাহীদিগকে নির্বিচারে নিরস্ত্র করিয়া ইংরেজেরা তথায় বিদ্রোহের অবসান ঘটান। ব্যারাকপুরের সংবাদ বায়ুবেগে বহরমপুর পৌঁছিলে সেস্থানেও ছোটখাটো রকমের একটা বিদ্রোহ ঘটে। ব্যারাকপুরের ন্যায় বহরমপুরেরও বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরেজদিগকে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। সেখানেও অনেকে শাস্তিভোগের সঙ্গে চাকুরীও খোয়ায়। ব্যারাকপুর ও বহরমপুরের ঘটনাবলী অন্যান্য সেনানিবাস এবং ছাউনীতে মনস্তাপ এবং দুশ্চিন্তা ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সহায়ক তখন হয় নাই। কাজেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অনেকটা নিশ্চিন্ত কিন্তু সতর্ক হইয়া রহিলেন।

গোটা এপ্রিল মাস বেশ শান্তিতেই কাটিয়া যায়। ব্যারাকপুর ও বহরমপুরের বিদ্রোহের কথা বিশাল ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই ১০ই মে ভারতবর্ষের তৎকালীন সর্ববৃহৎ সেনানিবাস মীরাটে অবস্থিত তিন হাজার দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদের ইংরেজ অফিসারগণের কয়েকজনকে হত্যা করে। বিদ্রোহের কয়েকদিন পূর্ব হইতে একজন ফকির কতিপয় অনুচরসহ প্রায় প্রত্যহ এই সেনানিবাসে যাতায়াত করিতেন। ইঁহারই উস্কানীতে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া পড়ে বলিয়া

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ইহা হয়ত আংশিক সত্য। কিন্তু দেশীয় সিপাহীদের জন্য সরবরাহকৃত হাড়ের গুড়া মিশ্রিত ময়দা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া তৎপূর্বেই তাহারা যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল, তাহাও একটি ঐতিহাসিক সত্য। বিদ্রোহীদের পরবর্তী লক্ষ্য-স্থল ছিল দিল্লী। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল গেল দিল্লী দখল করিতে, অপর দল গেল রোহিলাখণ্ডের প্রধান শহর বেরেলীতে বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য। যে দলটি দিল্লী গেল, তাহাদের অধিকাংশ ছিল পদাতিক এবং হিন্দু। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলে মুসলমান অশ্বারোহী সিপাহীরই সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রথমোক্ত দল ১২ই মে দিল্লী পৌঁছিয়া উহা অবরোধ ও অধিকার করে। দিল্লী অধিকারের ফলে বিদ্রোহী সিপাহীদের মনোবল এবং সামরিক শক্তি অনেক বাড়িয়া যায়। দিল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত ইংরেজদের অস্ত্রাগারে তাহারা পায় নয় লক্ষ কার্তুজ প্রায় আট হাজার ছোট কামান, দশ হাজার বন্দুক এবং দশ সহস্রাধিক বারুদপূর্ণ পিপা। ছোটখাটো বহু অস্ত্র এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

সম্রাট বাহাদুর শাহ

ভারতবর্ষের নাম-সর্বস্ব এবং সর্বশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের না ছিল কোন রাজ্য, না ছিল রাজকীয় কোন ক্ষমতা। ইংরেজরা দয়া করিয়া দিল্লীর দুর্গ-পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদের যে অংশটি তাঁহার বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেটিই ছিল তাঁহার সত্যিকারের রাজ্য এবং সে-স্থানে বসিয়া তিনি তাঁহার কবিতা রচনা করিতেন। ইংরেজদের প্রদত্ত পেন্সনের টাকা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া তাহা কবিতার উৎসাহী সমঝদারদিগকে বখশিশ দিতেন এবং পূর্ব-পুরুষগণের শান-শওকতের গল্প শুনাইয়া মোসাহেবদের তাক্ লাগাইয়া দিতেন। রাজপ্রাসাদে তখনও দেশ-দেশান্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হইত। কিন্তু মাত্র দেড় শত বৎসরের ব্যবধানে অবস্থার এমনই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যে, এই অনুপম রাজপ্রাসাদের মালিক কে এবং তিনি কেমন এবং কি অবস্থায় আছেন, এ প্রশ্ন রাজপ্রাসাদ দর্শনাভিলাষী আগন্তুকগণের মধ্যে কাহার মনে হয়ত জাগিত, কাহার মনে আদৌ জাগিত না। এই তাচ্ছিল্যের জন্য বাহাদুর শাহ বেদনানুভব করিতেন,

সময় সময় খুব অসন্তোষও ব্যক্ত করিতেন। কিন্তু প্রতিকারের যে কোন উপায় নাই, তাহা নিজের তদানীন্তন অবস্থা এবং তাঁহার পূর্ববর্তী সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত তাঁহার বিশেষ প্রতিনিধি রাজা রাম-মোহন রায়ের দৌত্যকার্যে ব্যর্থতা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিত।

হঠাৎ মীরাটে বিদ্রোহের ঝড় উঠে। সেই ঝড় তাঁহার বিক্ষুব্ধ মনেও ভীষণভাবে দোলা দেয়। দুই দিন পর মীরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহী এবং দিল্লী ও তৎসন্নিহিত এলাকার নিপীড়িত ও হৃতাভিমানী জনসাধারণের অনুরোধে তিনি বৃদ্ধ বয়সে ভারতবর্ষের সত্যিকারের সম্রাট হইতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মহান মোগলদের বংশধর হিসাবে বিশাল ভারতবর্ষের সম্রাট রূপে যথারীতি স্বীকৃতিও আসিতে থাকে বিভিন্ন প্রদেশ এবং সামন্ত রাজ্যগুলি হইতে। দীর্ঘকাল পরে শাহজাহানের রাজপুরী এইরূপে রাতারাতি উহার হৃত গৌরব ফিরিয়া পায়। চট্টগ্রামের উপকূল হইতে সুদূর মুলতান পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের কোটি কোটি অধিবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, 'বাহাদুর শাহ মোবারকবাদ। শাহানশাহে হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ। হিন্দু মুসলিম এক হ্যায়'।

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর হিন্দু-মুসলমানের এই অপূর্ব মিলনের নিদর্শন স্বরূপ বাহাদুর শাহ দেশে গো-হত্যা বন্ধের আদেশ জারী করিলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথের প্রধান অন্তরায় এইরূপে অপসারিত হওয়ায় সম্রাটের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। ইংরেজকে এদেশ হইতে বিতাড়নই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা—সিংহাসনের উপর লোভ তাঁহার মনকে কলুষিত করিতে পারে নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করিলেন, ইংরেজ বিতাড়নের কার্যে যে সকল নৃপতি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, তিনি তাঁহাদের সকলের সমবায়ে গঠিত নৃপতি-সংসদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করিয়া সিংহাসন হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবেন। যাঁহাদের আশঙ্কা ছিল ইংরেজদের পর ভারতবর্ষে আবার মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে, এই ঘোষণায় তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন।

বাহাদুর শাহ ইহার পর একদিন রাজকোষে অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করিলে, সিপাহীরা তাঁহাকে জানাইয়া দেয়, তাহাদের নিকট বেতন

অপেক্ষা দেশের সম্মান অনেক বড় জিনিস। সে সময় তাহারা প্রতিজ্ঞা করে, বৃটিশের ট্রেজারী লুণ্ঠনলব্ধ অর্থের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত তাহারা বাদশাহের হাতে তুলিয়া দিবে। বিদ্রোহীরা তাহাদের এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। অন্যান্য স্থানের মুক্তিযোদ্ধারাও দিল্লীতে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিয়াছিল।

গোড়াতেই একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিদ্রোহ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বা একই নেতার উদ্যোগে সংঘটিত হয় নাই। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন নেতার পরিচালনাধীনে সিপাহীরা ও দেশের জনসাধারণ মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বিপর্যয়ও তাহাদের একই সময়ে ঘটে নাই। বিদ্রোহীদিগকে অসংখ্য খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংরেজকে এদেশে তাহাদের শাসন-ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের সকল ঘটনার বর্ণনা ও নেতৃবর্গের সবিস্তার পরিচয় প্রদান এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নয়। তাই শুধু প্রধান প্রধান ঘটনা এবং বিদ্রোহী নায়কগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের পরিচয় সন্নিবেশিত হইতেছে।

নানা সাহেব

নানা সাহেব ছিলেন ইংরেজদের হাতে পরাজিত এবং তাহাদের পেন্সন-ভোগী অপুত্রক পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র। তাঁহার পিতৃ-প্রদত্ত নাম ছিল ধুন্ধু পন্থ। বাজীরাওয়ের সহিত তিনিও কানপুরের নিকটে বিঠুর নামক স্থানে একটি সুরম্য প্রাসাদে বহু বৎসর অলস জীবন যাপন করেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর স্বত্বলোপ নীতি অনুসারে ইংরেজেরা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাহাকে পেন্সন এবং বাজীরাওয়ের স্থাবর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন। নানা সাহেব বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু আজিমউল্লাহ্ খানকে ইংলণ্ড প্রেরণ করেন। সুদর্শন, সুকণ্ঠ ও সুবক্তা এবং প্রথম জীবনে সামান্য বেতনের একজন স্কুল-শিক্ষক আজিম উল্লাহ্ খান স্বীয় প্রতিভাবলে অতি সাধারণ অবস্থা হইতে বিশেষ উন্নতি

লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি তথাকার অভিজাত মহলে, বিশেষ করিয়া সুন্দরী রমণীদের, অতি প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। তাঁহার আজিমউল্লাহকে 'ডার্লিং আজিমউল্লাহ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অযাচিতভাবে প্রেম নিবেদন করিতেন, এমন কি প্রচুর টাকা পয়সা দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন।

দৌত্যকার্যে ব্যর্থ হইয়া ইংলণ্ডে বসিয়াই তিনি ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের পরিকল্পনা রচনা করিয়া রঙ্গ বাপুজী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের মারফত উহা বিঠুরে নানা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেতারা রাজার পক্ষে তদবীরের জন্য রঙ্গ বাপুজী সে সময় ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নানা সাহেবকে সঙ্গে করিয়া বহু স্থান সফর এবং দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারে প্রয়াস পান। ইংলণ্ড হইতে শূন্যহাতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ভারতবাসীদের আসন্ন মুক্তি-সংগ্রামে তুরস্কের সুলতান ও আফগান আমীরের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও সফলকাম হন নাই।

লক্ষ লক্ষ টাকার বৃত্তি হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়া নানা সাহেব হঠাৎ প্রাচুর্যের মধ্য হইতে দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন সোপানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। উপায়ান্তর না থাকায় তাঁহাকে সামান্য বেতনের চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। এহেন অবস্থায় ইংরেজদের প্রতি তাঁহার মনোভাব যে কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৮৫৭ সালের ৫ই জুন নানা সাহেবের নেতৃত্বে কানপুরের সিপাহী ও অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা পূর্বক উহা অবরুদ্ধ করে। ইহার মাত্র তিন সপ্তাহ পর ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল হুইলার তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার উত্তরে তাঁহার আদেশে কানপুরে দুইশত ইংরেজ বন্দীকে হত্যা করা হয়। জুলাই মাসে জেনারেল হেভ্‌লক কানপুর পুনরধিকার করিলে, নানা সাহেব নেপালের জঙ্গল অভিমুখে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহার কি হইয়াছে অদ্যাবধি তাহা অজ্ঞাত রহিয়াছে। কানপুর পুনরধিকারের পর ইংরেজ সৈন্যরা তথায় কয়েক সহস্র ভারতবাসীকে অকথ্য

যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়া ইংরেজ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল। 'বিবিঘর' নামক অট্টালিকাটি কানপুরে ইংরেজদের সীমাহীন অত্যাচারের একটি নীরব সাক্ষী।

নানা সাহেব ছিলেন একজন প্রকৌশলী এবং কূটনীতিবিদ্। উত্তর ভারতের বিচ্ছিন্ন দলগুলির মধ্যে তিনিই আনিয়া দিয়াছিলেন ঐক্য ও সংহতি। সংগ্রাম হইতে তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধান কানপুর এলাকার বিদ্রোহীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেয়। তবু তাঁহার সেনাপতি ও আবাল্য বন্ধু মহারাষ্ট্র-বীর তাঁতিয়া তোপীর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা আর একবার ইংরেজদের হাত হইতে কানপুর ছিনাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা আবার হাতছাড়া হইয়া পড়ায় তিনিও বহু সংখ্যক অনুচরসহ মধ্য ভারত অভিমুখে প্রস্থান করেন। নানা সাহেবের সঙ্গে কানপুর হইতে প্রস্থানের পর আজিমউল্লাহ অযোধ্যার কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হন। বিদ্রোহের শেষের দিকে আজিমউল্লাহ খান ফল বিক্রেতার ছদ্মবেশে লক্ষ্ণৌ শহরে অবস্থানকালে ধৃত হন। ইংরেজেরা তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করেন। আজিমউল্লাহর দেহের কোন কোন অংশের চামড়া খসাইয়া ক্ষতস্থানে লবণ ও মরিচের গুড়া দেওয়া হয়, চোখ দুইটি উৎপাটিত করা হয় এবং কান কাটিয়া দেওয়া হয়।

খান বাহাদুর খান

মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের অন্যতম নেতা ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ বখ্‌ত খান বেরেলী পৌঁছার পূর্বেই বীর রোহিলারা অতীতের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। রোহিলাখণ্ডের প্রধান শহর বেরেলী হইতে ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহাগ্নি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বেরেলীর বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ জজ্ রবার্টসন, জজ্ রেইক ও ডেপুটি কালেক্টর মিঃ ওয়াইট প্রমুখ উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিগণকে হত্যা করিয়া এবং অন্যান্যদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রোহিলাখণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দেয়। অতঃপর তাহারা কোতোয়ালীর সম্মুখে সমবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের ৩১শে মে বেরেলীর শেষ স্বাধীন নওয়াব ইতিহাস-বিখ্যাত বীরশ্রেষ্ঠ

হাফিজ রহমতউল্লাহ খানের বংশধর খান বাহাদুর খানকে তাহাদের নেতা নির্বাচিত করে। খান বাহাদুর খান তখনই দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের অধীনে রোহিলাখণ্ডের গভর্ণর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাটের ন্যায় তিনিও ইংরেজদের একজন পেন্সনভোগী ছিলেন। তাঁহার পেন্সন ছিল দুটি, একটি অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, অপরটি হাফিজ রহমতউল্লাহ্র বংশধর হিসাবে। গভর্ণরের শপথ গ্রহণ করিবার মাত্র দুই দিন পর মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতা ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ বখত খান সদলবলে তথায় উপস্থিত হন। খান বাহাদুর খান তাঁহাকে একখানি পত্র সহ দিল্লী পাঠাইয়া দেন। নওয়াব আহমদ কুলি খান, হেকিম আহসান উল্লাহ, জেনারেল সামাদ খান, ইব্রাহিম আলি খান প্রমুখ দিল্লীর বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দিল্লীর সদর ফটকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিদ্রোহীদের দলে তাঁহার ন্যায় পদস্থ কোন সামরিক কর্মচারী না থাকায়, সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁহাকে সাগ্রহে তাঁহার সৈন্য-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং স্বীয় পুত্র শাহজাদা মীর্জা মোগলকে এ্যাড্-জুট্যাণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত করেন। এই পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং যোগ্যতা মীর্জা মোগলের ছিল না।

খান বাহাদুর খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র রোহিলাখণ্ডে বৃটিশ শাসনের স্থলে জনসাধারণ-সমর্থিত নূতন এক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানের সৌহার্দের স্থায়িত্বের জন্য তিনিও বাহাদুর শাহের অনুকরণে সমগ্র দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। এই কারণেও ইহার প্রয়োজন ছিল যে, বিদ্রোহীদের শিবিরের একই রন্ধনশালায় হিন্দু মুসলমান সকলের জন্য একই হাতে একই খাদ্য রান্না ও পরিবেশিত হইত। বস্তুতঃ তাঁহার অল্পকালস্থায়ী সুবাদারীর আমলে শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রোহিলাখণ্ড ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশ হইতে বিদ্রোহীরা বৃটিশ শাসনের মূলোৎপাটন করিতে পারে নাই। নিয়মিত, অনিয়মিত ও মুজাহিদ সহ তাঁহার অধীনে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ত্রিশ হাজারের অধিক। বাংলা এবং বিহারের মুজাহিদরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে দলবদ্ধভাবে তাঁহারই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া গাজী বাহিনী নাম গ্রহণ করিয়াছিল।

খান বাহাদুর খানের বাহিনীর সহিত ইংরেজ সৈন্যের প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে কাকড়ৌলী নামক স্থানে। গাজী বাহিনী এস্থানে একাই বৃটিশের মুকাবিলা করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে। এই শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া ইংরেজদের প্রধান সেনাপতি এক বিরাট বাহিনী লইয়া বেরেলী আক্রমণ করেন। ইংরেজদের ভারী কামান-নিঃসৃত গোলার আঘাতে খান বাহাদুর খানের প্রথম ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িলে, পশ্চাতে অপেক্ষমান গাজী বাহিনীর লোকজনেরা আগাইয়া আসিয়া তাহাদের স্থান দখল করে। ইহাদের মস্তক পাগড়ীতে আবৃত, মুখে সুবিন্যস্ত দাড়ি, কটিদেশে কোমরবন্ধ, আঙ্গুলে রৌপ্য-নির্মিত আংটি এবং হাতে ছিল তলোয়ার। দেশপ্রেমের পশ্চাতে ধর্মোন্মাদনা থাকিলে মানুষ নিজের জীবন মৃত্যু সম্পর্কে কতটা উদাসীন ও বেপরওয়া হইতে পারে, গাজী বাহিনী তাহার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। 'দীন দীন' রবে ইহারা প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের উপর আপতিত হইয়া প্রথম আঘাতেই একদল শিখ সৈন্যকে নির্মূল করিয়া ফেলে। শিখদের দুরবস্থা দেখিয়া প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ইহাদিগকে পাল্টা আক্রমণের জন্য হাইল্যাণ্ডার্সদিগকে আদেশ দেন। গাজী বাহিনীর হাতে যেমনি বহু ইংরেজ সৈন্যের প্রাণ গেল, ইংরেজদের ভারী কামানের গোলার আঘাতেও তেমনি বহু মুজাহিদ ভূতলশায়ী হইল। কিন্তু মরণপণ করিয়া এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় দলের শেষ ব্যক্তি শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তাহারা পরাজয় ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল।

গাজী বাহিনীর পরাজয়ের পর বাহাদুর খানের আদেশে তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত পিলভিট্ নামক স্থানে পশ্চাদপসরণ করে। ইংরেজ সৈন্যদেরই জয় হইল। কিন্তু গাজী বাহিনীর বীরত্ব দর্শনে তাহারা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখন-তখনই বেরেলী প্রবেশের সাহস পাইল না। ইতিমধ্যে গুপ্তচরেরা আসিয়া সংবাদ দেয়, বেরেলীর উপকণ্ঠে কোন এক স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক 'গাজী' তখনও অবস্থান করিতেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই স্যার কলিন ইহাদিগকে আক্রমণের জন্য তাঁহার বিশাল বাহিনীর বাছাই করা কয়েকটি দল নিয়োগ করেন। দূর মফঃস্বল হইতে সদ্য আগত ত্রিশ জন 'গাজী' শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায়

শত্রুপক্ষকে আক্রমণপূর্বক পাঞ্জাব ও বেলুচ দলের প্রায় দেড়শত সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া একে একে তাহারাও শহীদ হয়। বহু চেষ্টা করিয়াও ইংরেজেরা একজন গাজীকেও জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে পারেন নাই। সত্যিকারের বিপ্লবীদের ধর্মে আত্মসমর্পণের বিধান নাই। তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু নত হয় না। গাজীরা ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। বেরেলীর যুদ্ধেই রোহিলাখণ্ডের ভাগ্য চুড়ান্তভাবে নির্ণীত হইয়া যায়।

ইংরেজ সেনাপতি পিলভিটে বাহাদুর খানকে বেশী দিন অবস্থান করিতে দেন নাই। পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি বাহিনী পিলভিট আক্রমণ করিলে পর উভয়পক্ষে আবার এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবারও ইংরেজদের নব-আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের গায়ে রোহিলাদের অদম্য সাহস কোন দাগ কাটিতে পারিল না। বৃথা লোকক্ষয় অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া বাহাদুর খান অতঃপর তাঁহার অনুচরবর্গ সহ নেপাল সীমান্ত অভিমুখে প্রস্থান করেন। গোপন প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে কিছু দিন পর তথা হইতে সদলবলে তিনি নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জঙ্গলে তাঁহারা কখনও ঘাসের রুটি খাইয়া আর কখনও বা অর্ধাহারে দিন কাটাইতে থাকেন। অতঃপর নেপালে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতির বিনিময়ে তিনি নেপাল মহারাজার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ধূর্ত মহারাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বৃটিশ প্রেসিডেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন।

যথাসময় তাঁহাকে বেরেলী আনা হয়। একটি অর্ধসামরিক আদালত তাঁহার ফাঁসির আদেশ দেন। রায় শ্রবণ করিয়া তিনি দুই হাত তুলিয়া আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেন: "তোমার হাজার শুকরিয়া যে, হাফিজ রহমতউল্লাহ্র নিকট আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আমি যথাসাধ্য আমার দায়িত্ব পালন করেছি।"

ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তিনি বলেন, 'অস্ত্রের সাহায্যে যে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং অস্ত্রের উপর যার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল, অস্ত্রের সাহায্যেই উহার অবসান ঘটাতে হয়। তাই আমি অস্ত্রধারণ করেছিলাম। কিন্তু দেশকে আমি মুক্ত দেখে যেতে পারলাম না, শুধু এ দুঃখ নিয়েই চললাম।"

অযোধ্যার বিদ্রোহ

অযোধ্যায় একদিনে বিদ্রোহ ঘটে নাই এবং বিদ্রোহাগ্নিও একদিনে নির্বাপিত হয় নাই। ইহার কারণ, মাত্র এক বৎসর পূর্বে ইংরেজেরা অযোধ্যার স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছিলেন এবং এই অযোধ্যারই লস্কর শাহ নামক জনৈক দরবেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কোম্পানীর শাসন এক শত বৎসরের অধিক স্থায়ী হইবে না। কাশীর হিন্দু জ্যোতিষিগণও তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অযোধ্যা এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছিল।

রোহিলাখণ্ডের প্রায় একই সময়ে কাশী এবং এলাহাবাদে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৪ঠা জুন অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে বিদ্রোহ সূচিত হইতেই পূর্বোক্ত উভয় স্থানে রীতিমত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু উভয় স্থানেই বিদ্রোহীরা ইংরেজদের হাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরাজয় বরণ করে। ইংরেজরা এলাহাবাদের বিদ্রোহের প্রতিশোধ লইয়াছিল প্রায় ছয় হাজার ভারতীয়কে নৃশংস এবং বর্বরোচিতভাবে হত্যা করিয়া। মুসলমানদিগকে কামানের মুখে, শুকরের চামড়ায় মুড়িয়া মুখ সেলাইয়ের পর নদীতে নিক্ষেপ করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে দাহ করিয়া, শুকরের চর্বি সর্বাঙ্গে লেপন পূর্বক ফাঁসি দিয়া এবং ফাঁসির পূর্বে হিন্দুদিগকে গো-মাংস ভক্ষণ করাইয়া ইত্যাদি বীভৎস উপায়ে হত্যা করা হইয়াছিল। কুখ্যাত বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল নীল রাস্তার দুই পার্শ্বের গ্রামগুলি হইতে নিরীহ মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীদিগকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া নির্বিচারে ফাঁসি দিয়া মৃতদেহগুলি রাস্তার উভয় পার্শ্বের বৃক্ষের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়া কানপুর পৌঁছিয়াছিলেন। কাশীতেও অনুরূপ বীভৎস অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মওলবী লিয়াকত আলি নামক জনৈক বিখ্যাত আলেম এলাহাবাদে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা ছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা ও তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

অযোধ্যায় বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং। অযোধ্যার জনপ্রিয় নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহের সিংহাসনচ্যুতি ও সপরিবারে কলিকাতায় নির্বাসন তত্রত্য অধিবাসীরা অবস্থার চাপে

পড়িয়াই তখন বরদাশত করিয়াছিল। কিন্তু পরিবারের কেহ কেহ বিশেষ করিয়া নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহের অন্যতমা মহিষী বেগম হজরত হাসরতা মহল এবং ফয়েজাবাদের মওলানা শাহ আহমদউল্লাহ্ গোপনে বৃটিশের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ইঁহারাই তথায় বিদ্রোহীদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরাধীনতার সুদৃঢ় বন্ধন হইতে ভারত উপমহাদেশের মুক্তি সাধন করিয়া যাঁহারা ইহাকে গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরবর্তীদের জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ১৮৫৭-৫৮ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান যাঁহাদের অবিস্মরণীয় দানে পুষ্ট, শাহ আহমদউল্লাহ নিঃসন্দেহে তাঁহাদের অন্যতম। নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহের নির্বাসনের পর তিনি ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মুসলমানদিগকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে তাঁহাকে অযোধ্যার বিভিন্ন শহরে বৃটিশ বিদ্বেষমূলক বক্তৃতাদি দান ও প্রচারপত্র বিলি করিতে দেখা গিয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সশস্ত্র সৈন্যদের সাহায্যে গ্রেফতারপূর্বক বিচারের জন্য আদালতে উপস্থিত করেন। বিচারক তাঁহার প্রতি আইনের কঠোরতম দণ্ডাদেশ দেন। কিন্তু আল্লাহর এমনি মহিমা যে, বিক্ষুব্ধ নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠ হইতে জোরক্রমে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনের পার্শ্বে আনিয়া দাঁড় করান। ইহাই অযোধ্যার ব্যাপক বিদ্রোহের সর্বশেষ সঙ্কেত। নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহ ছিলেন কলিকাতায় ইংরেজদের হাতে নজরবন্দী। এজন্য বিদ্রোহীরা তাঁহার অন্যতমা মহিষী বেগম হজরত মহলের গর্ভজাত অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শাহজাদা বিরজিস কদরকে দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহের অধীনে অযোধ্যার নওয়াব ঘোষণা করে। বেগম হজরত মহল তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন এবং শাহ আহমদ উল্লাহ হন তাহার প্রধান উপদেষ্টা।

লক্ষ্ণৌর শাহাদাত্‌গঞ্জের একটি সুরম্য অট্টালিকায় শাহ আহমদউল্লাহ্‌র সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়। স্বীয় অনুচরগণের সাহায্যে তিনি গেরিলাদের অনুকরণে বৃটিশের ছোটখাটো ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিয়া তাহাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে থাকেন। বৃটিশ সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্বেল

১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে মেজর জেনারেল আউটরামকে লক্ষ্ণৌ অবরোধের জন্য প্রেরণ করেন। আলমবাগে সেনাপতি আউটরামকে একই সময় চারিদিক হইতে আক্রমণের জন্য তিনি স্বয়ং যে-পরিকল্পনা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা রচিত বলিয়া যদি সিপাহীরা তাহা ফেলিয়া না রাখিত, তাহা হইলে সেনাপতি আউটরামের পক্ষে আত্মসমর্পণ কিম্বা মৃত্যুবরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

লক্ষ্ণৌর পতনের পূর্বে আরও যে-কয়টি সংঘর্ষ হয়, তাহার সব কয়টিতে হয় গোলাবারুদ অথবা হজরত মহল পরিচালনাধীন সৈন্যদের সক্রিয় সহযোগিতার অভাবে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে। লক্ষ্ণৌ পুনরধিকারের যুদ্ধে মওলানা স্বহস্তে কামান চালাইয়া যে অসাধারণ রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। বিদ্রোহীরা শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পরও মওলানা তাহার কতিপয় অনুচর সহ তাঁহার সদর কার্যালয় হইতে ইংরেজদিগকে প্রবল বাধা দিতে থাকেন। বহু শত্রুসৈন্য হতাহত করিয়া অবশেষে তিনি এক আশ্চর্যজনক উপায়ে শহর ত্যাগ করেন। তৎকালে প্রচলিত সর্বপ্রকারের মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় পঁচিশ হাজার শত্রুসৈন্য এবং বৃটিশের বেতনভুক ও পুরস্কারলোভী শত শত গুপ্তচরের সুদৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করিয়া যে প্রকারে তিনি সদলবলে শহর ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের পর প্রথমে বাড়ি তৎপর মোহাম্মদী এবং সর্বশেষে শাহজাহানপুরে মওলানার অনুচরদের সঙ্গে বৃটিশের ভীষণ সংঘর্ষ বাঁধে। তন্মধ্যে শাজাহানপুরের একটি যুদ্ধে বিদ্রোহীরা কিছুটা সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ সৈন্যদের চাপে সেই সুবিধাটুকুও শীঘ্রই তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যায়। ইংরেজ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার এবং বিদ্রোহীদের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে জনসাধারণ এমন কি বিদ্রোহীদেরও মনোবল ইতিমধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। বিদ্রোহী নেতৃবর্গ অর্থ ও নূতন লোক সংগ্রহের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে তাঁহাদের পরিকল্পনা কার্যকর করিয়া তুলিতে পারিলেন না। অর্থ ও লোক সংগ্রহের জন্য এ সময় মওলানা অযোধ্যার বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইতেন। দলে দলে লোক বিদ্রোহে

যোগদানের জন্য আগাইয়া আসিত এবং সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অভাব থাকিয়া যাইতে থাকে যুদ্ধ বিগ্রহে অভিজ্ঞ পরিচালক ও অস্ত্রশস্ত্রের। চাহিদার তুলনায় ইহার সরবরাহ হইত অনেক কম এবং প্রতিপক্ষের অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় উহা ছিল নিকৃষ্ট।

আহমদ উল্লাহ্‌র হত্যা

১৮৫৮ সালের ৫ই জুন অর্থাৎ বিদ্রোহ ঘোষণার ঠিক এক বৎসর পর মওলানা এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের মেয়াদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বক্তা লস্কর শাহের অবোধ্য ইঙ্গিতের তাৎপর্য অনুধাবন ব্যতিরেকে কতিপয় বিশ্বস্ত অথচ প্রায় নিরস্ত্র অনুচরসহ অযোধ্যা-রোহিলাখণ্ডের সীমান্তে অবস্থিত পবাইনে গমন করেন। পবাইনের বিশিষ্ট তালুকদার রাজা জগন্নাথ বিদ্রোহের গোড়ার দিকে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ এবং গোপনে খান বাহাদুর খানকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। অর্থ ও লোক সংগ্রহের জন্য তথায় আহুত জনসভা ভঙ্গের পর রাজা জগন্নাথ মওলানাকে তাঁহার প্রাসাদে ডাকিয়া লইয়া গিয়া গুলী করিয়া হত্যা করেন। অতঃপর তাঁহার মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাপিষ্ঠ জগন্নাথ স্বয়ং উহা সহ শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হন। উৎসাহী ম্যাজিস্ট্রেট মস্তকটি প্রকাশ্য স্থানে দুই দিন ঝুলাইয়া রাখিয়া অনিচ্ছুক জনসাধারণকে উহা দর্শন করিতে বাধ্য করিবার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী বৃটিশ গভর্ণমেন্ট রাজা জগন্নাথকে সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারস্বরূপ ৬৫ হাজার টাকা এবং বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর একটি জমিদারী দান করিয়াছিলেন।

এইরূপে ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম বীর, বিদ্রোহী-নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রণ-কৌশলী মওলানা শাহ আহমদউল্লাহ্‌র জীবন-প্রদীপ চিরকালের জন্য নির্বাপিত হইয়া যায়। সংগ্রামে যিনি সর্বদা অনুবর্তীদের পুরোভাগে থাকিতেন, আক্রান্ত না হইলে যিনি আক্রমণের জন্য কখনও আগাইয়া যান নাই, বিপর্যয়ের পর যিনি সর্বশেষে রণস্থল ত্যাগ করিতেন,

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছে দুশমনের গুলীতে নয়—একজন ভণ্ড মিত্র ও কাপুরুষের হাতে।

ঐতিহাসিক ম্যাসিসন বলেন: "স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিকের কর্তব্য বলিয়া যদি বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শাহ আহমদউল্লাহ্ বিদ্রোহী নহেন স্বদেশ-প্রেমিক। বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে যাঁহারা মওলানার প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া বিদেশীয়দের আইনের চোখে দণ্ডার্হ বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা তাঁহার ন্যায্য অধিকার। মওলানা সেই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন নিরপরাধ লোকের রক্তপাত করিয়া স্বীয় হস্ত কখনও কলুষিত করেন নাই। একটি লোককেও তিনি হত্যার জন্য প্ররোচিত করেন নাই। আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বীরত্ব, রণকৌশল, মহানুভবতা এবং অসীম ধৈর্যবল তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর করিয়া রাখিবে। এহেন স্বদেশ-প্রেমিকের প্রতি প্রত্যেক জাতির বীর ও সাধু-সজ্জনগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।" বলা নিষ্প্রয়োজন, বিদ্রোহের অপর কোন নেতার প্রতি ইংরেজ লেখকগণ এতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই।

কোন কোন ইংরেজ লেখকের মতে বিদ্রোহীদের দলে উপযুক্ত নেতার অভাব গোলাবারুদ অপেক্ষা অধিক ছিল। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন সকলের সমান আস্থাবান এই মহান নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাই চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে বিদ্রোহীদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে পরাজয়ের পূর্বাভাস বলিয়াও মনে করিতে আরম্ভ করেন। সত্য বটে, বেগম হজরত মহল ইহার পরও একাধিক খণ্ডযুদ্ধে যথেষ্ট সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কোন কার্যকলাপে জনসাধারণ ইতিমধ্যে তাঁহার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মওলানার মৃত্যুর পর তাঁহার দলেও ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়।

স্যার টমাস সীটন মওলানাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন। তিনি বলেন, "বিদ্রোহীদের দলে তাঁহার ন্যায় বহুগুণসম্পন্ন কোন লোক ছিলেন না। তিনি যেমন সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেমনি নির্লোভ ও নিরহঙ্কার ছিলেন।"

বিদ্রোহের ইতিহাস লেখকগণের মতে মওলানার অকাল মৃত্যুই অযোধ্যায় ইহার নাটকীয় অবসানের প্রধান কারণ। ইহা সত্য যে, মওলানার জনপ্রিয়তায় বেগম হজরত মহল ঈর্ষান্বিতা ছিলেন এবং তাঁহার সহিত অহেতুক বিবাদে প্রবৃত্তা হইতেন। কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে, তিনি মওলানাকে তাঁহার পুত্র বিরজিশ কদরের সিংহাসনের প্রধান স্তম্ভ বলিয়া মনে করিতেন।

পাটনায় চাঞ্চল্য

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর প্রতিষ্ঠিত মুজাহিদ দলের প্রধান কার্যালয় ছিল পাটনায়, ইহা উপরে একস্থানে বলা হইয়াছে। ইহার জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল তখন মুসলমান। মুজাহিদগণের দীর্ঘ কালব্যাপী প্রচারের ফলে পাটনার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল উত্তপ্ত বারুদাগারের ন্যায়। অথচ ১৮৫৭ সালের ১৯শে জুনের পূর্বে তথায় কোন চাঞ্চল্যই প্রকাশ পায় না। কেহ কেহ মুসলমানের এই নিস্তব্ধতাকে ঝড়ের পূর্বাবস্থার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত তারিখে পাটনার কমিশনার মিঃ টেলর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে একটি জরুরী বৈঠকে আহ্বান করেন। বৈঠকে কিন্তু তেমন বিশেষ কিছু আলোচিত হয় নাই। বৈঠক ভঙ্গের পর মুহূর্তে মিঃ টেলরের আদেশে লুক্কায়িত স্থান হইতে একদল সশস্ত্র সৈন্য আসিয়া মুজাহিদগণের তিন জন বিশিষ্ট নেতা যথা, মওলানা মোহাম্মদ হোসেন মওলানা আহমদ উল্লাহ্ ও মওলানা ওয়ায়েজুল হককে গ্রেফতার পূর্বক একদল শিখ সৈন্যের পাহারাধীনে আটক রাখেন। অতঃপর বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র তল্লাশীর নামে ৩রা জুলাই পর্যন্ত পাটনার মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে। আবেদন নিবেদনে কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া পাটনার সম্ভ্রান্ত পুস্তক ব্যবসায়ী ও মুজাহিদ পীর আলির নেতৃত্বে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য একটি বিরাট মিছিল পাটনার ম্যাজিস্ট্রেটের অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র, ক্যাথলিক গীর্জাভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে একদল শিখসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শিখ সৈন্যরা বেপরোয়াভাবে গুলীগোলা চালাইয়া বহু লোককে হতাহত করে।

এই সংঘর্ষের পর পাটনায় ৩২ জন নেতৃস্থানীয় মুসলমানকে অন্যায়-ভাবে গ্রেফ্তার করিয়া তাঁহাদের চৌদ্দ জনকে প্রথম দফায় জনৈক শ্বেতাঙ্গ বিচারকের আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক যেন ইঁহাদের প্রতি ফাঁসির আদেশ দানের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। ফাঁসির পর ইহাদের মৃতদেহগুলি প্রকাশ্য স্থানে সপ্তাহকাল ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দফায় পীর আলী সহ আরও ১৬ জনের ফাঁসি হয়। ফাঁসির পূর্বে পীর আলি কর্তৃপক্ষের শত নির্যাতনের মধ্যেও যে মনোবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনুকরণযোগ্য। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি করিতে করিতে তিনি নির্বিকারচিত্তে ফাঁসির রজ্জু নিজেই গলায় পরিয়া লইয়াছিলেন। অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে একজন খালাস পান। অপরজন (আহম্মদ বেলাল) কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন করেন। পাটনার ঘটনার প্রতিবাদে দানাপুরের সিপাহীরাও বিদ্রোহ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজদের সতর্কতার জন্য ইহা বিশেষ কার্যকর হইতে পারে নাই। তত্রাচ বিদ্রোহীদের অনেকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত এবং অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা হয়।

কুমার সিংহ

পাটনার উপরোক্ত ঘটনার পর বিহারের সর্বত্র দেশীয় সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জগদীশপুরের সম্ভ্রান্ত এবং দানশীল জমিদার কুমার সিংহ এই উত্তেজনাকে বিদ্রোহের রূপ দান করেন। কুমার সিংহ ছিলেন বিদ্রোহীদের সর্বাপেক্ষা বয়োঃজ্যেষ্ঠ নেতা। সাবধানতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ইংরেজদের শক্তি ও সামর্থ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করিতেন না। সেজন্য গোড়া হইতেই তিনি গেরিলা যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। তাঁহার সৈন্য পরিচালনা কৌশলের দরুন কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটির পর একটি করিয়া তিনি বিহারের প্রায় সমস্ত এলাকায় ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা ও প্রভাব নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

পরাজিত ইংরেজ সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া একবার তিনি অযোধ্যা সীমান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। এস্থানেই তাঁহার বিপর্যয় শুরু হয়। একটি সংঘর্ষে তিনি স্বয়ং আহত হন। সেই অবস্থায়ও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত থাকিতেন। ইতিমধ্যে নূতন নূতন সৈন্যদল আসিতে থাকায় কুমার সিংহের উপর ইংরেজদের চাপ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রণশ্রান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দেওয়ার মানসে তিনি অতঃপর তাহাদিগকে লইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেস্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার অমর সিংহ তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু অতঃপর বিদ্রোহীরা আর কোথাও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বয়সের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শত মুখে কুমার সিংহের কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে হয়। ইংরেজ লেখকগণের মতে আজিমউল্লাহ, তাঁতিয়া তোপী, কুমার সিংহ, আহমদ উল্লাহ, শাহজাদা ফিরোজ প্রমুখ বিদ্রোহের নায়কগণ যদি একটি বারের জন্যও কোথাও একত্রিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিতে হইত। বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য কামানের গোলায় কুমার সিংহের প্রাসাদ ও দেবমন্দির ভূমিস্মাৎ করিয়া দিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, উপরন্তু তাহারা তাঁহার ভ্রাতা অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের বাসভবন সহ আরও শত শত লোকের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থের জন্য তাহারা নারী-পুরুষ নির্বিচারে জগদীশপুর এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের হাজার হাজার লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের মৃতদেহ গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল।

দিল্লী বিদ্রোহীদের অধিকারে যায় ১৮৫৭ সালের ১২ই মে। পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে উহা বিদ্রোহীদের হাতছাড়া হইয়া পড়ে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর দিল্লীর গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু বাহাদুর শাহ সম্রাট ঘোষিত এবং ২০ সহস্রাধিক বিদ্রোহীর সমাবেশের পর আবার ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীই ছিল বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। তাই ইংরেজেরা ইহার পুনরধিকারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান, এমন কি বাহির হইতেও বহু সৈন্যসামন্ত এবং

গোলাবারুদ আনিতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে বিদ্রোহীদের সামরিক শক্তি যতটা হ্রাস না পাইয়াছিল, তাহাদের মর্যাদার হানি ঘটিয়াছিল উহার বহুগুণ বেশী।

দিল্লী কিন্তু সহজে অধিকৃত হয় নাই। ইংরেজকে শহর দখল করিতে যথেষ্ট রক্তক্ষয় করিতে হইয়াছিল। আম্বালা হইতে সৈন্য আমদানী করিয়া ইংরেজেরা দিল্লীর উত্তর দিকে অনুচ্চ পাহাড়গুলি প্রথমে দখল করেন। পরে পাঞ্জাব হইতে আরও সৈন্য আমদানী করা হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাহারা শহর দখলের জন্য হামলা শুরু করেন। ক্রমাগত ছয় দিন প্রাণপণ চেষ্টা এবং প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের পর দিল্লীর প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী ফটক তোপে উড়াইয়া দিয়া তাহারা শহরে প্রবেশ করেন। শহরে প্রবেশের পর রাজপথে তাহাদিগকে জনসাধারণের সহিত প্রচণ্ড স গ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। ফটকের মুখে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগ শহর ত্যাগ করে। ব.হাদুর শাহ পূর্ববর্তী রাত্রে বিদ্রোহীদের সর্বাধিনায়ক মোহাম্মদ বখ্‌ত খান এবং অন্যান্য নেতার সহিত নগর ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া ইংরেজদের গুপ্তচর এবং তাঁহার মোসাহেব ও আত্মীয় ইলাহী বখ্‌শ ও রজব আলির পরামর্শে সপরিবারে হুমায়ুনের সমাধিভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, একটি গোপন সুড়ঙ্গ পথে তিনি আগ্রা পৌঁছিতে পারিবেন। ইহারাই পুরস্কারের লোভে ইংরেজ সেনাপতিকে তাঁহার তথায় অবস্থানের কথা গোপনে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

বাহাদুর শাহের আত্মসমর্পণ

শাহী পরিবারের কাহারও কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করা হইবে না, ইলাহী বখ্‌শ এবং রজব আলির মারফৎ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এই অভয়বাণী পাইয়া বাহাদুর শাহ ২১শে সেপ্টেম্বর তদীয় পত্নী জিন্নাতমহল ও সর্ব-কনিষ্ঠ শাহজাদা জিওয়ান বখ্‌ত সহ তাঁহাদিগকে গ্রেফ্‌তারের জন্য প্রেরিত ক্যাপ্টেন হড্‌সনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হইয়া তাঁহারা মামুলী পাল্কিতে শহরে আনীত হন। পর দিবস অনুরূপ শর্তে এবং প্রায় অনুরূপভাবে বাহাদুর শাহের অপর দুই পুত্র মির্জা খিজির

সুলতান ও মির্জা মোগল এবং পৌত্র আবু বকর একই স্থান হইতে ক্যাপ্টেন হড্সনেরই নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গো-শকট আরোহণে বাধ্য করা হয়। নরপিশাচ হড্সন দিল্লীর পথে শেষোক্ত তিন জনকে তাঁহাদের দর্শনপ্রার্থী সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে গো-শকট হইতে নামাইয়া লইয়া বিনা কারণে গুলী করিয়া হত্যা করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য হড্সনকে একটি কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দিতে হয় নাই। হত্যার পর ইঁহাদের মৃতদেহ কোতওয়ালীর সামনে লটকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরে মির্জা মোগলের মস্তকটি বাহাদুর শাহের নিকট প্রেরিত হয়।

এদিকে দিল্লীর রাজপথে সংগ্রামের অবসান ঘটিলে, ইংরেজ সৈন্যরা গৃহের মধ্য হইতে নিরপরাধ পুরুষ স্ত্রী, বালক-বালিকাকে টানিয়া আনিয়া হত্যা করিতে থাকে। তিন দিন ব্যাপী হত্যাকাণ্ডের ফলে সর্ব সমেত প্রায় ২৬ হাজার নিরপরাধ ও নিরস্ত্র নাগরিক তাহাদের হাতে প্রাণ হারায়। ইংরেজদের ভয়ে শহর এমন খালি হইয়াছিল যে, নিহতদের শবদেহ কবরস্থ বা সৎকারের জন্য লোক পাওয়া যায় নাই। দিল্লীর তখনকার অবস্থা স্মরণ করিলে এখনও এক অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এ সময় মওলানা আবুল কালাম আজাদের ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পিতা গোপনে দিল্লী ত্যাগ করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান। হত্যাকাণ্ডের সময় এবং পরে ইংরেজ সৈন্যরা কয়েকদিন ব্যাপী শহরে লুঠতরাজ চালায়। অতঃপর আরম্ভ হয় স্যার টমাস মেট্কাফের আদালতে বিচারের অভিনয়। ইংরেজ ও শিখ সৈন্যরা যাহাকে সামনে পাইল তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত করিতে থাকিল। চেহারার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই স্যার মেটকাফ রায়ে বলিয়া দিতে থাকেন, ফাঁসি, যাবজ্জীবন কারাবাস এবং অত্যন্ত কম ক্ষেত্রে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। এই অভিনয়ের শিকার হইয়াছিল কয়েক সহস্র লোক।

আত্মসমর্পণের তারিখ হইতে চারি মাস কাল আটক থাকার পর তাঁহাদেরই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রমে ১৮৫৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তথাকথিত বিচারের জন্য বাহাদুর শাহকে আদালতে

উপস্থিত করেন। দিল্লীর লালকেল্লার মধ্যে অবস্থিত রাজপ্রাসাদের 'দেওয়ানী খাস' নামক যেই দরবারকক্ষে বাহাদুর শাহের পূর্ব পুরুষগণের সহিত একটি বার সাক্ষাৎ করিতে পারিলে পৃথিবীর যে কোন লোক নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সে কক্ষেই তাঁহাকে আসামী হিসাবে উপস্থিত করা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে চারি দফা অভিযোগের শুনানী চলিয়াছিল চল্লিশ দিন। ১৮৫৮ সালের ৯ই মার্চ এই অভিনয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিচারে তাঁহার প্রতি চিরনির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হয়।

ইহার অল্প কয়েকদিন পর কড়া পাহারাধীন একখানি ট্রেনে গোপনে বাহাদুর শাহকে সপরিবারে প্রথমে কলিকাতায় এবং তথা হইতে ক্যানিং টাউনে একটি অপেক্ষমান জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়। রেঙ্গুনের অদূরে অবস্থিত পেগু শহরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সেখানে রোগে, শোকে, দুঃখ ও ক্ষোভে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তাঁহাকে রেঙ্গুন আনা হয়। মাত্র তিন বৎসর বন্দী-জীবন যাপনের পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়েন। রেঙ্গুনের ঘোড়দৌড়ের পুরাতন মাঠের এক কোণে বাহাদুর শাহ ও তদীয় পত্নী এক্ষণে চিরবিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন। শাহজাদা জিওয়ান বখ্ত অল্প বয়সে এবং অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় বাবরের সাক্ষাৎ বংশধর বলিতে আজ আর কেহ নাই। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! মহান মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর যেদিন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়া এদেশে আগমন করেন, সেই দিন তিনি নিশ্চয়ই ইহা চিন্তাও করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার বংশের সর্বশেষ সম্রাটকে ইংরেজদের বন্দী হিসাবে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব দ্বার দিয়া এদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইবে। বাবরের ন্যায় বাহাদুর শাহও ভারতবর্ষের বাহিরে সমাধিস্থ হইয়াছেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর দত্তক পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া স্বত্বলোপ নীতি অনুসারে ঝাঁসী ইংরেজদের সাক্ষাৎ শাসনাধীন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। ঝাঁসীতে ১৮৫৭ সালের জুন মাসে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার খুব

অল্প সময়ের মধ্যে উহা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহের নেত্রী হইলেন তথাকার বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ। রাণী লক্ষীবাঈকে দক্ষিণাপথের চাঁদ সুলতানা এবং সম্রাজ্ঞী সুলতানা রিজিয়ার সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। তাঁহার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভীম বিক্রমে লড়াই করিতে থাকে। তাহাদের হাতে তথায় কিছু সংখ্যক ইংরেজকে প্রাণ হারাইতে হয়। কিন্তু দিল্লীর পতনের পর ১৮৫৮ সালের গোড়ার দিকে ঝাঁসী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায়। নানা সাহেবের প্রধান সেনাপতি মহারাট্টা বীর তাঁতিয়া তোপী এ সময় মধ্য ভারতে অবস্থান করিতেছিলেন। লক্ষীবাঈর সৈন্যদের উপর ইংরেজ সৈন্যদের ক্রমবর্ধমান চাপের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। কিন্তু নানা অসুবিধার দরুন তাঁহাকে সেই প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়। ইংরেজ সেনাপতি স্যার রোজের বাহিনী ঝাঁসীতে প্রবেশ করিলে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে। অতঃপর রাণী লক্ষীবাঈ তাঁহার সৈন্যসামন্ত সহ গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন।

ঝাঁসী দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা এক সপ্তাহ কাল ব্যাপী এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি লুণ্ঠন করিয়া বেড়ায়। মাত্র ৭৫ জন ইংরেজের প্রাণহানির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসময় তাহারা ঝাঁসীর পাঁচ হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। আহত লোকের সংখ্যা ছিল ইহারও কয়েক গুণ বেশী। রাণী লক্ষ্মীবাঈ যখন বাহির হইতে সাহায্যের প্রতীক্ষায় পাহাড়ে, বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন সেই সময় সম্পূর্ণ অতর্কিত-ভাবে স্যার রোজ কর্তৃক আক্রান্ত হন। আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যু, এই দুইয়ের একটি ছাড়া অন্য কোন উপায় তখন আর ছিল না। লক্ষ্মীবাঈ শেষটির অনুকুলে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তরবারি হস্তে শত্রুদের সম্মুখীন হন। শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই স্যার রোজ এযুদ্ধে জয়ী হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই এই বীরাঙ্গনার মৃত্যু হয়। পাছে তাঁহার শবদেহের অবমাননা হয়, এজন্য তাঁহার দত্তকপুত্র দামোদর রাও এবং তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ তাড়াতাড়ি উহা স্থানান্তর পূর্বক হিন্দু শাস্ত্র মতে সৎকার করেন। এই ঘটনা সংঘটিত হয় ১৮৫৮ সালের ১৮ই জুন অর্থাৎ বিদ্রোহের পূর্ণ এক বৎসর পরে। রাণী

লক্ষ্মীবাঈর মৃত্যুর পর হইতে মধ্য ভারতে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে।

মাত্র এক বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা বঞ্চিত অযোধ্যা এবং হাফিজ রহমত উল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর দেশ রোহিলাখণ্ডেই ইংরেজদিগকে সর্বাধিক বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই প্রদেশে ইংরেজেরা যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে উহার নজীর কচিৎ পরিদৃষ্ট হইবে। বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য যখনই এই দুই প্রদেশের কোন শহরে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহারা নিরীহ ও নিরপরাধ অধিবাসীর রক্তে ইহার রাস্তাঘাট রঞ্জিত করিয়াছে, তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, নারীদের সম্ভ্রমের হানি ঘটাইয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে লোপাট করিয়াছে। লক্ষ্মৌ শহরে ইংরেজদের হাতে নিহত লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রথম দিনে দশ হাজার। নগরবাসীদিগকে কি ভাবে লুণ্ঠন করা হইয়াছিল তাহা নীচের ঘটনাটি হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে: লুণ্ঠনের লোভে নেপালের মহারাজা অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুরের পরিচালনাধীনে এক বিরাট বাহিনী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের সাহায্যেই ইংরেজেরা লক্ষ্মৌ এবং আরও কয়েকটি শহর বিদ্রোহীদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে সক্ষম হয়। এই সাহায্যের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ ইংরেজ তাহাদিগকে লক্ষ্মৌ লুণ্ঠনে তাহাদের অংশীদার করিয়া লইয়াছিলেন। লুণ্ঠনলব্ধ মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী এবং ধনরত্ন নেপাল সীমান্তে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য চারি সহস্র গো শকটের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মৌ শহরে গণহত্যায় নেপালী ও শিখ সৈন্যরাই চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। কৃপাণ ও খড়্গীর সাহায্যে এই গণহত্যা সাধিত হয়।

অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডে বহু সংখ্যক প্রতিপত্তিশালী তালুকদার ছিলেন। মুসলমান তালুকদারগণের শতকরা ৮০ ভাগ এবং হিন্দু তালুকদারগণেরও প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন অথবা তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এক এক জন তালুকদারের অধীনে শত শত গ্রাম এবং উহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। বিক্ষুব্ধ তালুকদারের অনুসরণে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণও বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া

পড়িয়াছিল। এ কারণেই উক্ত দুই প্রদেশে মুক্তি-সংগ্রাম এত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। ফয়েজাবাদের মওলানা আহমদ উল্লাহ, বেগম হজরত মহল এবং খান বাহাদুর খানের কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে আরও কতিপয় বিদ্রোহী নেতার পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইল।

নওয়াব তোফাজ্জল হোসেন

নওয়াব তোফাজ্জল হোসেন খান ফারোখাবাদে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেন। বিদ্রোহের গোড়ার দিকে তিনি বেশ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের হাতে পরাজয়ের পর তিনি নূতন করিয়া অর্থ ও লোক সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার পরিচিত জনৈক ইংরেজ অফিসার ক্ষমার বিনিময়ে তাঁহাকে ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলেন। উক্ত ইংরেজ কর্মচারী তাঁহাকে পরে লিখিতভাবে ক্ষমাও করিয়া দিয়াছিলেন। উর্ধতন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধু এজন্য ইহা শেষ পর্যন্ত মানিয়া লইয়াছিলেন যে, ইহার অন্যথা করিলে ইংরেজদের প্রতিশ্রুতির উপর জনসাধারণের আস্থা আরও লোপ পাইবে। ক্ষমা তাঁহাকে করা হইয়াছিল সত্যই। কিন্তু তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি ও মান ইজ্জত কাড়িয়া লইয়া ইংরেজেরা তাঁহাকে ফারোখাবাদের একটি চৌরাস্তার পার্শ্বে বসিয়া অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষা করিয়া কাটাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। হত্যা না করিয়া এ ধরনের ক্ষমার জন্যই সম্ভবতঃ ইংরেজেরা তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে 'ক্ষমার অবতার' বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। ক্ষমা তিনি করেন নাই, তাহা নয়। ক্ষমা তিনি করিয়াছিলেন নরপিশাচ ইংরেজ সৈন্যদিগকে—ভারতবাসীকে নয়।

আগ্রার বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মুরাদ আলি বিদ্রোহের পূর্বে শহর-কোতোয়াল ছিলেন। দয়ার্দ্রচিত্ত ও সুবিবেচক কর্মচারী হিসাবে তিনি আগ্রায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। ১৮৫৭ সালের ৫ই জুলাই তিনি একটি পুলিশ বাহিনী লইয়া শহর প্রদক্ষিণ করেন। নিমিচ ও নাসিরাবাদ হইতে বিদ্রোহী বহু সৈন্য আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বহু ইংরেজ তৎপূর্বেই আগ্রা হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। আগ্রার ইংরেজ সৈন্যরা

গোলা বারুদাগারগুলি সুরক্ষিত করিয়া আগ্রার ঐতিহাসিক দুর্গে অবস্থান করিতে থাকে। বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে ইংরেজ সৈন্যদের পরাজয়ের পর মুরাদ আলি গোটা পুলিশ বাহিনী সহ একটি প্রকাশ্য স্থানে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের নামে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। আগ্রার যুদ্ধে পরাজয়ের পর তিনি আলিগড় এবং এটোয়ায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। ইংরেজেরা পরে তাঁহাকে বহু সংখ্যক অনুচর সহ বন্দী করিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করেন।

মোবারকপুরের বিশিষ্ট তালুকদার রাজা ইরাদৎ খান তাঁহার এলাকায় এবং জৌনপুরে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলনপূর্বক উভয় স্থান হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ইংরেজ এবং জঙ্গ বাহাদুরের নেপালী সৈন্যরা একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাজিত করে। ইঁহাকে অনুচরবর্গ সহ নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

স্থানীয় বিশিষ্ট জমিদার নওয়াব মেহেদী হোসেন নিজকে সুলতানপুরের নাজিম ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহ করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে ১৫ হাজার লোক ছিল। ইঁহাদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল মোটামুটিভাবে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত। তাঁহার সদর কার্যালয় ছিল চান্দা নামক স্থানে এবং তাঁহার সেনাপতি ছিলেন ফজলে আজিম। সারাওন নামক স্থানে ফজলে আজিম সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন। নেপালী সৈন্যদের সহায়তায় ইংরেজেরা উহা দখল করিয়া লইলে তিনি সৈন্যসামন্ত সহ নসরতপুরের তালুকদার রাজা বেণীপ্রসাদ সিংহের সহিত একত্রিত হন। সেনাপতি ফ্রাঙ্কস নেপালীদের সাহায্যে সারাওন ও নসরতপুর দখল করিলে পর ফজলে আজিম পলায়ন করেন। আন্দামানে তিল তিল করিয়া ফজলে আজিমকে দেহক্ষয় করিতে হইয়াছে।

১৮৫৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী জেনারেল ফ্রাঙ্কস নওয়াব মেহেদী হোসেনের সদর কার্যালয় চান্দা অভিযানে যাত্রা করেন। চান্দায় পৌঁছিয়া তিনি জানিতে পারেন, বান্দা হোসেন নামক জনৈক বেসামরিক কর্মচারীর উপর ইহার শাসন ও রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। বান্দা হোসেন সাহায্যের জন্য সুলতানপুরে মেহেদী হোসেনকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি তদুত্তরে জানান, তিনি স্বয়ং আসিতেছেন। কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কস মেহেদী

হোসেনের আগমনের পূর্বেই বান্দা হোসেনকে পরাজিত করিয়া চান্দা দখল করেন। বান্দা হোসেন হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ রামপুরা নামক স্থানে পশ্চাদ-পসরণ করেন। এদিকে মেহেদী হোসেন চান্দার নিকটবর্তী হামিরপুরে পৌঁছিলেই জেনারেল ফ্রাঙ্কস লুক্কায়িত স্থান হইতে হঠাৎ আক্রমণপূর্বক তাঁহার সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। মেহেদী হোসেন অতঃপর বাদশাগঞ্জ নামক স্থানে তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করেন। অযোধ্যার ভূতপূর্ব নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি মির্জা গফফার এবার সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এস্থানেও ইংরেজ সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালনা কৌশল এবং তাঁহাদের ভারী কামানের গোলার কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্রোহীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মেহেদী হোসেন অতঃপর আমরোহা গমন করেন। তথায় কয়েকটি বিপর্যয়ের পর তাঁহাকে অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। তাঁহার এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া ইংরেজেরা তাহাদের অনুগত লোকদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করিয়া দেন।

সান্দিলার বিখ্যাত চৌধুরী বংশসম্ভূত মনসাব আলি, হাশমত আলি এবং জৌনপুরের গোলাম হোসেন তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকায় বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করিয়া কেহ ফাঁসিকাষ্ঠে, কেহ গুলী ও সঙ্গীনের আঘাতে দেশ-প্রেমিকের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার—অপমৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হন।

দিল্লীর অদূরে গুরুগাঁও জেলায় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন হেকিম আবদুল হক। ইনি তথাকার দুই লক্ষাধিক অধিবাসীর অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন। ইঁহার দমনের জন্য ইংরেজ সেনাপতি সওয়ার্স তথায় প্রেরিত হন। একটি খণ্ড যুদ্ধের পর হেকিম আবদুল হক ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃত হন। সেনাপতি সওয়ার্সের আদেশে বিনা বিচারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হয়।

মুরাদাবাদের বিশিষ্ট ও বর্ষীয়ান তালুকদার নওয়াব নিজামত উল্লাহ খান তথাকার বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন। স্থানীয় সিপাহীরা সরদার ভবানী সিংহ এবং হাবিলদার বলদেও সিংহের পরামর্শ অনুসারে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। ধরা পড়ার পর তিনজনকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

শাহামল বারজুল নামক স্থানের একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। বারজুল মীরাট বিভাগে বড়াউথ জেলার মধ্যে অবস্থিত। ইংরেজ সৈন্যদের জন্য রক্ষিত শস্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এবং সমগ্র জেলা হইতে ইংরেজ কর্মচারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ইনি তাহাদের অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশেষে ডানলপ্ নামক জনৈক ইংরেজ পরিচালিত একটি মিশ্র সৈন্যদলের হাতে তাঁহার পরাজয় ঘটে। বন্দী অবস্থায় শিবিরে নীত হইলে ইংরেজেরা তাঁহার মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপর সংস্থাপনপূর্বক উহা প্রকাশ্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখেন। ইহার পর তাঁহার অনুচরদেরও অনেককে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। শাহমলের বিশাল জমিদারী ইংরেজভক্ত দুই ব্যক্তিকে দান করা হয়। ইহারা ইংরেজ শিবিরে গোপন অর্থাদি সরবরাহ করিয়াছিল।

নাজিরাবাদের প্রতিপত্তিশালী তালুকদার নওয়াব মাহমুদ খান ইংরেজদের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত সাহসের অভাববশতঃ ইংরেজদের হাতে বারংবার তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। ধরা পড়িবার পর তাঁহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছিল। এক তরফা বিচারে তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। ইহার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অন্যায়ভাবে তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে অতি দুঃখকষ্টে জীবন যাপনে বাধ্য করিয়াছিলেন। আন্দামানে কয়েক বৎসর জীবন যাপনের পর সারওয়াকের ইংরেজ রাজার অনুরোধে তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করা হয়। রাজার অতিথি হিসাবে তিনি অবশিষ্ট জীবন তথায় অতিবাহিত করেন।

এলাহাবাদের আতাউল্লাহ খান বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিদ্রোহে যোগদান করিয়া যুদ্ধে নিহত হন। কোথায় এবং কি প্রকারে পুত্রের মৃত্যু হয় তাহা বহুদিন তিনি জানিতে পারেন নাই। পরে সঠিক সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি পুত্রের রুহের মাগফেরাৎ (মুক্তি) কামনার জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ইংরেজেরা তাঁহার এই কার্যকে বিদ্রোহে উস্কানী পর্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার গৃহ তল্লাশী করে। তল্লাশীর ফলে তাঁহার সিন্দুকে কয়েকটি অতি পুরাতন আফগান মুদ্রা

পাওয়া যায়। এই অপরাধেই তাঁহার ফাঁসি এবং যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত হয়।

বর্বরোচিত ব্যবস্থা

বিদ্রোহের সময় শুধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণকে ফাঁসির ক্ষমতা দিয়া ইংরেজেরা ক্ষান্ত থাকেন নাই। অধিকন্তু বে-সরকারী প্রত্যেক ইংরেজকেও অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে যে কোন ইংরেজ যে কোন ভারতবাসীকে ধরিয়া আনিয়া ফাঁসি দিতে পারিতেন। এলাহাবাদে একদিন এইভাবে ১৫ জন লোকের ফাঁসি হয়। সমগ্র অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড এবং বিহারের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এইরূপে শত শত লোককে হত্যা করা হইয়াছিল।

এদিকে ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈর পরাজয় ও মৃত্যু মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধশক্তির মূলে যেই ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাঁতিয়া তোপী, শাহজাদা ফিরোজ এবং বান্দার নওয়াবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহার আর উপশম হয় না। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের সংবাদে তাই রাজপুতানা এবং মধ্যভারতের বিদ্রোহীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। তাহা ছাড়া পশ্চিমে বোম্বাই এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ হইতে অনবরত তাহাদের উপর আঘাত আসিতে থাকে। এই দুইটি বন্দর ও প্রদেশে বিদ্রোহীদের কর্মতৎপরতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় ইংরেজেরা চীন, পারস্য, আফ্রিকা এবং ইংলণ্ড হইতে নূতন নূতন সৈন্যবাহিনী, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়া উত্তর ভারতে প্রেরণের পথে প্রথমে মধ্যভারতে উহা ব্যবহারের সুবিধা পায়। এস্থানে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতা উত্তরভারতে বৃটিশ সৈন্যদের বেশ সহায়ক হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ন্যায় মধ্যভারতেও ইংরেজেরা চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া সভ্য জগতের কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছেন। উদাহরণস্থলে গোণ্ড উপজাতির রাজা শঙ্কর শাহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গোণ্ড উপজাতীয় লোকজনেরা জবরলপুরের বিদ্রোহীদের সহায়তা করিয়াছিল এই অভিযোগে ইংরেজেরা তাহাদের রাজা শঙ্কর শাহ এবং রাজকুমারকে ধরিয়া আনিয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দেন। পর দিবস তাহারা উপজাতীয় আরও বহু লোককে ধরিয়া

আনিয়া অনুরূপভাবে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডে সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারায় এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি ইংরেজ সরকারে বাজেয়াফ্‌ত হইয়া যায়।

বান্দার নওয়াব প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তাঁহার যোগদানের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বান্দা ও কাল্পীর যুদ্ধে ইনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং কিছুদিন পরে তাঁতিয়া তোপীর সহিত একত্রিত হন। বান্দার প্রচুর ধনরত্ন এবং যুদ্ধাস্ত্র ইংরেজদের হস্তগত হয়। এই ধনরত্নের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া এড্‌-মিরালটির উচ্চতম আদালতে চাঞ্চল্যকর মামলা চলিয়াছিল। বান্দার নওয়াব বহুদিন পর ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন।

শোলাপুরের রাজা হায়দরাবাদের নিজামের একজন বিশিষ্ট সামন্ত রাজা ছিলেন। ইহার অনুচরদের সহিত বৃটিশ ও নিজামের সৈন্যদের কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষবার যুদ্ধে ইনি বন্দী হইয়া নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যার সালার জঙ্গের নিকট নীত হন। বৃটিশের মনস্তুষ্টির জন্য সালার জঙ্গ তাঁহাকে হায়দরাবাদের বৃটিশ রেসিডেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু স্যার সালার জঙ্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গভর্ণর-জেনারেল উহা মওকুফ করিয়া তাঁহার চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। প্রবাদ আছে, গভর্ণর-জেনারেলের এই কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া পাহারারত ইংরেজ সৈন্যরা তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। ইহার জন্য তাহাদিগকে কোন কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দিতে হয় নাই।

মওলবী আলাউদ্দীন

ইংরেজ শাসন বরদাশ্‌ত করিতে না পারিয়া রোহিলাদের একটি দল হায়দরাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে যায়। উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়া তাহাদের আদি বাসস্থান রোহিলাখণ্ডে, গণ-অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তাহারাও বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্বক হায়দরাবাদের বৃটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। মওলবী আলাউদ্দীন ও তোরাবাজ খান ইহাদের নেতা ছিলেন। নিজামের সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া তোরা-বাজ খান পলায়নের সময় গুলীর আঘাতে নিহত হন। মওলবী আলা-

উদ্দীনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগের জন্য আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। তথায় স্বল্পকাল পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হায়দরাবাদে মুসলমানেরা যখন খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নানা সাহেবের ভ্রাতা বলবন্তরাও মহারাষ্ট্রাদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজামের সাহায্যে ইংরেজেরা বিদ্রোহীদিগকে কোথাও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেন না। হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের মত বলবন্তরাওকে ইংরেজদেরই হাতে দেশপ্রেমের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহীদের ব্যর্থতার জন্য নিজামই সর্বতোভাবে দায়ী বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

ইন্দোরে বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন শাহাদৎ খান। তাঁহার পিতা হোলকারের অশ্বারোহী বাহিনীর একজন রিসালদার ছিলেন। শুল্ক আদায়ের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি ইন্দোরের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইতেন। শাহাদৎ খানকে স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। পিতার ন্যায় তিনিও অশ্বারোহী বাহিনীতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের ১লা জুলাই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ইন্দোরের বৃটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণ ও অধিকার করেন। সেই উপলক্ষে তাঁহার অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রেসিডেন্সী পুনর্দখলের পর তাঁহার কি হয় জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, শেষবারের যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

মধ্য ভারতের আর একজন খ্যাতনামা বিদ্রোহী নেতার নাম ওয়ালিদাদ খান। তিনি দিল্লীর রাজবংশ-সম্ভূত এবং উহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ইনি মালগড়ের বিখ্যাত দুর্গটি তিন মাস স্বীয় দখলে রাখিয়াছিলেন। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে পরাজয়ের পর ধৃত হইয়া ইনি ইংরেজদের হাতে নিহত হন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের অনেককেও ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে, বাংলাতেই বিদ্রোহ সূচিত হয়। এ প্রদেশে তখন দেশীয় সিপাহীদের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু তবু তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। ব্যারাকপুরের ন্যায় বহরমপুরের বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে ইংরেজদিগকে মোটেই বেগ

পাইতে হয় নাই। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ পৌঁছার পর কলিকাতার মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইহাদের সঙ্গে নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহের যোগাযোগ আছে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গে আটক রাখা হইয়াছিল। কলিকাতার হিন্দু অধিবাসীরা ইংরেজদিগকে সমর্থন করিতে থাকায় বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সত্ত্বেও এস্থানে কোন বিদ্রোহ ঘটে নাই। কারণ তাহারা জানিত, হিন্দুদের সহযোগিতার অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল নহে এবং বাঙ্গালী হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের সমর্থক।

চট্টগ্রামে বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর অর্থাৎ উত্তর ভারতে বিদ্রোহের প্রায় ছয় মাস পর চট্টগ্রামে একটি দেশীয় পদাতিক বাহিনী হাবিলদার রজব আলি খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজদিগকে নাগালের মধ্যে পাইয়াও অপরিণামদর্শীর ন্যায় তাহারা তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ না করিয়া ট্রেজারী লুণ্ঠন, জেল হইতে কয়েদীদের মুক্তিদান এবং অস্ত্রাগারে আগুন ধরাইয়া দিয়া নিজেদের ব্যারাক ত্যাগ করে। সীতাকুণ্ড হইতে তাহারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছে জানিতে পারিয়া চট্টগ্রামের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরার রাজা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই জন জমিদারকে বিদ্রোহীদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া সংবাদ পাঠান। বিদ্রোহীরা উদয়পুর হইতে আগরতলা রওয়ানা হয়। ত্রিপুরার রাজা তাহাদিগকে বাধা দানের জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা ইহাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া সিঙ্গারবিল হইয়া মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করে। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পথে ডিসেম্বর মাসে একটি থানা আক্রমণ করিয়া তাহারা নিজেদের তথায় উপস্থিতি প্রকাশ করিয়া দেয়।

এ সংবাদ সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে একদল সৈন্য পাঠান। প্রতাপগড় নামক স্থানে পৌঁছিয়া ইহারা জানিতে পারে, কোন এক নির্দিষ্ট দিন লাটু নামক স্থানে বিদ্রোহী-

দের পৌঁছার কথা। পর দিবস লাটুতে উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর বায়ঙ্গ নিহত হন। বিদ্রোহীরা অতঃপর মণিপুর এলাকায় উপস্থিত হয়। স্থানীয় এক রাজপুত্র তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। এস্থানে ইহারা অন্য রকমেও কিছু শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও পর পর তিন বার ইহাদিগকে সিলেট হইতে প্রেরিত শত্রু সৈন্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। চট্টগ্রাম হইতে যাত্রার পর মণিপুরের শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত রোগে, পথ-শ্রান্তিতে এবং যুদ্ধে সর্বসমেত তাহাদের তিন শত লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। বিদ্রোহীদের দলে ন্যূনাধিক চারিশত সিপাহী ছিল। অবশিষ্ট সিপাহিগণ তাহাদের মৃত সহকর্মীদের ন্যায় প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিবার জন্য মণিপুর এবং বর্মা সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় দিকভ্রান্তের ন্যায় বহুদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ইতি-মধ্যে ইংরেজ সৈন্যরা তাহাদের বাহিরে আসার পথগুলি কড়া পাহারাধীন রাখে। এমতাবস্থায় যে কয় মাস তাহাদের কাছে গোলাবারুদ ছিল, তাহারা উহার সাহায্যে বন্য পশু পক্ষী শিকার করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়াছিল। গোলাবারুদ নিঃশেষিত হইলে তাহারা নিজেরাই বন্য পশু-পক্ষী ও নরখাদকদের শিকারে পরিণত হয়। বিদেশীয়দের প্রতি ইহাদের বাঙ্গালীসুলভ সহৃদয়তাই যে ইহাদিগকে হিংস্র জীবজন্তু ও নরখাদকদের মুখে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

চট্টগ্রামে বিদ্রোহের সংবাদ চারি দিন পর ঢাকা পৌঁছিলে, ১৮৫৭ সালের ২২শে নভেম্বর ঢাকায় অবস্থানকারী দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নিকট হইতে বিনা কারণে ইংরেজেরা অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লন। অতঃপর ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ লুইস তাঁহার লোকজন লইয়া ইহাদের বাসস্থান লালবাগ পরিবেষ্টিত করেন। ইহাতে দেশীয় সিপাহীরা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। লালবাগে, ইহাদের বাসস্থানে বন্দুক ও গোলাগুলী বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না বলিয়া ইংরেজদের হাতে কিছু সংখ্যক সিপাহী সে সময় বন্দী হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে ভিক্টোরিয়া পার্কে (অধুনা বাহাদুর শাহ পার্ক) ফাঁসি দেওয়া হয়। সংঘর্ষের পর হতাবশিষ্ট দেশীয় সৈন্যরা তাহাদের মূল বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হওয়ার জন্য জলপাইগুড়ি অভিমুখে যাত্রা না করিয়া যদি উত্তে-জিত জনসাধারণের সহিত একযোগে ইংরেজ সৈন্যের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত

হইত, তাহা হইলে ঢাকায় বহু নিরপরাধ লোককে প্রাণ হারাইতে হইত না। ঢাকায় বিদ্রোহীদের সহযোগিতার অভিযোগে ধৃত পাতলা খানকে মত্ত হাতীর পদতলে পিষ্ট হইয়া প্রাণ দিতে হয়।

নেপালীদের কাণ্ড

জলপাইগুলি পৌঁছান পূর্বে ইহাদের একটি অংশ রংপুরের নিকট ইংরেজ সৈন্যদের পক্ষ হইতে ভীষণ এক বাধার সম্মুখীন হয়। নিরুপায় হইয়া তখন তাহারা ভূটানের দিকে প্রস্থান করে। ভূটান হইতে কিছু দিন পর তাহারা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করে। তাহারা জানিত না, নেপালীরা ইংরেজদের ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে বিদ্রোহ দমনের জন্য ইতিমধ্যে তাহাদের সঙ্গে দস্তুরমত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। নেপালের জঙ্গলে বর্ণনাতীত দুঃখকষ্ট ভোগের পর ইহারা অতি কষ্টে অযোধ্যায় পৌঁছে। তথায় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া একে একে সকলে নিহত হয়। অপর অংশটি জলপাইগুড়ি পৌঁছার নিরাপদ পথ না পাইয়া ঢাকার বনে জঙ্গলে দিন কাটাইয়া অবশেষে দস্যুবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

জলপাইগুড়ি ও মাদারীগঞ্জের একাদশ অনিয়মিত বাহিনীর একটি দল ১৮৫৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্বক দিনাজপুর অভিমুখে রওয়ানা হয়। দিনাজপুর হইতে পূর্ণিয়ার পথে তাহারা ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নেপাল সীমান্তে গমন করে। তথায় নেপালীরা ইহাদের উপর যে অত্যাচার করে তাহা নৃশংসতার দিক দিয়া নজীরবিহীন। নেপালীদের হাত হইতে ইহাদের একজনও রক্ষা পায় নাই। বিদ্রোহী সৈন্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দয়াপরবশ হইয়া ইংরেজদের কোন ক্ষতি সাধন ব্যাতিরেকে শিবির পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের জন্য সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল।

বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র রোহিলাখণ্ড ও অযোধ্যার পতনের পর বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট ইহা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল, সংগ্রামের অবসান ঘটিতে আর বিলম্ব নাই। তবু কতিপয় বিদ্রোহী নেতা শেষ চেষ্টা স্বরূপ

কখন সমবেতভাবে এবং কখন বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিতে থাকেন। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু সংখ্যক বিদ্রোহী ইতিমধ্যে মধ্য প্রদেশে গমন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রা বীর তাঁতিয়া তোপী তথায় নূতন করিয়া প্রতিরোধশক্তি গড়িয়া তোলার চেষ্টায় ছিলেন। উত্তর ভারত হইতে আগত বহু অভিজ্ঞ যোদ্ধার একত্রে উপস্থিতিতে মধ্য ভারতে আবার সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। ইংরেজেরা জানিতেন, উত্তর ভারতের বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলেও জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। সুতরাং মধ্য প্রদেশে বিদ্রোহী-দের বড় রকমের সাফল্য উত্তর ভারতে আবার গণ-বিপ্লবের মূলে জলসিঞ্চন করিতে পারে। মধ্য প্রদেশকেও বিদ্রোহীদের কবলমুক্ত করিবার জন্য তাই তাহারা সীমান্তে এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ করেন। অযোধ্যা কিম্বা রোহিলাখণ্ড হইতে অতঃপর আর কোন বিদ্রোহী নেতা যাহাতে মধ্য প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, সেদিকেও তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

এই ব্যবস্থার ফলে শাহজাদা ফিরোজ, রাজা বেণী বাহাদুর, বেগম হজরত মহল, মামুন খান, গোলাব সিংহ, নিজাম আলি খান, বিলায়েৎ শাহ, মোহাম্মদ হোসেন, রাও সাহেব প্রমুখ বিদ্রোহী নেতৃবর্গ অযোধ্যায় সাময়িকভাবে আটক হইয়া পড়েন। ইঁহাদের মধ্যে শাহজাদা ফিরোজ এবং রাও সাহেব সীমান্তে পাহারারত ইংরেজদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্বক আপন আপন অনুচরসহ মধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। অবশিষ্ট নেতৃবর্গের কেহ ধৃত হইয়া গুলীর আঘাতে অথবা ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দেন, আর কেহ নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রিত সহস্র সহস্র বিদ্রোহীর প্রতি বিশ্বাঘাতকতা করিয়া নেপালের মহারাজা তাহাদিগকে বৃটিশের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা বিচারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রতিও কঠোরতম দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। বেগম হজরত মহলের ভাগ্য সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ নীরব। সম্ভবতঃ তাঁহাকেও গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। নওয়াব মামুন খান ছিলেন বেগম হজরত মহলের নায়েব অর্থাৎ ডেপুটি। অযোধ্যায় অনেক কয়টি যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পরে ধৃত হইয়া তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন।

শাহজাদা ফিরোজ

উপরে বলা হইয়াছে, উত্তর ভারতের বিদ্রোহীদের আশা-ভরসা নির্মূল হওয়া সত্ত্বেও মধ্য ভারতে তাঁতিয়া তোপী এবং কতিপয় বিদ্রোহী নেতা বহু দিন বিদ্রোহ জীয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁতিয়া তোপীর সাফল্যের কথা শুনিয়া শাহজাদা ফিরোজ তাঁহার সহিত একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাহজাদা ফিরোজ ছিলেন দিল্লীর মোগল রাজবংশের সর্ব শেষ কৃতবিদ্য সন্তান। ইনি ছিলেন বাহাদুর শাহের পিতৃব্য পুত্র। ইনি যেমন বিচক্ষণ তেমনি সাহসী ছিলেন। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে ইঁহার দান অবিস্মরণীয়। একাধিক যুদ্ধে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও স্থির মস্তিষ্কের পরিচয় প্রদান করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। হজ্বরত সমাধা করিয়া তিনি দিল্লীর উদ্দেশ্যে পশ্চিম ভারতে পৌঁছিলে পর সমগ্র উত্তর ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। তিনি সেস্থানেই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া তথা হইতে অযোধ্যা গমন করেন। অযোধ্যা হইতে মধ্য ভারতের পথে তিনি বহু খণ্ডযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে মাণ্ডিসরের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ডুরাণ্ডের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি অনুচরবর্গসহ রোহিলাখণ্ডে প্রবেশ করেন। রোহিলাখণ্ডেও তিনি একাধিক সংঘর্ষে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর সেনাপতি ক্লাইভের নিকট পরাস্ত হইয়া তিনি অযোধ্যা গমন করেন। হোসেনগঞ্জ নামক স্থানে শাহজাদা তাঁহার সদর দফতর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি ইংরেজদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অযোধ্যার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনুচরবর্গসহ বিচরণ করিতে থাকেন। অযোধ্যায় বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর তিনি মধ্য ভারতে তাঁতিয়া তোপীর সহিত একত্রিত হওয়ার জন্য অযোধ্যার সীমান্তে পৌঁছেন। তথায় পৌঁছার পর তিনি বুঝিতে ও জানিতে পারেন, তাঁহাকে ধরিবার জন্য ইংরেজেরা তাহাদের বাছাই সৈন্যদল নিয়োগ করিয়াছেন এবং সীমান্তে এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে, উহা অতিক্রম করিতে গেলেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অত্যধিক। বিস্থুয়া হইতে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ১৮৫৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর গঙ্গা নদী অতিক্রম

পূর্বক প্রচার করিতে থাকেন, তিনি উত্তর দিকে যাইবেন। অথচ তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন এটোয়া অভিমুখে। তাঁহার অনুসরণকারী মিঃ হিউম ও ক্যাপ্টেন ডয়েল তাঁহারই হাতে প্রাণ হারান। অতঃপর ব্রিগেডিয়ার হারবার্টের পরিচালনাধীন অনুসরণকারী দলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি ঝাঁসী অভিমুখে এত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন যে, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি রাণড় নামক স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হন। এস্থানেই তাঁহাকে সর্ব প্রথম ভীষণ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়।

সেনাপতি চার্লস নেপিয়ার অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, ফিরোজ আগ্রা হইয়াই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিবেন। তাই তিনি একটি ভিন্ন পথে ক্ষিপ্র গতিতে তাঁহার আগমনের পূর্বে আগ্রা পৌঁছেন। ফিরোজ যথাসময় ইহা জানিতে পারিয়া সেদিকে অগ্রসর না হইয়া ইংরেজদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার দুর্বল স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ইংরেজেরা এমনভাবে সমস্ত পথঘাটে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে তাঁহার পক্ষে মধ্য ভারতে প্রবেশ এক রকম অসম্ভব মনে হইতেছিল। এ সময় আহম্মদ বেলাল নামক জনৈক বাঙ্গালী বিদ্রোহীর প্রস্তাবক্রমে ফিরোজ তাঁহার মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ও অশ্বটি তাঁহাকে দেন। আহম্মদ বেলাল তাঁহার প্রদত্ত পোশাকে সুসজ্জিত হইয়া অল্প কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ ইংরেজদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণের জন্য রওয়ানা হইয়া যান। পরবর্তী কয়েক দিন আজ এস্থানে, কাল আর এক স্থানে, পর দিবস অন্য স্থানে অতর্কিতে ইংরেজদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণপূর্বক তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আক্রান্ত ঘাঁটির সৈন্যদের মধ্যে যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিত, তাহারা অফিসারগণের নিকট ইহাই জানাইত, ফিরোজ স্বয়ং আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের এই উক্তির সমর্থনে তাহারা শাহজাদা ফিরোজের পোশাক-পরিচ্ছদ, পতাকা এবং অশ্বের সঠিক বর্ণনা দিত। পর পর এরূপ কয়েকটি আক্রান্ত ঘাটির লোকজনের মুখে ফিরোজের গতিবিধির সন্ধান পাইয়া তাহারা সম্ভাব্য পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট এক স্থানে বিপুল সংখ্যায় সমবেত হইলে, ফিরোজ অরক্ষিত স্থান দিয়া অনায়াসে তাঁহার লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছেন। পথে আরও কয়েক বার তাঁহাকে ইংরেজ সৈন্যদের মোকাবিলা করিতে হইয়াছিল। রাজগড়ে

পৌঁছিয়া তিনি তাঁতিয়া তোপীর জন্য তথায় কয়েক দিন অপেক্ষা করেন। অবশেষে ১৮৫৯ সালের ৯ই জানুয়ারী তিনি ইন্দ্রগড়ে পেঁাছেন এবং ১৩ই জানুয়ারী তাঁতিয়া তোপীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে।

এদিকে ছদ্মবেশী আহম্মদ বেলালকে ইংরেজ সৈন্যরা ফিরোজ মনে করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁহাকেই আক্রমণ করে। আহম্মদ বেলাল আহত অবস্থায় বন্দী হইলে পর ইংরেজেরা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। আহম্মদ বেলাল ও তাঁহার অনুচরগণের তৎক্ষণাৎ ফাঁসি হইয়া যায়। শাহজাদা ফিরোজের জন্য তাঁহার এই আত্মত্যাগ বিদ্রোহের শেষের দিকের একটি প্রধান ঘটনা।

ইন্দ্রগড়ে অবস্থানকালে ফিরোজ জানিতে পারেন, দুইটি ইংরেজ বাহিনী তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টনের জন্য অগ্রসর হইতেছে। ইংরেজ সৈন্যদিগকে এড়াইবার মানসে তাঁহারা জয়পুর ও ভরতপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত দেবসা নামক শহরে উপনীত হন। ইংরেজেরা তাঁহাদের এই গতিবিধির বিষয়ও কোন এক সূত্রে জানিয়া লইয়াছিলেন। দেবসাতে তাঁতিয়া তোপী, ফিরোজ এবং রাও সাহেব যখন সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে আলোচনায় রত, ঠিক সে সময় ইংরেজ সেনাপতি সওয়ার্স সদলবলে তথায় প্রবিষ্ট হন। ইংরেজ সৈন্যের এই অতর্কিত আক্রমণে ইঁহাদের প্রায় তিন শত অনুচর নিহত এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করে। নেতৃবর্গের প্রাণ রক্ষার জন্য ইহাদের এই আত্মদান বিদ্রোহের একটি প্রধান ঘটনা। বিদ্রোহী নেতৃবর্গ অতঃপর মাড়োয়ার, আলোয়ার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৫৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী শিকার নামক স্থানে পৌঁছেন। সে রাত্রেই বৃটিশ সেনাপতি হোমস তাঁহার বাহিনী লইয়া ইঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। নেতৃবর্গ এই আক্রমণের জন্যও আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। এই সংঘর্ষে বহু বিদ্রোহী হতাহত এবং তাঁহাদের প্রচুর রণসম্ভার হোমসের হস্তগত হয়। ইহার মাত্র কয় দিন পর ক্ষমার বিনিময়ে তাঁহাদের ছয় শতাধিক রণশ্রান্ত অনুচর বিকানীরের মহারাজার নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এই পরাজয়ের পর ফিরোজ ক্ষুণ্ণ মনে তাঁতিয়া তোপীর সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দক্ষিণাত্য অভিমুখে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ

অনুমান করেন, তাঁতিয়া তোপীর মনোভাবে আশ্চর্য রকম পরিবর্তন দেখিয়া ফিরোজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ফিরোজের অবশিষ্ট জীবন ঘটনা-বহুল, কৌতূহলোদ্দীপক এবং হৃদয়স্পর্শী। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ইংরেজেরা হাজার হাজার সৈন্য ও গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরোজ তাহাদের সকল চেষ্টা ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া বিন্ধ্যাচলে বিদ্রোহকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিফল মনোরথ হইয়া বিন্ধ্যাচল হইতে অবশেষে তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু প্রদেশ এবং তথা হইতে সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হন। এস্থানে তিনি মুজাহিদ শিবিরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া উপজাতিদের কার্যকলাপে বিশেষ বিরক্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া মধ্য এশিয়ায় প্রস্থান করেন। সম্ভবতঃ সেস্থানে তিনি বেশ অধিক বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁতিয়ার ফাঁসি

এদিকে শিকার নামক স্থান হইতে পলায়নের পর তাঁতিয়া তোপী বাঁশবাড়ার জঙ্গলে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। এ সময় রাও সাহেবের সহিত তাঁহার মতানৈক্য প্রবল আকার ধারণ করে। ফিরোজের ন্যায় রাও সাহেবও অগত্যা তাঁতিয়া তোপীকে ত্যাগ করিয়া যোধপুরের পশ্চিমে কোন এক স্থানে গমন করেন। কিন্তু স্থানটি নিরাপদ নয় মনে করিয়া তিনি তিন সহস্রাধিক অনুচর সহ প্রতাপগড়ে ফিরিয়া যান। এস্থানে কানপুর ও বেরেলী হইতে আগত তাঁহার মুসলমান অনুচরবর্গও তাঁহাকে ত্যাগ করেন। অন্যান্য দলপতি এবং দেশপ্রেমিকগণ নিকটবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক এতদঞ্চলের অধিবাসীদের দানে বহু দিন জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে একে একে তাঁহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। রাও সাহেব তাঁহার দল সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া কিছু দিন ঘুরাফেরার পর আত্মগোপন করেন। তাঁহার আর কোন সঠিক সন্ধান জানিতে পারা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, আত্মহত্যার সাহায্যে তিনি গ্রেফ্‌তার এড়ান।

বিদ্রোহী নেতৃবর্গ পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর তাঁতিয়া তোপী পারোণের জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সম্ভবতঃ সেস্থানেই গোয়ালিয়রের

বিশিষ্ট জমিদার মানসিংহের সহিত তাঁহার দেখা হয়। ইংরেজ সেনাপতি চার্লস নেপিয়ার, মেজর লিট্‌ল এবং ক্যাপ্টেন মিয়েড্‌ ভিন্ন ভিন্ন পথে তাঁতিয়া তোপীর অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা কোন এক গোপন উপায়ে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজা মানসিংহকে হাত করিতে পারিলে তাঁতিয়া তোপীকে ধরা সহজ হইবে। কাজেই মানসিংহের পরিবারবর্গ যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, ক্যাপ্টেন মিয়েড সেস্থানে লোক পাঠাইয়া তাহাদের সহিত কথাবার্তা চালাইতে থাকেন। রাজা মানসিংহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, সিন্ধিয়ার বিরোধিতা করিয়া তাঁহার বিরাট জমিদারী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহার সম্পত্তি এবং মানসম্মানের পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দান করিলে পর ১৮৫৯ সালের ২রা এপ্রিল তিনি তাহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হন।

ক্যাপ্টেন মিয়েড্‌ রাজা মানসিংহকে তাঁহার পরিজনবর্গের মারফৎ ইহা বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি যদি তাঁতিয়া তোপীকে বন্দী করিবার কার্যে সাহায্য করেন, তবে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে মাড়োয়ার রাজ্যের অপহৃত অংশও যাহাতে সিন্ধিয়া ফেরৎ দিতে বাধ্য হন তিনি সেই ব্যবস্থাও করিবেন। এই প্রলোভনের কথা মানসিংহের উপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল। তিনি তাঁতিয়া তোপীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে ক্যাপ্টেন মিয়েডের সঙ্গে মানসিংহের যে সময় আলোচনা চলিতেছিল, তখনও তাঁতিয়া তোপী নিশ্চিন্তে জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি লোক পাঠাইয়া এবং খোঁজ খবর লইয়া জানিতে পারেন, সিরঞ্জের জঙ্গলে সেই সময় প্রায় দশ হাজার বিদ্রোহী লুক্কায়িত আছে। রাও সাহেব তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন সত্য, তবে ফিরোজ, আম্বপনির নওয়াব ইমাম আলি প্রমুখ বিদ্রোহী নেতৃবর্গ তখনও তথায় অবস্থান করিতেছেন। সংবাদ বাহক উপরোক্ত বিদ্রোহী নেতৃবর্গের নিকট হইতে একখানি চিঠিও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। ইহাতে তাঁতিয়া তোপীকে পুনরায় তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে আহ্বান জানান হইয়াছিল। রাজা মানসিংহের গতিবিধি ইতিমধ্যে সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি তাঁতিয়া তোপী আশু

কর্তব্য সম্পর্কে তাঁহারই পরামর্শ চাহিয়া পাঠান। মানসিংহ পত্রোত্তরে জানান, তিনি তিন দিনের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এবং তথায় পত্রে উল্লেখিত বিষয়টিও বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

তদনুসারে নারবের বিশ্বাসঘাতক সরদার রাজা মানসিংহ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ৭ই এপ্রিল গভীর রাত্রিকালে তাঁতিয়া তোপীর লুক্কায়িত স্থানে গমন করেন। যাইবার সময় তিনি একদল দেশীয় সৈন্য লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাদেরই সাহায্যে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় তাঁতিয়া তোপীকে বন্দী করিয়া ফেলেন। অতঃপর সৈন্যদের কড়া পাহারাধীনে তাঁতিয়া তোপী ৮ই এপ্রিল বৃটিশ শিবিরে নীত হন। তথা হইতে ক্যাপ্টেন মিয়েড্ তাঁহাকে সিপ্রি লইয়া যান। সেস্থানে একটি সামরিক আদালতে তাহার বিচার হয়। মিয়েডের তদানীন্তন পদ-মর্যাদার কথা চিন্তা করিলে সত্যই মনে হয়, তাঁতিয়া তোপীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই তিনি এত তাড়াতাড়ি উক্ত সামরিক আদালত গঠন করিয়াছিলেন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন আদালতে তাঁতিয়া তোপীর বিচার হইলে তাঁহার কৃতিত্ব হ্রাস পাইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই, মিয়েড এই বে-আইনী কার্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

ক্যাপ্টেন হড্সন বন্দী শাহজাদাগণকে দিল্লীর সড়কের উপর নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া যেভাবে রাতারাতি 'বীর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, খুব সম্ভব তিনিও তাঁতিয়া তোপীকে হত্যা করিয়া সেভাবে প্রমোশন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া লইবেন মনে করিয়াছিলেন। অযোধ্যার সংগ্রামী জনগণ পাপাত্মা হড্সনকে হত্যা করিয়া তাহার পদোন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু মিয়েডের আশা ব্যর্থ যায় নাই। তিনি পুরস্কার এবং প্রমোশন উভয় লাভ করিয়াছিলেন। সিপ্রিতে ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রকাশ্যস্থানে তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়। তাঁহার প্রাণবায়ুর সহিত বিদ্রোহেরও প্রাণবায়ু শূন্যে উড়িয়া যায়। সিপ্রি তাই ভারতবর্ষের মুক্তিকামীদের একটি তীর্থক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। তখন হইতে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের নামের সাথে রজব আলি, মির্জা ইলাহী বখ্শ, রাজা জগন্নাথ এবং রাজা মানসিংহের নামও ঘৃণা ও লজ্জার সহিত উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে।

দিল্লী এবং দিল্লীর পর লক্ষ্ণৌর পতন বিদ্রোহীদের দলে ভাঙ্গন আনিয়া দিয়াছিল। বিদ্রোহী নেতৃবর্গও নিরাশ এবং হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের কেহ কেহ কোন কোন এলাকায় আরও বেশ কিছু দিন বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন। তাঁতিয়া তোপীই ছিলেন তাহাদের শেষ আশা-ভরসার স্থল, তাই তাঁহার পতনের পর কোনও স্থান হইতে বিদ্রোহীদের তৎপরতার আর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ব্যর্থতার কারণ

ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র মুক্তি-সংগ্রামে দেশপ্রেমিকগণের ব্যর্থতার অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি প্রদত্ত হইল:

যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব ছিল তাহাদের মধ্যে খুব বেশী। সত্য বটে ইংরেজ অফিসার পরিচালনাধীন অশ্বারোহী, পদাতিক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর বহু সহস্র সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়া প্রাণপণ লড়িয়াছে, অটুট মনোবল সহকারে ইংরেজদের গোলাগুলী বুক পাতিয়া লইয়াছে, পরাজয়ের পর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে কারাগারে বা আন্দামানে দেহ ক্ষয় করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের ষ্ট্রাটেজী বলিতে ইহাদের বিশেষ কিছু জানা ছিল না। নিছক সংখ্যাধিক্যের জোরে ইহারা যে সকল খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহাতেও একারণেই ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় ইহাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। দেশপ্রেম, সম্মুখ-সমরে শত্রুকে পরাস্ত করার উদগ্র বাসনা এবং বিলম্বে অধৈর্য ইহাদিগকে গেরিলা যুদ্ধনীতি গ্রহণে নিরুৎসাহ না করিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সংগ্রামের অবসান ঘটিত না।

প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব পরাজয়ের আর একটি কারণ। অস্ত্রাগার এবং কারখানাগুলি ছিল ইংরেজ সৈন্যদের হাতে। বিদ্রোহের সূচনায় ইহাদের অনেকগুলি তাহারা নষ্ট করিয়া দিয়া বিদ্রোহীদের অস্ত্রপ্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যরা বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের বাহির হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র নির্মাণের কোন

কারখানা তো ছিলই না, তদুপরি তাহাদের অস্ত্র-সাহায্যের আবেদনে আফগানিস্তান, পারস্য, তুরস্ক ও রাশিয়া কোন সাড়াই দেয় নাই। অস্ত্রশস্ত্রের ভয়ানক অভাব সত্ত্বেও মওলানা আহমদ উল্লাহর হত্যার পর বিদ্রোহীদের অপর কোন নেতা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা বন্দর হইয়া প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রবাহী কনভয়গুলি আক্রমণের কোন চেষ্টা অথবা অস্ত্র নির্মাণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

একটি মাত্র খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ের পর আজিম উল্লাহ, তাঁতিয়া তোপী, জওলা প্রসাদ, শাম্‌সউদ্দীন, টিকা সিংহ প্রমুখ বিদ্রোহের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের পরামর্শের ব্যতিক্রমে নানা সাহেব প্রথমে বিঠুর, তৎপর বিঠুর হইতে অযোধ্যায় এবং সর্বশেষে অযোধ্যা হইতে পলায়ন না করিলে সম্ভবতঃ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মহারাট্টারা তাঁহাকে পেশওয়া হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইত। মহারাট্টাদের নিকট তখনও পেশওয়া উপাধির একটা আকর্ষণ ছিল। নানা সাহেবের আকস্মিক অন্তর্ধানের জন্যই সম্ভবতঃ মহারাট্টা জনসাধারণের বেশীর ভাগ এবং তাহাদের কোন সামন্ত রাজাই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই।

ঐতিহাসিকগণ বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মসমর্পণকে বিদ্রোহীদের বিপর্যয়ের সর্বপ্রধান কারণ বলিয়া দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাহাদুর শাহ ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। তাঁহার আত্মসমর্পণের পর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে। সেনাপতি বখ্‌ত খানের পরামর্শ অনুসারে দিল্লীর পতনের পর তিনি যদি অযোধ্যা গমন করিতেন, তাহা হইলে বিদ্রোহী সিপাহী ও সংগ্রামী জনসাধারণ মনোবল হারাইয়া ফেলিত না এবং তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহারা নূতন শক্তি সঞ্চয় করিতে এবং দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে পারিত। সামরিক বিভাগের দ্বিতীয় উচ্চপদে অনভিজ্ঞ এবং অকর্মণ্য মির্জা মোগলের নিয়োগ দিল্লীতে বিদ্রোহী বাহিনীর পরাজয়ের অন্য একটি কারণ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান এবং পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের সহযোগিতা এবং নেপালের গুর্খা সৈন্যদের নিষ্ক্রিয়তা ও নিরপেক্ষতার উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করা বিদ্রোহীদের পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ

হইয়াছিল। শিখ ও ভাড়াটে গুর্খা সৈন্যরাই ইংরেজদিগকে যুদ্ধজয়ে সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছে। অপরপক্ষে সীমান্তের পাঠানরা ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের সুদৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করিয়া বিদ্রোহীদের দলপুষ্টির জন্য আগাইয়া আসিতে পারে নাই। পাঞ্জাবের বিভিন্ন সেনানিবাস ও ছাউনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এবং বহু বিদ্রোহীকে তোপের মুখে এবং ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণও দিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিখদের সাহায্যে ইংরেজেরা অপেক্ষাকৃত সহজে এসকল বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। প্রতিবেশী শিখদের ন্যায় সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা না করিলেও পাঞ্জাবের মুসলমানদের নিকট হইতে বিদ্রোহীরা কোন প্রকার সাহায্য পায় নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ছয় শত সামন্ত রাজ্য ছিল। ইংরেজ সরকারের ঔদ্ধত্যে এবং নানা দাবীর চাপে সামন্ত রাজগণ উত্যক্ত ও বিরক্ত ছিলেন। বিদ্রোহীরা ইঁহাদের নিকট হইতে সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতা লাভের আশা করিয়াছিল। তাহাদের সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। কারণ, সামন্ত রাজগণ বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালীগণ, ইংরেজ সরকারকে অর্থ, লোক লস্কর, এক কথায় সর্বপ্রকার সাহায্যদান করেন। ইহার ফলে সামন্ত রাজ্যের জন-সাধারণ বিদ্রোহে কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারে নাই বা করে নাই।

শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করিয়া শিক্ষিত হিন্দুগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন নাই। সরকারী চাকুরীজীবী মুসলমানগণও মোটামুটিভাবে বিদ্রোহ হইতে দূরে ছিলেন। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের মুসলমান ও হিন্দু জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহে যোগদান করে নাই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের শতবর্ষ ব্যাপী শাসনামলে এদেশে যে গুপ্তচর বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, বিদ্রোহের সময় তাহাদের সাহায্যে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের গতিবিধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব খবরই পাইতেন এবং তদনুসারে তাহাদের কার্যসূচী রচিত ও কার্যকর করা হইত। পক্ষান্তরে বিদ্রোহীরা ইংরেজ শিবিরের কোন খবরই রাখিত না। বহু ক্ষেত্রে এ কারণে ইংরেজদের অতর্কিত আক্রমণে তাহাদিগকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছে।

বিদ্রোহে যে লক্ষ লক্ষ লোক ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ যুদ্ধে তাহাদিগকে নির্বিচারে

অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের বেশীর ভাগ নিয়মিত বিদ্রোহী যোদ্ধাদের বোঝা হইয়া পড়িত, অকারণে ইংরেজ সৈন্যদের গোলাগুলীর শিকার হইত অথবা অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া গোটা বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ করিয়া দিত।

নির্বিচারে পল্লী দাহ নিরপরাধ নরনারীকে হত্যা করিয়া ইংরেজেরা জনসাধারণের মনে এমনই ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহারা বিদ্রোহীদের সাহায্যে আগাইয়া আসিত না। পক্ষান্তরে ইংরেজদের সাহায্যকারী জানিয়াও বিদ্রোহীরা তাহাদের স্বদেশ-বাসী কোন লোকের উপর অনুরূপ কোন অত্যাচার করিত না। এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ ইংরেজেরাই গ্রহণ করিয়াছে।

বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল অযোধ্যায়। বেগম হজরত মহলের ধারণা ছিল, বিদ্রোহে জয়লাভ হইলে বিদ্রোহের নায়কগণ তাঁহার পুত্র বিরজিশ কদরের স্থলে আবার তাঁহার স্বামী নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন। এ কারণে তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখিতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং অবস্থার চাপে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিতেন। ইহার ফলে একাধিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদিগকে ইংরেজদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া অসাফল্যের আরও কৈফিয়ৎ আছে। অসাফল্যের কৈফিয়ৎ হয়—সাফল্যের নয়।

বিদ্রোহের অভিশাপ

ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম এইরূপে শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল বটে, কিন্তু উহার জের চলিল একটানাভাবে আরও প্রায় এক যুগ। বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বড়লাট লর্ড ক্যানিং উক্ত দিবস এলাহাবাদে এক দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পাঠ এবং ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক শত বৎসরের

শাসনের বিলুপ্তি এবং তৎস্থলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন প্রবর্তনের কথা ঘোষিত হইলে, লঙ্কর শাহের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যতঃ সত্যে পরিণত হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই ঘোষণার মারফৎ এদেশের শাসনব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তনের আভাস দেন। তাঁহার এই ঘোষণা হইতে ভারত-বাসীরা একান্ত সঙ্গতভাবে ইহা মনে করিয়া লইয়াছিল, এত বড় হত্যাকাণ্ড এবং বর্ণনাতীত নির্যাতন ও নিপীড়নের পর বৃটিশ সরকার নিশ্চয়ই ভারত-বাসীদের প্রতি তাঁহাদের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন করিবেন। তাহাদের ইহাও বিশ্বাস ছিল, অমানুষিক নির্যাতনের ভয়ে ঝাড়-জঙ্গলে, গিরি-গহ্বরে আত্মগোপনকারীদিগকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বাভাবিক জীবন যাপনের অনুমতি অবশ্যই দেওয়া হইবে, নিহতদের বিষয় সম্পত্তি তাহাদের আত্মীয়-স্বজনরা ফেরত পাইবে এবং সন্দেহক্রমে কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ অতঃপর বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করিবেন।

ভারতবর্ষের সর্বত্র তখন শ্মশান-শান্তি বিরাজমান। মহারাষ্ট্রা-বীর তাঁতিয়া তোপী ভগ্নহৃদয়ে ঝাড়-জঙ্গলে তখনও আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। আর সুদূর বর্মায় নির্বাসিত বাহাদুর শাহ একটি ক্ষুদ্র এবং অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ভগ্নপ্রায় একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়া বেদনাদায়ক অতীতকে ভুলিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। বিশাল ভারতবর্ষের কোথাও তখন বিদ্রোহীদের কোন বিশেষ তৎপরতা ছিল না বলিলেও চলে। এই অবস্থায় বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের হৃদয় জয়ের জন্য হইলেও, তাঁহাদেরই প্রদত্ত ঘোষণার মর্যাদা অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সংগ্রামী প্রায়-নিরস্ত্র জনতার উপর সামরিক বিজয় তাঁহাদের মনোভাবের এমনই বিকৃতি ঘটাইয়া দিয়াছিল যে, বিজিতদের প্রতি সামান্য করুণা প্রদর্শনও তাঁহাদের নিকট সে সময় দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এই মনোভাব দর্শনে ভারতবাসীরা, বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজ অতিশয় ব্যথিত ও নিরাশ হইয়া পড়ে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যেই অর্ধ লক্ষাধিক নরনারী মধ্য ভারত ও নেপালের জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে, বিদ্রোহোত্তর কালে প্রথম আঘাত পড়িয়া-ছিল তাহাদেরই উপর। বিদ্রোহ, ইংরেজ হত্যা, ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার

লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে ইহারা অভিযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে ধর পাকড় আরম্ভ হইয়া যায়। বৃটিশ বশংবদ বিচারকদের আদালতে ধৃত ব্যক্তিগণের বিচার হইল। কত জনের যে ফাঁসি হইল, কত হাজার হাজার লোকের প্রতি যে স্বল্প মেয়াদী কারাবাসের আদেশ হইল তাহার হিসাব এক্ষণে পাওয়া দুষ্কর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন, শুধু তাঁহাদেরই সংখ্যা ছিল দশ হাজারের উর্ধে।

প্রথম আঘাত নির্বিচারে হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপর পতিত হইয়াছিল। কারণ, সংখ্যায় মুসলমানদের তুলনায় বিদ্রোহী হিন্দুরা কম হইলেও বিদ্রোহের সহিত বহু হিন্দু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্রোহের দুই বৎসর হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছে. মুসলমান হিন্দুর এবং হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্বে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, একে অন্যের অনুকরণে অকুণ্ঠচিত্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, ফাঁসিকাষ্ঠে এক সঙ্গে ঝুলিয়াছে, একই বন্দুকের গুলী উভয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে এবং উভয়েই মিলিতকণ্ঠে বাহাদুর শাহের নামে জয়ধ্বনি দিয়াছে। এ সম্পর্কে একটি ছোট উদাহরণস্বরূপ নসরতপুরের রাজা বেণী প্রসাদের কথা উল্লেখযোগ্য। পরাজয়ের পর বৃটিশ সেনাপতি তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান জানাইলে ভারতের এই বীর সন্তান বলিয়াছেন: "দুর্গ রক্ষায় যখন আমি অসমর্থ, তখন তাহা আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু আমার দেহের মালিক সম্রাট বাহাদুর শাহ। উহার উপর আমার কোন অধিকার এখন আর নাই।"

ভেদনীতি

হিন্দু-মুসলমানের এই প্রগাঢ় সম্প্রীতি. জীবন-মরণের প্রশ্নে এই অপূর্ব ঐক্য, উভয়ের আদর্শের মধ্যে এই সাদৃশ্য ও সমন্বয় বিদ্রোহোত্তর যুগে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে স্বভাবতঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তোলে। সুচতুর ইংরেজ এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুসৃত সেই কুখ্যাত ভেদনীতির আরও ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া দেন এবং এবারও মুসলমানকেই বলির পশু হিসাবে মনোনীত করা হয়। বিদ্রোহে উস্কানী, ইংরেজ নরনারী হত্যায় প্ররোচনা, পলাতকদের আশ্রয় এবং আর্থিক সাহায্য দান,

বিদ্রোহীদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি ও সংবাদ গোপন প্রভৃতি নানা কাল্পনিক অভিযোগে হাজার হাজার মুসলমান তাহাদের জোত-জমি, তালুকদারী, জমিদারী, নগদ টাকা-পয়সা বৃটিশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। সদাশয় সরকার ইহার সমস্ত নিজেরা হজম না করিয়া কিছু কিছু হিন্দুদের মধ্যেও বিলি-বণ্টন করিয়া দিয়া নূতন আর একটি রাজভক্তের দল সৃষ্টির প্রয়াস পান। এই ভেদনীতির ব্যাপক ও সার্থক প্রয়োগের দরুন এক শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী মুসলমানদের ন্যায় উত্তর ভারতের মুসলমানদেরও এক বিরাট অংশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুরে পরিণত হয়।

হিন্দুদেরই প্ররোচনায় ভেদনীতি চালু করা হইয়াছিল, তাহা নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ছিলেন ইহার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক। কিন্তু যেহেতু ইহার ষোল আনা সুযোগই দেওয়া হইয়াছিল হিন্দুদিগকে এবং হিন্দুরাও সেই সুযোগ গ্রহণে কোনরূপ আপত্তি করে নাই, এজন্য মুসলমানদের বিদ্বেষ গিয়া পড়ে সর্বাগ্রে তাহাদেরই উপর। হিন্দুরাও নানাভাবে ইহার জওয়াব দিতে থাকে। এরূপে পরস্পরের মধ্যে এমন ছাড়াছাড়ি হইয়া যায় যে, আর কখনও তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে অথবা জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী এবং মওলানা মোহাম্মদ আলির আপ্রাণ চেষ্টায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এক্ষেত্রেও বৃটিশের ভেদনীতি কার্যকর ছিল।

মুসলমানরা প্রথম হইতেই এদেশে ইংরেজ শাসনকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করে নাই। কোন স্বাধীন জাতিই রাতারাতি অধীনতাকে বরণ করিয়া লইতে পারে না। ইংরেজেরা যে শুধু বিদেশী ছিল তাহা নয়, তাহারা বিধর্মীও ছিল। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের বাহিরেও নানাস্থানে খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল এবং ইংরেজেরা তৎপূর্বেও কোন কোন মুসলিম রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন সুতরাং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। ইংরেজেরা যদি প্রথম হইতে

মুসলিম-বিরোধী নীতি অবলম্বন না করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুদের ন্যায় এত তাড়াতাড়ি না হইলেও, মুসলমানরা কালক্রমে বিদেশীয় শাসন মানিয়া লইত। কেননা, অবস্থার প্রভাব মানুষ এড়াইয়া চলিতে পারে না।

কিন্তু ইংরেজেরা গোড়ায় যেই ভুল করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে উহার তো কোন সংশোধন করেন নাই, উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর আর এক দফা মুসলমানদের উপর জোর-জুলুম শুরু করিয়া দেন। শক্তি পরীক্ষায় মুসলমানকে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং সেদিক দিয়া তাহাদের জন্য করণীয় আর কিছু ছিল না। তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগের পথে আহ্বান করেন। এ পথেও মুসলমানরা হিন্দুদিগকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজদের অধীনে চাকুরী তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি, সর্বোপরি মুসলমানদের নিকট হইতে অপহৃত তালুকদারী, জমিদারী ইত্যাদি প্রাপ্তির দরুন হিন্দু নেতৃবর্গ উহাতে কোন সাড়া দেন নাই। এ কারণে মুসলমানদের অনুসৃত অসহযোগ নীতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বরঞ্চ ইংরেজদিগকে একঘরে করিতে গিয়া তাহারাই প্রকারান্তরে একঘরে হইয়া পড়ে।

শিক্ষার মূলে আঘাত

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুসলমানদের শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতে সর্বপ্রথম অগ্রসর হন। এ-সম্পর্কিত তাঁহাদের দুইটি নীতিই মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। মুসলমান রাজত্বের আমলে এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহাদের পশ্চাতে ছিল বেসরকারী দান ও প্রচেষ্টা। নওয়াব-বাদশাহগণের অর্থানুকুল্যেও বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু মোট সংখ্যার তুলনায় তাহা ছিল সামান্য কয়টি। শিক্ষার প্রতি তখন এ দেশের সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের একটা স্বাভাবিক টান ছিল এবং সাধ্যমত তাঁহারা শিক্ষার জন্য দান খয়রাত

করিতেন। গোটা ব্রাহ্মণ সমাজ বিদ্যা কেনা-বেচা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে তেমন কোন সামাজিক নিয়ম ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইংরেজ আমলে তাহারা যতটা মূর্খ হইয়া পড়ে, মুসলমান রাজত্বের সময় ততটা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার বিলুপ্তির জন্য তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের পথ নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তোলেন। মুসলমানদের নিকট হইতে নানা ভুয়া অজুহাতে জমিদারী, তালুকদারী, লাখেরাজ সম্পত্তি ইত্যাদি কাড়িয়া লওয়ার ফলে দেশের অসংখ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎসটি বন্ধ হইয়া যায়। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়ের টাকায় পরিচালিত হইত সে সকল সম্পত্তির বেশীর ভাগ বাজেয়াফ্‌ত হওয়ায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অপমৃত্যু ঘটে।

এই আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করিতে হইলে ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক, বাংলার শাসনভার যখন ইংরেজরা পুরাপুরিভাবে স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র প্রদেশের এক তৃতীয়াংশ জমি বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ এবং অন্যান্য সৎকার্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে এই সকল সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করিবার মতলব আঁটেন। ১৮১৯ সালে ইংরেজেরা আবার এব্যাপারে বিশেষ কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের অসন্তুষ্টি ও আন্দোলনের ভয়ে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নীরব থাকিতে বাধ্য হন। উক্ত বৎসর তাঁহারা একটি বে-আইনী আইনের সাহায্যে শিক্ষা এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও সৎকার্যের জন্য উৎসর্গীকৃত বার্ষিক ৪৫ লক্ষ টাকা আয়-বিশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করেন। পরবর্তী ১৫ বৎসরের মধ্যে অনুরূপভাবে মুসলমানদের নিকট হইতে অপহৃত সম্পত্তির মোট বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় কোটি টাকার উপর। তখন কোটি টাকার মূল্য বর্তমান মুদ্রামূল্যের প্রায় দশগুণ ছিল। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ইংরেজ বণিক কোম্পানী কিছু করা তো দূরের কথা, শিক্ষার জন্য প্রদত্ত ওয়াকফ্ সম্পত্তিগুলি বাজেয়াফ্‌ত করিয়া এইরূপে তাহাদের শিক্ষার সমস্ত সুযোগই তাঁহারা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর আর এক দফা মুসলমানদের জায়গা-জমি বাজেয়াফ্‌ত করিয়া তাঁহারা গোটা মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক জীবনও ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করিয়া দেন। ইহার ফলে তাহারা শিক্ষার দিক দিয়া হিন্দুদের তুলনায় এমনি পশ্চাতে পড়িয়া গেল, যে, বিভাগপূর্ব ভারতে আর তাহাদের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে নাই।

চাকুরী ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব

কিন্তু ইংরেজ সরকার কর্তৃক মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস সাধন ও মুসলমান সমাজ কর্তৃক অসহযোগনীতি অবলম্বন সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার কিছু কিছু প্রসার হইতে থাকে। তবে পরিতাপের বিষয় যে, শিক্ষা সমাপনের পর ইহাদের কাহারও ভাগ্যে সরকারী চাকুরী জুটিত না। অপর পক্ষে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দু যুবকগণ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে থাকেন। সামরিক বিভাগের দ্বার ইতিপূর্বেই মুসলমানদের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ডঃ উলিয়াম হাণ্টার তাঁহার একখানি বিখ্যাত গ্রন্থে ১৮৭১ সালে বাংলা দেশে হিন্দু এবং মুসলমান কর্মচারীদের যেই হিসাব দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

চাকুরীর নাম	হিন্দু	মুসলমান
অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার	... ৭	... ... ০
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেঃ কালেক্টর	... ১১৩	... ...৩০
আয়কর বিভাগ	... ৪৩	... ... ৬
রেজিস্ট্রেশন	... ২৫	... ... ২
ছোট আদালতের জজ	... ২৫	... ... ৮
মুন্‌সেফ	... ১৭৮	... ...৩৭
গেজেটেড পুলিশ অফিসার	... ৩	... ... ০
ইঞ্জিনিয়ারিং	... ১৯	... ... ০
জনকল্যাণ বিভাগ	... ১২৫	... ... ৪
একাউণ্ট্‌স	... ৫৪	... ... ০
চিকিৎসা বিভাগ	... ৬৫	... ... ৪
জনশিক্ষা	... ১৪	... ... ১
কাস্টম্‌স, নৌ, জরীপ	... ১০	... ... ০
	মোট হিন্দু ৬৮১	মোট মুসলমান ৯২

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও চাকুরীক্ষেত্রে মুসলমানদের এই শোচনীয় অবস্থা ছিল না। তখন সব রকমের চাকুরীতে মুসলমানদেরই প্রাধান্য ছিল। মাত্র ৮০ বৎসরের মধ্যে কিরূপে এবং কেন ইংরেজেরা এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিত আভাস উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। ডঃ উইলিয়াম হাণ্টার ১৮৯৬ সালে সরকারী কার্যে নিযুক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান বিদ্যা-বুদ্ধি-জীবিদের যেই হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়ঃ

চাকুরীর নাম	হিন্দু		মুসলমান
হাইকোর্টের জজ	২	...	... ০
'ল' অফিসার	২	...	... ০
ব্যারিস্টার	৩	...	... ০
উচ্চপদস্থ কর্মচারী	৭	...	... ০
উকিল	২৩৯	...	... ১
এটর্নি, সলিসিটর	২০	...	... ০
আর্টিকেল্ড ক্লার্ক	২৬	...	... ০
এম. বি. ডাক্তার	১০	...	... ০
এল. এম. এফ. (ডাক্তার)	৯৮	...	... ১

স্মরণ থাকে যে, চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা হইতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যার হার নির্ণীত হয় না। কারণ শিক্ষিত লোকের সকলেই যে সরকারী চাকুরী পান অথবা করিবেন, এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকে না। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির মুসলিম-বিরোধী নীতির ফলে কলিকাতার মুসলমানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের কত পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল, নিম্নের হিসাবে তাহা দেখান যাইতেছেঃ

	(১৮৮১)		(১৮৯১)
শিক্ষিত হিন্দু পুরুষ	... ৩৬·৯%	...	৩৯%
হিন্দু নারী	... ৬·৮%	...	৭·৩%
মুসলমান পুরুষ	...১৪·২%	...	১৬·৭%
মুসলমান নারী	... ১%	...	১·৫%

মিথ্যা প্রচারণা

কেহ কেহ বলিতে চান, ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমানেরা সেভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহাদের গোঁড়ামি এবং রক্ষণশীলতার জন্য। ইহা সত্য নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরেজবিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা ও গর্ব নিশ্চয়ই ছিল এবং এজন্যই হয়ত তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করিতেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরই হাত হইতে এদেশের শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের প্রতি ইংরেজদেরও সন্দেহ ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, সুযোগ পাইলেই মুসলমানেরা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। প্রধানতঃ একারণে শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানকে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া "আমাদের ভারতীয় শাসন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শাসন করা", ১৮২১ সালে এশিয়াটিক জার্ণালে প্রকাশিত জনৈক খ্যাতনামা ইংরেজের এই উক্তির সার্থকতার জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলমানদের ক্ষতি করিয়া ইংরেজরা হিন্দুদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। স্বনামধন্য ডেভিড হেয়ার প্রমুখ বেসরকারী ইংরেজগণ এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু চেষ্টা এবং সাধনা করিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় উদারপ্রাণ ব্যক্তিগণের নিকট হইতেও মুসলমানেরা কোন সাহায্য বা উৎসাহ পায় নাই।

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে জনমত গড়িয়া উঠিতে দেওয়া হইত না। এমন কি শাসন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা পর্যন্ত বে-আইনী কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই অবস্থায় গায়ের চামড়া বাঁচাইয়া এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে ভাসাভাসাভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নে কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত হইল:

১৮৬৮ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেন: "বাংলার মুসলমানেরা যদি ইংরাজী শিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতির ধারা

পরিবর্তিত হইয়া যাইত এবং ভারতের বর্তমান শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধেও জনমত সজাগ হইয়া উঠিত।''

রেভারেণ্ড জে. লঙ্ (১৮৬৯) বলেন: ''অসংখ্য প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে এবং শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বোঝা যায়, এদেশে মুসলমানেরা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে। এক সময় যাঁহারা একটি বিশাল রাজ্য শাসন করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ অতি কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছে। বর্তমানে বাংলা দেশের কোন সরকারী অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী পরিদৃষ্ট হয় না। অথচ মুসলমান দফ্‌তরী এবং পিয়নে সব অফিস পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।''

বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার বলেন: ''ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় হইতে এদেশের মুসলমান ভদ্রশ্রেণী নানাভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও সামাজিক সম্মান লাভে তাহারা শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই অনগ্রসরতার রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিবে।''

জনাব সৈয়দ আমির হোসেন (১৮৮০) বলেন: ''ক্রমবর্ধমান মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতার মুসলমান মহল্লায় একটি কলেজ (বি. এ. ডিগ্রী পর্যন্ত) স্থাপন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সী কলেজ সরকারী প্রতিষ্ঠান বটে, তবে উহা হিন্দু মহল্লায় অবস্থিত এবং মুসলমান মহল্লা হইতে এত দূরে যে, ছাত্রদের যাতায়াত খরচ বাবদ মাসে প্রায় কুড়ি টাকা খরচ হয়।''

স্টেট্‌সম্যান (১৪ই আগস্ট, ১৮৮০) বলেন: ''মুসলমানদের মধ্যে এক সময় যে গোঁড়ামি দেখা গিয়াছিল এখন আর তাহা নাই। বর্তমানে বাংলার মুসলমানেরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। তাহারা জীবনের সবক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীর সমকক্ষ হইতে চায়। বড়লাট লর্ড মেয়ো এবং বাংলার লেঃ গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের সময় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলিতে যেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা পর্যাপ্ত বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং জনাব

আমির হোসেন মুসলমানদের পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।"

পাইওনিয়ার, (১৭ই নভেম্বর, ১৮৮০) বলেন: "ব্যক্তিগত জীবনেও মুসলমানেরা হিন্দুদের পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। জমিদারী ও সম্পত্তি মুসলমানদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। অভিজাত মুসলমান পরিবার-গুলির প্রায় সব ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এবং শহরে বহু সম্রান্ত মুসলমান পরিবার অত্যন্ত দুরবস্থার ভিতর দিয়া দিন কাটাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট অফিসার এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

স্বনামখ্যাত লেখক শ্রীবিনয় ঘোষ বলেন: "প্রথম যুগে বৃটিশ গভর্ণ-মেণ্টের নীতি মুসলমান-বিদ্বেষ এবং হিন্দু-পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, মুসলমানেরা সেরকম সুযোগ বা উৎসাহ পাননি। নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে মিথ্যা অহঙ্কার তাঁহাদের ছিল। ইংরেজেরা সেই গোঁড়ামি ও অহঙ্কারের প্রশ্রয় দিয়েছেন। মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাব প্রথম যুগে অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের নতুন জমিদারী-ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার এবং জায়গীরদারেরা ধ্বংস হয়ে গেলেন তা নয়; বাংলার যে-কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হোল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলায় এই উৎখাত নিঃস্ব প্রজাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দস্যুবৃত্তি ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কোরল।"

মুসলমানেরা ইংরেজদের শত্রু, এই ধারণা লইয়াই ইংরেজ রাজপুরুষগণ এদেশে আসিতেন। ইহার একটি প্রমাণ বড়লাট লর্ড এলেনবরা। তিনি বলিয়াছেন: "ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের একটি জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" মুসলমানদের প্রতি যেই রাজ-পুরুষগণের এই মনোভাব, তাঁহারা যে মুসলমানদের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টায় ব্রতী থাকিবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া খ্যাত ইংরেজগণও মুসলমানদের উপর অকারণে বিরক্ত ছিলেন।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

উপরে একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে, মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের এই অহেতুক বিদ্বেষভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায় তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে থাকে।

টিপু সুলতানের পতনের পর হইতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ছিটেফোটা আকারে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের নানাস্থানে এই বিক্ষোভ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তন্মধ্যে বেরেলীর এবং ভেলোরের বিদ্রোহ, প্রথম মোপলা বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, পিণ্ডারীদের যুদ্ধ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই ২৫ বৎসরকে মুসলমানদের মুক্তি-সংগ্রামের প্রস্তুতিকাল বলা যাইতে পারে। ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহে শোচনীয় পরাজয়ের পর তাহাদের প্রতিরোধশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের যাঁহারা পরিচালক ছিলেন অথবা যাঁহাদের প্রাণপণ সাধনার ফলে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দলগুলি একই পতাকাতলে সমবেত হইয়া ইংরেজদের সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনীর মোকাবিলা করিয়াছিল, বিজয়ীপক্ষ তাহাদের একজনকেও রেহাই দেয় নাই। উপযুক্ত নেতার অভাবে তাই সর্ব ভারতীয় আকারে নূতন করিয়া একটি সম্মিলিত দল গঠনের কোন চেষ্টা পর্যন্ত বহুদিন হইতে পারে নাই।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ ঘটাইয়াছিল হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য। কৌশলে ইংরেজরা হিন্দুদিগকে মুসলমানের পক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া জমিদারী, তালুকদারী, চাকুরী প্রভৃতি উৎকোচের বিনিময়ে তাহাদিগকে মুসলমানদেরই বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে থাকেন। এই কৌশল এমনই সুফল প্রদান করিল যে, মুসলমানদেরই অর্থানুকুল্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীবঙ্কিম চ্যাটার্জীর ন্যায় লোক পর্যন্ত তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা এবং অলীক গালগল্প রচনার সাহায্যে হিন্দু সমাজকে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিয়া। অজ্ঞ হিন্দু জনসাধারণের কথা না হয় বাদই দেওয়া যাক, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুরাও এই ব্রাহ্মণ-তনয়ের জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁহার নিন্দা করেন নাই। বরং দেশের প্রতি তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুসলিম

বিদ্বেষ প্রচারের জন্য পরবর্তীকালে হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে ঋষি উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার বাক্য ও কার্যের প্রতি নিজেদের আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। গুণমুগ্ধ বৃটিশ সরকারও যথাসময়ে তাঁহার পদোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অবিচলিত আস্থা জ্ঞাপন করিতে কার্পণ্য করেন নাই।

ইংরেজদের দেশী-বিদেশীয় ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সঙ্গীনের আঘাত হইতে যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এইরূপে তাঁহারা দালাল-লেখকদের কলমের খোঁচায় পঙ্গু হইয়া পড়িলেন। ঘরের বিদ্রূপ ও বাহিরের নিষ্পেষণকে তখন সমানভাবে অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানেরা কিরূপে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কোন দিন যদি সেই ইতিহাস রচিত হয়, তাহা হইলে সেই দুর্দিনের অনেক বীরত্ব কাহিনী নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে।

ওহাবী নামে অভিহিত মুজাহিদগণই যে একাকী সেদিন দেশীয় বিদেশীয়দের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহা নয়। ব্যক্তিগতভাবেও বহু লোক বুকের রক্তে অত্যাচারী বিদেশী সরকার ও তাহাদের দেশী দালালদের বিরুদ্ধে আমাদের বিরামহীন সংগ্রামের পদ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বহু পূর্বেই মুছিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট নামগুলির উদ্ধারের সম্ভাবনাও ১৯৪৭ সালে বিদায়ী ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট অনেকটা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কারণ, এই পুণ্যস্মৃতি নামগুলির সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বহু অপকীর্তি প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। তাই বড়লাট মাউণ্ট ব্যাটেনের সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বক্ষণে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় রক্ষণাগারে রক্ষিত হাজার হাজার নথিপত্র অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহাদের বহু অপকীর্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে ইহা একটি এবং প্রধান। তত্রাচ জনশ্রুতি, লোকগীতি, কাহিনী ইত্যাদির সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইলে ইহাদের অনেকের পুনরুদ্ধার সাধন সম্ভবপর এবং সেই সঙ্গে বহু নূতন নূতন তথ্যও উদঘাটিত হইতে পারে। জাতিগঠনে শুষ্ক নীতি-বাক্য অপেক্ষা দৃষ্টান্তের দাম অনেক বেশী এবং কার্যকর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সীমান্ত এলাকায় সংগ্রাম

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মৃত্যুর পর তাঁহার অনুচরগণ ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, উহার প্রাণকেন্দ্র ছিল পাটনা। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর ইঁহাদের আস্থা ছিল না। এবং অস্ত্রের মোকাবেলা শুধু অস্ত্র দ্বারাই সম্ভব, ইহাই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে সশস্ত্র দল গঠনের সম্ভাবনাকে তাঁহারা ইতিপূর্বেই নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও ব্যবহারের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া। তাই মুজাহিদ নেতৃবর্গ তখন পর্যন্ত ইংরেজ অনধিকৃত সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত সীতানা ও মুল্কায় নিজেদের ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া তথা হইতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত হন। এদিকে পাটনা কেন্দ্রের পরিচালকমণ্ডলী ধর্ম প্রচারের নামে উত্তর ও মধ্য ভারতে এবং উত্তর বাংলায় দলে দলে প্রচারক প্রেরণ করিয়া মুসলমানদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে থাকেন। দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে তখনও কিছু সংখ্যক মুসলমান ছিল। প্রচারকগণ ইহাদের মধ্যেও বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া বেড়াইতে থাকেন। পরিণামে মুজাহিদগণের সহিত যোগাযোগের অভিযোগে ১৮৫৩ সালে বহু সিপাহী বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, উহার সদস্যগণের মতে ওহাবী অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মতানুসারীগণের প্রচার কার্যই ছিল ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। ফয়জাবাদের মওলানা আহমদ উল্লাহ্‌কে বিদ্রোহীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করতঃ ইহাও বলিয়াছেন, তিনি ওহাবী আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের মতে ইংরেজেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহের রাজ্য দখল এবং এনফিল্ড বন্দুকের প্রচলন না করিলেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইত।

উত্তেজিত সৈন্যদল ধীরস্থিরভাবে কার্য করিলে বিদ্রোহে তাহাদের পরাজয় ঘটিত না, ইহাও বহু ইংরেজ স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি তাহারা যদি অন্ততঃ ২৩শে জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে সৈয়দ আহমদের মতানুসারিগণ তাহাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা কার্যকর করিয়া তোলার সময় পাইতেন। কিন্তু বিদ্রোহ এমন অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে যে, সীতানা ও মুল্কার পরিচালকমণ্ডলী যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত করিবার পূর্বেই ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক দিল্লী পুনরধিকৃত হয়। তদুপরি পাঞ্জাব অধিকারের পর হইতে ইংরেজেরা সীমান্তে অবস্থিত এই স্থানটির উপর কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তাঁহারা পাঞ্জাবের পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এমন সুরক্ষিত করিয়া ফেলেন যে, সীতানা ও মুল্কার মুজাহিদগণ বহু চেষ্টার পরও পরপারের উপজাতীয় সরদারদের এবং এপারের শিখ ও ইংরেজ সৈন্যদের বিরোধিতার মুখে উহা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন। একারণে সীমান্ত প্রদেশে অবস্থানকারী মুজাহিদগণ ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে পারেন নাই।

দিল্লী চলো

এদিকে উত্তর ভারত, বিহার ও উত্তর বাংলার মুজাহিদগণ বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। 'দিল্লী চলো' এই শ্লোগানটি তখনই সর্ব প্রথম তোলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনী ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছিল। দিল্লীর পথে ইহাদের বেশীর ভাগ অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডে থাকিয়া যান। এই দুই প্রদেশে সে সময় সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারাই ইতিহাসে 'গাজী' নামে খ্যাত। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইঁহারাই উত্তর প্রদেশ হইতে বৃটিশ বিতাড়নের কার্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ের দিনে যেমন ইঁহারা ছিলেন সংগ্রাম-রত দেশপ্রেমিকগণের পুরোভাগে, ভাগ্য বিপর্যয়ের সময়ও ইঁহারা ছিলেন তেমনি হতাহতদের তালিকার শীর্ষদেশে। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের বিভিন্ন যুদ্ধে প্রায় ১২ হাজার 'গাজী' মৃত্যুবরণ করেন। দিল্লীতে বৃটিশ সৈন্যের প্রবেশ এবং বিদ্রোহীদের মূল বাহিনীর শহর পরিত্যাগের পর যাহারা রাজধানীর প্রত্যেকটি ইঞ্চি

পরিমিত স্থানের জন্য অকাতরে বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাদেরও পুরোভাগে ছিল এই গাজীদের একটি দল। ব্যক্তিগত সাহস ও শৌর্যবীর্যের জন্য ইঁহারা ইংরেজ সেনাপতিগণেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্যরা 'গাজী' দলকে এমনই ভয় করিত যে, যদি কোন রকমে কোথাও গাজীদের অবস্থানের কথা তাহারা জানিতে পারিত, গাজীরা সংখ্যায় যত অল্পই হোক না কেন, তাহাদের মোকাবিলা করিতে তাহারা সহজে রাজী হইত না। ইহলোকে অমরত্ব এবং পরলোকে চিরশান্তি লাভের প্রশ্ন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহাদের সম্মুখে বড় হইয়া দেখা না দিত, তবে শেষ পর্যন্ত কি হইত তাহা বলা শক্ত। কিন্তু বিদ্রোহকে যে ইঁহারা আরও বহুদিন জীয়াইয়া রাখিতে পারিতেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে পঞ্চদশ সহস্রাধিক গাজী যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, ইংরেজেরা তাহাদের লাশই শুধু গণনা করিয়াছেন, জীবন্ত অবস্থায় একজনকেও বন্দী করিতে পারেন নাই। বিপ্লবীদের ধর্মে আত্মসমর্পণের বিধান থাকে অনুপস্থিত এবং তাহারা এই নীতিতে অটল থাকিতেন।

যুদ্ধকালে গাজী বাহিনীর জন্য যে সকল নূতন লোক সংগৃহীত হইয়াছিল, যুদ্ধের গতি দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহারা আঁকাবাঁকা পথে পাটনা ও অন্যান্য কেন্দ্র হইতে সীতানা অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সীতানা পৌঁছার পূর্বেই কার্যতঃ বিদ্রোহের অবসান ঘটে। সদা আত্মকলহে রত উপজাতি সরদারগণেরও অনেকে মুজাহিদগণকে ভাল চোখে দেখিতেন না। এ-কারণে তাহাদিগকে অনুরূপ সতর্কতার সহিত সেখানেও চলাফেরা করিতে হইয়াছিল। সামান্য রকমের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত সীতানায় তাহাদের আর কোন কাজ ছিল না। অলসভাবে তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তাই অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন কি, কেহ কেহ রওয়ানাও হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় পাঞ্জাবের পশ্চিম সীমান্তে রণ-দামামা বাজিয়া উঠে। সীতানার সতর্ক পরিচালকমণ্ডলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র উপজাতি এলাকায় ইংরেজদের সম্ভাব্য অভিযানের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গমনোদ্যত এবং

প্রশিক্ষণাধীন মুজাহিদগণের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইয়া যায়।

অন্যত্র বলা হইয়াছে, ১৮৫৭—৫৯ সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সীতানা কেন্দ্রের মুজাহিদগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহের শেষের দিকে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সে সময় প্রবল মতানৈক্য চলিতে থাকায় তাহাদের সহায়তার সম্ভাবনা অতি সামান্য মনে করিয়া বৃটিশের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হইতে মুজাহিদ নেতৃবর্গ বিচক্ষণতার সহিত বিরত থাকেন। ইংরেজরা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায়, সে সময় সীমান্তে শুধু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর তাঁহারা মুজাহিদগণের ঔদ্ধত্যের শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর হন। এই ব্যাপারে সাহায্যের বিনিময়ে তাঁহারা কোন কোন উপজাতিকে গোপনে প্রচুর উৎকোচও প্রদান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উপজাতীয় এলাকার পরিস্থিতিও তখন ইংরেজদেরই অনুকূল ছিল। উপজাতীয় মালিকগণের কেহ কেহ সীতানা কর্তৃপক্ষের উপর সাতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কারণ, মুজাহিদগণের ভরণপোষণ এবং ভাবী যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য তাঁহাদের উপর যে কর ধার্য করা হইয়াছিল, সীতানা কর্তৃপক্ষ তাহা কড়াকড়িভাবে আদায় করিয়া লইতেন।

সীতানায় হামলা

উপজাতিদের নিকট হইতে গোপনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া বৃটিশ সেনাপতি স্যার সিড্‌নী কটন পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্য লইয়া অকস্মাৎ সীতানা এলাকায় প্রবেশ করেন। ব্যক্তিগত সাহস এবং পার্বত্য এলাকা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্যার সিড্‌নী কটনের বেশ খ্যাতি ছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার পরিচালনাধীন সৈন্যরা যে শুধু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিল এমন নয়, ভারতে বিদ্রোহ দমনে ব্যবহৃত আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনায়ও তাহারা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। তদুপরি ইহাদের সাহায্যের জন্য পাঞ্জাব সীমান্তে আরও দুই সহস্র ইংরেজ সৈন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যরা সীতানা কেন্দ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল. উপজাতিদের দুইটি

দুর্গ কামানের গোলায় উড়াইয়া দিয়া একেবারে সীতানায় গিয়া উপস্থিত হয়। মুজাহিদগণ তৎপূর্বেই সীতানা হইতে পশ্চাদপসরণ পূর্বক মহাবন পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করায়, স্যার সিড্‌নী কটন অনায়াসে তাহাদের ঘাঁটিটি দখল করিতে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, স্যার সিড্‌নী কটন যে বিরাট আশা লইয়া সীতানা অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন. মুজাহিদগণ সুশৃঙ্খলার সহিত মহাবন পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁহার সেই আশা অপূর্ণ থাকিয়া যায়—মুজাহিদগণের কার্যতঃ কোন ক্ষতি সাধনই তিনি করিতে পারিলেন না। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে স্যার সিড্‌নী কটন সীতানা গ্রামটি তাঁহাদের সাহায্যকারী উৎমনজাই উপজাতিকে উপহার-স্বরূপ দান করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই মুজাহিদগণ আবার তাহাদের পূর্বক্ষমতার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ১৮৬১ সালে তাহারা মুল্কা হইতে অগ্রসর হইয়া সীতানার অদূরে অবস্থিত শিঁরী নামক স্থানে একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া নিজেদের সুরক্ষিত করেন। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে যে সকল উপজাতি স্যার সিড্‌নী কটনের নিকট হইতে এই প্রতি-শ্রুতিতে মোটা রকমের অর্থ আদায় করিয়া লইয়াছিল যে, তাহাদের স্ব স্ব এলাকার ভিতর দিয়া তাহারা মুজাহিদগণকে যাইতে দিবে না, তাহারাই এবার সর্বাগ্রে তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয়। শিঁরী ঘাঁটি হইতে মুজাহিদগণ অতঃপর বৃটিশ এলাকার উপর চড়াও করিতে থাকেন। উত্তর ভারতে মুসলমানদের উপর ইংরেজদের যে কোন জোর-জুলুমের সংবাদ পাটনা কেন্দ্র হইতে প্রেরিত লোকের মুখে সীতানায় পৌঁছা মাত্রই পালা-ক্রমে এক একটি দল ইংরেজ অধিকৃত এলাকায় হামলা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস পাইত।

১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহাদের একটি দল রাওয়ালপিণ্ডি শহর চড়াও করিয়া স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঘাঁটির অতি নিকটে সরকারের বহু ক্ষতি সাধনপূর্বক নিরাপদে নিজেদের এলাকায় প্রত্যা-বর্তন করে। এই উপলক্ষে তাহারা শহরের অধিবাসীদের নিকট হইতেও প্রচুর অর্থ আদায় করিয়াছিল। মাত্র তিন সপ্তাহ পর মুজাহিদগণের অপর একটি দল অন্য একটি জনবহুল এলাকায় হানা দিয়া তিন জন ব্যবসায়ীকে

ধরিয়া লইয়া যায়। সেই বৎসর এপ্রিল মাসে আবার তাহারা কয়েকজন বৃটিশ প্রজাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করে। প্রত্যেক বারই প্রত্যাবর্তনের পথে ইংরেজ সরকারের যাহা কিছু তাহারা সম্মুখে পাইত, বহনযোগ্য হইলেই তাহা সঙ্গে লইয়া যাইত, নচেৎ সেখানেই তাহারা উহা ধ্বংস করিয়া দিত।

ইংরেজেরাও নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। মুজাহিদগণকে হাতের কাছে না পাইয়া তাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকার নিরপরাধ অধিবাসীদের উপর। একের অপরাধের জন্ম গোটা এলাকার জনসাধারণের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্দুক ও গবাদি পশু আদায় করিয়া লওয়ার কুপ্রথা ইংরেজেরা সীমান্ত এলাকায় তাঁহাদের শাসনকালের শেষ দিন পর্যন্ত চালু রাখিয়াছিলেন। গিরি-গহ্বরে অবস্থিত কামারশালায় তৈরী বন্দুক এবং ছাগল-ভেড়া উপজাতিদের প্রধান সম্পদ ছিল এবং জরিমানাও ধার্য হইত এই দুইটির উপর।

ভারতবর্ষে ব্যাপক ধরপাকড়, অত্যাচার-নিপীড়ন এবং উপজাতি এলাকায় তাঁহাদের সশস্ত্র অভিযান সত্ত্বেও বাংলা হইতে এ সময় দলে দলে লোক সীমান্ত প্রদেশ অভিমুখে যাইতে থাকে। ১৮৬২ সালে তথায় বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ বিদ্বেষী বাঙ্গালী মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় তথায় উপস্থিতি সম্পর্কে পাঞ্জাব এবং ভারত সরকারের মধ্যে অতি গোপনে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতির বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত উপজাতি এলাকা তড়িৎ আক্রমণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। তদনুসারে প্রায় দশ সহস্র সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যের একটি বাহিনী ১৮৬৩ সালের ১৮ই অক্টোবর সেনাপতি স্যার নেভিলি চেম্বারলেনের পরিচালনাধীনে সীতানা অভিমুখে যাত্রা করে। চারি সহস্রাধিক খচ্চরের পিঠে ইহাদের জন্ম রসদপত্র ও গোলাবারুদ পাঠান হয়। আম্ব উপত্যকায় ইংরেজ বাহিনী তাহাদের সরবরাহ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে।

জেহাদ ঘোষণা

ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণাত্মক উদ্যোগের সংবাদ পাইয়া ২৩শে অক্টোবর উপজাতিরা তাহাদের সৈন্যসামন্ত সমাবেশ করিতে আরম্ভ করে। অমীমাংসিত প্রথম সংঘর্ষের পরই সোয়াতের (সোয়াদ) শেখ আবদুল গফফার শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেন। এদিকে উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধের বিরাট আয়োজনের সংবাদ পাইয়া স্যার নেভিলি চেম্বারলেন ইতিমধ্যে আরও সৈন্য এবং যুদ্ধাস্ত্রের জন্য লাহোরে ঘন ঘন টেলিগ্রাম পাঠাইতে থাকেন। ইহার ফলে পাঞ্জাবের যেস্থানে যত সৈন্য ছিল, তাঁহার অনুরোধে তৎক্ষণাৎ তাহা সীমান্তে প্রেরিত হয়।

অতঃপর সংঘটিত প্রথম খণ্ডযুদ্ধে উভয় পক্ষে বিস্তর লোক হতাহত হয়। সন্ধ্যা নামিয়া আসিলে মুজাহিদ বাহিনী তাহাদের সহকর্মীদের মৃতদেহগুলি সমাধিস্থ করিবার জন্য রণে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হয়। এই বিরতির সুযোগে হতাবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যরা প্রাণ লইয়া ঘাঁটিতে ফিরিয়া যায়।

ইংরেজ বাহিনীতে ইতিমধ্যে নূতন নূতন সৈন্যদলের আমদানী সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার না করিয়া পশ্চাদপসরণেরও কোন উপায় ছিল না। কাজেই ভারত সরকার ৪২০০ উট এবং দুই হাজারের অধিক খচ্চর বোঝাই গোলাবারুদ ও রসদপত্র পুনরায় সীমান্ত অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তথাপি পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় ভারতের প্রধান সেনাপতি নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় যুদ্ধের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যে অভিযান ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া সরকার ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন, ১৪ই নভেম্বর দেখা যায়, কার্যতঃ তাহা সবেমাত্র শুরু হইতে চলিয়াছে। ইহার মাত্র চারি দিন পর মুজাহিদগণের একটি ক্ষুদ্র দল অকস্মাৎ ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে অফিসার সহ তাহাদের প্রায় দুই শত জনকে হত্যা করে। পর দিবস অনুরূপভাবে ১২৮ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত হয়। সেনাপতি চেম্বারলেনও স্বয়ং সেদিন সাংঘাতিকভাবে আহত হন এবং অতি অল্পের জন্য তাঁহার জীবন রক্ষা পান।

এ সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইতে সরকার এমনই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা সেনাপতি চেম্বারলেনকে প্রয়োজন হইলে সসৈন্যে নিজেদের এলাকায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়া রাখেন। কিন্তু আত্মসম্মান হানির আশঙ্কায় চেম্বারলেন পশ্চাদপসরণে রাজী হন না। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে বহু নূতন সৈন্য চেম্বারলেনের বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করে। ইতিমধ্যে মুজাহিদগণও তাহাদের দলের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন। বাজৌরের সরদার ফয়েজ খান তিন হাজার, কুঁহারের হাজি সাহেব পাঁচ শত, দীরের সরদার ছয় হাজার এবং আরও অনেকে কিছু কিছু লোক-লস্কর লইয়া আসিয়াছিলেন।

উৎকোচের আশ্রয় গ্রহণ

অস্ত্রের সাহায্যে উপজাতীয় এলাকায় মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে সাফল্য-লাভের শেষ সম্ভাবনাটুকুও তিরোহিত হইতেছে দেখিয়া বৃটিশ সরকার আবার ছল-চাতুরী ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা এই নীতির কার্যকারিতা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। উপজাতীয় এলাকা বলিয়া নয়, ভারতবাসীদের এই চারিত্রিক দুর্বলতার সন্ধান তাঁহা-দের জানা ছিল। নভেম্বরের শেষের দিকে পেশোয়ারের কমিশনার কতিপয় উপজাতির নেতৃবর্গকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিয়া মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গনের সূচনা করেন। ইহার পর তিনি দুই সহস্র লোকের একটি সশস্ত্র দলকে অনুরূপভাবে বশীভূত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তনে সম্মত করান। দলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া ছোট খাটো দলপতিগণ আপন আপন অনুচরগণসহ সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। বৃটিশ সরকার ইহাদের কাহাকেও তাঁহাদের বদান্যতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

বোনার উপজাতি মোটা রকমের অর্থ প্রাপ্তির লালসায় তাড়াতাড়ি পেশোয়ারের কমিশনারের ফাঁদে পা বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু লেন-দেনের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ইংরেজ বাহিনী হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্বক তাহাদের বহু লোককে হতাহত করে। তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সময় না দিয়া পর দিবস ইংরেজ সৈন্যরা আম্ব উপত্যকা আক্রমণ করিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার

করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংরেজরা সকল উপজাতিকে যে অর্থের সাহায্যে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নয়। কিন্তু দুর্নীতির কথা ছড়াইয়া পড়ায় উপজাতিদের একের প্রতি অপরের গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। বাজোর এবং দীরের লোক-লস্করেরা উৎকোচ গ্রহণ না করিয়াই তাই রণে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব এলাকায় ফিরিয়া যায়।

এতকাল যাহা তাঁহাদের কল্পনার বাহিরে ছিল, এক্ষণে রৌপ্য-চাক্তির মহিমায় তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ঘুষের লোভে বোনার উপজাতীয় সরদারগণ মুজাহিদ-গণকে আক্রমণের জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাত্র সপ্তাহকালের মধ্যে বোনার উপজাতীয় লোকজন কর্তৃক পরিচালিত একদল ইংরেজ সৈন্য মুল্কায় উপনীত হইয়া উপনিবেশটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া দেয়। মুল্কার যুদ্ধে বহু বাঙ্গালী মুজাহিদ অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রায় অর্ধেক লোক এ যুদ্ধে নিহত হয়। ইংরেজদেরও এ যুদ্ধে নেহাৎ কম ক্ষতি হয় না। তাঁহাদের পক্ষে শুধু নিহতদের সংখ্যাই দাঁড়াইয়াছিল হাজারের উপর। তাহা ছাড়া রোগে এবং অন্যান্য কারণেও বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

কিঞ্চিদধিক দুই মাস পর, ১৮৬৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ইংরেজ অভিযাত্রী বাহিনী যখন উপজাতীয় এলাকা ত্যাগ করে, তখন তাহারা এই ধারণা লইয়া আসিয়াছিল, মুজাহিদগণকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করিতে না পারিলেও তাহারা তাহাদিগকে এত হীনবল করিয়া রাখিয়া যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে তাহারা কখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই ধারণা যে কত অমূলক, মাত্র চারি বৎসর পর মুজাহিদগণ তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম

পাটনার মুজাহিদগণের কার্যাবলী প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনীতির শুধু ব্যতিক্রমই নয়, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর একটি ব্যাপারও বটে। বস্তুতঃ যতই সেসম্বন্ধে চিন্তা করা যায়, ততই তাহা যেন দুর্বোধ্য হইয়া

উঠে। বড় রকমের দূরে থাক, উল্লেখযোগ্য একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেও ভারতের মুসলমানেরা তাহাদের বুদ্ধি, অধ্যবসায় অথবা চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে নাই। সিংহাসন লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে, একে অন্যের বিরুদ্ধে গোপনে লোক সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছে, এক পক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শেষ মুহূর্তে অপর পক্ষে যোগদান করিয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবল পক্ষের পরাজয় ঘটাইয়াছেন, এমন নজীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুর্লভ নয়। কিন্তু যেই ষড়যন্ত্রের কথা বলা হইতেছে তাহা এ ধরনের ছিল না। পৃথিবীর তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির উচ্ছেদ সাধনের জন্য সহায়-সম্বলহীন এক দল লোক বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া অর্ধলক্ষাধিক লোকের একটি সশস্ত্র বিপ্লব-বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে, যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য দরিদ্র সমাজের নিকট হইতে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছে, অর্থ ও লোক সংগ্রহের স্থান হইতে দুই হাজার মাইল দূরে ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া তথা হইতে শত্রুপক্ষকে কখন ঘায়েল করিয়াছে আবার কখন বা নিজেদের লোকজনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, পরাজয়ের পর আবার অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে শূন্যস্থানে নূতন নূতন লোক আমদানী করিয়াছে, এমন নজীর অন্ততঃ এই দেশের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই দুষ্কর।

এই ষড়যন্ত্রের গোড়ায় ছিলেন যাঁহারা এবং যাঁহারা উহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় ঠিক করিয়া দিতেন, তাঁহারা কুটনীতিবিদ বা নওয়াব বাদশাহগণের সভাসদ অথবা যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন নিজেদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন আলেম আর যাহারা ইঁহাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য, এই সোনার ভারতবর্ষকে বিদেশীয়দের কবলমুক্ত করিবার মহান উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বসুখ বিসর্জন দিয়া মহাবন পর্বতের পাদদেশে অকাতরে বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বেশীর ভাগই ছিল বাঙ্গালী ও বিহারী। বৈদিক যুগে হিন্দু মুনি ঋষিদের তপস্যাক্ষেত্র মহাবন পর্বতের প্রত্যেকটি ধূলিকণার সহিত এইরূপে ইহাদের রক্তের মিলন ঘটায় ইহা আজ আমাদেরও নিকট এত পবিত্র এবং এত শ্রদ্ধার বস্তু।

অন্যত্র বলা হইয়াছে, পরাধীন ভারতবাসীর কোটি কোটি টাকার অপচয় এবং প্রায় দুই সহস্র ইংরেজ ও এতদ্দেশীয় সৈন্য বলি দিয়া উপজাতীয় এলাকায় অবস্থিত মুজাহিদগণের ঘাঁটিগুলির ধ্বংস সাধন করিয়া ১৮৬৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ধর্মপরায়ণ ইংরেজ সৈন্যরা যিশু খ্রীস্টের জন্মদিবস পালনের জন্য ভারতে তাহাদের শাসনাধীন এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে। উপজাতীয় এলাকা হইতে তাহারা এই ধারণাই লইয়া আসিয়াছিল যে, মুজাহিদগণের বৃটিশ-বিরোধিতার সাধ তাহারা পুরোপুরিভাবে মিটাইয়া দিতে পারিয়াছে। অতঃপর তাহারা আর কোন সময় তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না। সম্ভবতঃ এ জন্য সীমান্ত অভিযানের এই আংশিক সাফল্যকে তাহারা সমগ্র ভারতে ফলাও করিয়া প্রচার করিয়াছিল। তবে এই ধারণা যে অজ্ঞতা-প্রসূত ইহা সম্যকরূপে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে বেশী সময়ের আবশ্যক হয় নাই। উপজাতি ও মুজাহিদগণের সঙ্গে শীঘ্রই আবার তাহাদের সংঘর্ষ বাঁধে। কিন্তু এই সংঘর্ষের পূর্বে খাস বৃটিশ ভারতেও পরিস্থিতির ক্রমাবনতি দেখিয়া ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি বেশ কিছুদিন এস্থানেই নিবদ্ধ থাকে।

১৮৬৫ সালের মে মাসের একদিন গাজন খান নামক পাঞ্জাবের কর্ণাল জেলার জনৈক সার্জেণ্ট তাহার এলাকায় টহল দিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় চারি জন অপরিচিত লোক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। গাজন খান ১৮৫৮ সালের সীমান্তের অভিযানে ইংরেজদের ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া পুরস্কারস্বরূপ যুদ্ধের পর সার্জেণ্টের পদ লাভ করিয়াছিল। সেই যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীতে বাঙ্গালী মুসলমানকে লড়াই করিতে ও অকাতরে প্রাণ দিতে দেখিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিয়াছিল। তাহারা যে দীর্ঘকায় পাঞ্জাবীদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর যোদ্ধা, মনে মনে তখন সে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ঘটনার দিন উপরোক্ত চারি জন অপরিচিত লোককে দেখা মাত্রই সে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিয়া ফেলে। অতঃপর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অথচ আন্তরিকতার ভান করিয়া গাজন খান ইহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হয়। সরলপ্রাণ মুজাহিদগণ তাহার কথাবার্তা ও ব্যবহারে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সে যে তাহাদের পরম শত্রু ইংরেজদের একজন বেতনভুক

পুলিশ, একথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া তাহার প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর প্রদান করেন।

ইংরেজদের নিকট হইতে সুনাম, পদোন্নতি এবং আর্থিক পুরস্কারের লোভে পাঞ্জাবের এই 'মীর জাফর' মুজাহিদগণকে গ্রেফ্‌তার করিয়া স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহারা আল্লাহ, রসুল এবং ভারতীয় মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের নামে তাহার সহৃদয়তা এবং নিজেদের মুক্তির আবেদন জানান। কিন্তু গাজন খান ইহাতেও এই অনায়াসলব্ধ শিকার হাতছাড়া করিতে রাজী হইতেছে না দেখিয়া অবশেষে মুজাহিদগণ তাহাদের মুক্তির বিনিময়ে প্রচুর উৎকোচের লোভ প্রদর্শন করেন। মুক্তি-দানের জন্য নয় বরং এই সুযোগে টাকাটাও হাত করিবার মতলবে গাজন খান ইহা কোথায় এবং কাহার কাছে আছে জানিতে চাহে। মুজাহিদগণ তখন থানেশ্বরের মোহাম্মদ জাফরের নাম উল্লেখ করেন। ইংরেজদের দালাল, ধূর্ত গাজন খান ইঁহাদিগকে মুক্তি তো দিলই না, অধিকন্তু জাফরের নামটিও তাহার জানা হইয়া গেল।

এতদ্দেশীয় পুলিশের অপকীর্তি এবং মিথ্যা মামলা তৈরীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা স্থানীয় এই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের অজানা ছিল না। তিনি গাজন খানের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া মুজাহিদগণকে বিনা শর্তে ছাড়িয়া দেন। যে আশায় গাজন খান স্বদেশ ও স্বধর্মাবলম্বিগণের সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যের ফলে উহা তো পূর্ণ হওয়া দূরের কথা, উপরন্তু সে মিথ্যুক প্রতিপন্ন হইয়া যায়। এদিকে মুক্তি-প্রাপ্ত মুজাহিদগণ তথা হইতে আঁকাবাঁকা পথে থানেশ্বর রওয়ানা হইয়া যান।

শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের কেশাগ্র স্পর্শ করিবার সাহস গাজন খানের ছিল না। তাই সে মুক্তি-সংগ্রামরত মুসলমানদের উপর এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উপজাতীয় এলাকায় অবস্থিত মুজাহিদ শিবিরের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্র ফিরোজ খানকে তথায় পাঠাইয়া দেয়। লোভী পিতার সাহসী পুত্র নূতন রিক্রুট হিসাবে কিছু দিন সীতানা ও মুল্কায় অবস্থানের পর মুজাহিদগণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক উপজাতিদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া যথাসময়ে নিরাপদে পিতার

নিকট প্রত্যাবর্তন করে। গাজন খান অতঃপর এসকল তথ্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়া ইংরেজ সরকার তৎক্ষণাৎ এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা

তদনুসারে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের শতাধিক অভিজ্ঞ কর্মচারী ক্যাপ্টেন পারসেন্সের পরিচালনাধীনে মুজাহিদ নেতৃবর্গের সন্ধান ও গ্রেফ্-তারের জন্য পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও বাংলায় ছুটিয়া গেলেন। নির্দিষ্ট দিন থানেশ্বর, আম্বালা, মুলতান, দিল্লী, কানপুর, এলাহাবাদ, পাটনা এবং মালদহের মুজাহিদ শিবিরগুলির উপর পুলিশ ও মিলিটারী যুগপৎ হামলা পরিচালনা করিয়া তাহারা বহু লোককে গ্রেফ্তার পূর্বক বিচারের জন্য তাহাদিগকে আম্বালায় পাঠাইয়া দেন। তন্মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তিকে উৎ-পীড়নমূলক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়িয়া দিয়া ১১ জনকে আম্বালার দায়রা জজ স্যার হার্বার্ট এড্ওয়ার্ডসের এজলাসে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। ছয় জন এসেসরের সাহায্যে ২০ দিন শুনানীর পর দায়রা জজ মামলার রায় দেন। বিচারে মওলানা এহিয়া আলি, মুন্সী মোহাম্মদ জাফর এবং জনাব মোহাম্মদ শফির প্রতি ফাঁসি এবং জনাব রহিম, জনাব ইলাহী বখশ, জনাব হোসাইনী, জনাব মিয়াজান, জনাব আবদুল করিম, জনাব হোসাইন থানেশ্বরী, মওলানা আবদুল গফ্ফার ও শাহ সুফী গফ্ফারের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। ইহা ছাড়া সকলের যাবতীয় ধন-সম্পত্তিও বাজেয়াফ্তের আদেশ প্রদান করা হয়।

আম্বালার এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মামলা ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, ভারতবর্ষের অপর কোন মামলা সেরূপ করে নাই। আসামীগণের ঘরবাড়ী তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি হইতে সরকার এই সর্বপ্রথম জানিতে পারেন, তাঁহাদের গোটা শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের জন্য মুজাহিদগণ ৩৮ বৎসরের উর্ধকালব্যাপী সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন এবং সিপাহী বিদ্রোহ ও সীমান্তের অভিযানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়েন নাই। এই কল্পনাতীত ব্যাপারকে কি প্রকারে

মুজাহিদগণ সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন, আদালতে উপস্থাপিত দলিল-পত্র হইতে উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। নিরাপত্তার খাতিরে সরকার অনেক তথ্য গোপনও রাখিয়াছিলেন।

এহিয়া আলি

ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ৪৬ বৎসর বয়স্ক মওলানা এহিয়া আলি (ছদ্মনাম মহীউদ্দীন) বৃটিশ ভারতবর্ষে মুজাহিদগণের সর্বপ্রধান পরিচালক ছিলেন। পাটনার সাদিকপুরে একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁহার সদর কার্যালয় অবস্থিত ছিল। দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রংপুর ও নিম্ন বাংলার অন্যান্য জেলা হইতে মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত লোকজন সীতানা ও মুল্কার পথে পাটনায় কিছুকাল তাঁহার শিক্ষাধীন থাকিত। নূতন রিক্রুটদিগকে দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া প্রচারকার্যের জন্য মনোনীত দলকে কিছুদিন পরে ইনি মওলানা আবদুল গফ্‌ফারের হস্তে সমর্পণ করিতেন। অপর দল প্রেরিত হইত থানেশ্বরের মুন্‌সী মোহাম্মদ জাফরের নিকট। তিনি যথাসময়ে ইহাদিগকে সীতানা ও মুল্কায় পাঠাইয়া দিতেন।

মওলানা এহিয়া আলির সংগঠন-ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। রিক্রুট-দিগকে পূর্ব ভারত হইতে সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইত। আকৃতি-প্রকৃতিতে, আচার-ব্যবহারে, পোশাক পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় এমন কি আহার-বিহারে পর্যন্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে এই অঞ্চলের মুসলমানদের সাদৃশ্য অতি অল্প। এমতাবস্থায় মাসের পর মাস পুলিশকে ফাঁকি দিয়া এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই একটি সহজ ব্যাপার ছিল না।

কিন্তু মওলানা এহিয়া আলি এমনই সুচতুর ও সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন যে, এই সুদীর্ঘ পথে ১৮৬৩ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত এক জন মুজাহিদও ধরা পড়েন নাই। প্রত্যেক দশ হইতে পনর ক্রোশ পর পর তিনি সীতানা-যাত্রী রিক্রুটদের জন্য একটি করিয়া বিশ্রামস্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মঞ্জিল কোথায় এবং কে উহার তত্ত্বাবধায়ক, প্রথম মঞ্জিলের পরিচালক তাহা রিক্রুটদের কানে কানে বলিয়া দিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয় এই যে, তৃতীয় মঞ্জিল কোথায় এবং কে বা কাহারা উহার পরিচালক; তাহা প্রথম মঞ্জিলের পরিচালক জানিতেন না। দলের মধ্যে এরূপ গোপনীয়তাই দীর্ঘকাল তাহাদিগকে সমস্ত বিপদাপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। নূতন রিক্রুটগণ যে কোন মঞ্জিলে উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাইতেন, তাহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা পূর্ব হইতে তথায় করিয়া রাখা হইয়াছে।

কিন্তু এই সিংহপুরুষ সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন দলের জন্য লোক নির্বাচনে। সীমান্তের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য মনোনীত মুজাহিদগণের প্রসঙ্গ না হয় এস্থলে নাই উত্থাপিত হইল; কিন্তু প্রচার, শিক্ষা, পরিচালনা, যোগাযোগ রক্ষা, অর্থসংগ্রহ এবং গোয়েন্দাগিরির জন্য তিনি যেই সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের এক একজন এক একটি লৌহমানবরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। পুলিশ ও মিলিটারীর অকথ্য নির্যাতন, ফাঁসি, দ্বীপান্তর অথবা সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌তির আশঙ্কা কিম্বা প্রচুর অর্থ-খেতাব, উচ্চপদ বা জমিদারী, তালুকদারী ইত্যাদি প্রাপ্তির লোভ তাহাদের কাহাকেও দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। সম্ভাব্য সকল প্রকার অনুরোধ-উপরোধ এবং পুলিশ মিলিটারীর উদ্ভাবিত অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার ইহাদের মাত্র কয়েক জন ছাড়া অন্যান্যকে রাজসাক্ষীরূপে আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর যে কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে ইহা একটি অনন্যসাধারণ ব্যাপার।

মুজাহিদগণের জন্য ইনি এমন একটি সাঙ্কেতিক ভাষার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করিয়াছিলেন যাহা অন্যান্যদের পক্ষে একেবারে অবোধ্য ছিল। এই সাঙ্কেতিক ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, নেতৃস্থানীয় মুজাহিদগণ যখন নিজেদের মধ্যে উক্ত ভাষায় আলাপ-আলোচনা করিতেন, অধস্তন মুজাহিদ-গণের নিকট তখন উহার বেশীর ভাগ কথা অবোধ্য থাকিয়া যাইত। প্রায় ৫০ বৎসর পর বাংলার হিন্দু বিপ্লববাদীরা মওলানা এহিয়ারই ন্যায় একটি সাঙ্কেতিক ভাষার প্রবর্তন করিয়া পুলিশকে বহুদিন পর্যন্ত বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাটনায় রাজদ্রোহের অভিযোগে প্রথমে ফাঁসি পরে দ্বীপা-ন্তরের দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত মওলানা আহমদ উল্লাহ ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

মোহাম্মদ জাফর

থানেশ্বরের মুন্‌শী মোহাম্মদ জাফরের '২৮' জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। মুন্‌শী ছিল তাঁহার পেশাগত উপাধি। মুজাহিদগণের নিকট তিনি খলিফা জাফর নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ছদ্মনাম ছিল পীরু খান। সেকালে প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষা সমাপনের পর ১৮৫৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি দলিল লেখক হিসাবে স্থানীয় আদালতে যোগদান করেন। কিন্তু আদালতে যথারীতি যোগদানের পূর্বেই তাঁহার সুনাম সমগ্র জেলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ লোকের তো কথাই ছিল না, জটিল মামলা মোকদ্দমা এবং দলিল-পত্র লেখা বা পুরাতন দলিলের মর্ম উদ্ধারের জন্য ভাল ভাল উকিল মোক্তারগণ পর্যন্ত তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতেন। আশ্চর্যের বিষয়, আয়ের অঙ্ক তাঁহার যতই বাড়িয়া যাইতেছিল, নিজের পেশার প্রতি তিনি ততই বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছিলেন। আর্থিক প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি যেন সর্বদা কিছু একটার ভয়ানক অভাব অনুভব করিতেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ যে দিন সর্ব প্রথম থানেশ্বর পৌঁছে, জাফরকে সেদিনও পূর্ববৎ দলিল লিখিতে দেখা গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীর বেশধারী জনৈক আগন্তুকের সঙ্গে তাঁহার কিছুক্ষণ গোপন আলাপ হয়। সে রাত্রেই জাফর তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ১২ জন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লীতে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর পরিবহন বিভাগে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। দিল্লীর পতনের পর জাফর থানেশ্বর প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার সাবেক কাজে মনোনিবেশ করেন। তাহার বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের বিষয় ইংরেজ সরকার অনবহিত থাকেন।

জাফর তাঁহার পেশার প্রতি সমস্ত আকর্ষণ ইতিপূর্বেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাই কোন কাজকর্মে তাঁহার মন বসিতেছিল না। তথাপি দলিল লেখার কাজ তিনি একেবারে ত্যাগ করিলেন না। অনেকের বিশ্বাস, সরকারের চোখে ধূলি নিক্ষেপের জন্যই তিনি এই ভাণ করিয়াছিলেন।

পাটনা কেন্দ্র হইতে লোকজন ও টাকাকড়ি প্রথমে থানেশ্বরে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। জাফর পরে সুযোগমত উহা সীতানা ও

মুন্তায় পাঠাইয়া দিতেন। এক কথায়, তিনিই পাটনা ও সীতানার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। কোন কোন সময় তাহার নিকট প্রচুর টাকা ও অলঙ্কারাদি জমা হইত।

মোহাম্মদ শফি

মুজাহিদগণের ব্যাঙ্কার মোহাম্মদ শফি (ছদ্মনাম শাফায়াৎ আলি) তাঁহার সময় উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এদেশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, মোহাম্মদ শফির পূর্ব পুরুষগণ তাঁহাদের সংস্পর্শে যান। তাঁহার পিতামহ ইংরেজ বাহিনীর জন্য মাংস সরবরাহের একজন বড় কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্রের (শফির পিতা) জন্য বহু টাকা ও বিস্তর ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। স্বীয় যোগ্যতাবলে শফির পিতা নূতন নূতন কণ্ট্রাক্টের ব্যবস্থা করিয়া, ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন। সৎকার্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

মোহাম্মদ শফি কি পরিমাণ অর্থের মালিক ছিলেন বলা যায় না। গরু, মহিষ, ছাগল ও মেষ-পালকদের নিকট তাঁহার দাদন টাকার পরিমাণ ছিল এক কোটির উপর। তিনি সাতটি বৃহৎ সেনানিবাসে এবং প্রায় এক ডজন ছাউনিতে মাংস সরবরাহ করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ১৮৬৩ সালে গড়ে তাহার মাসিক আয় ছিল লক্ষ টাকার উপর। ব্যবসায়ে সততা, উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সহিত সৌহার্দ, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সর্বোপরি অর্ডারপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতার জন্য সামরিক বিভাগে তাঁহার এমন প্রতিপত্তি ছিল যে, রাজদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পরও তিনি উক্ত বিভাগের নূতন নূতন কণ্ট্রাক্ট লাভ করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ শফি নিজে অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। মুজাহিদগণের তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যাঙ্কার। মুক্তি-সংগ্রামের ব্যয় নির্বাহের জন্য সংগৃহীত টাকা-কড়ি, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অলঙ্কারপত্র তাঁহার নিকট জমা দেওয়া হইত। তিনি ইহা তাঁহার এজেন্টদের মারফৎ সীতানায় ও মুন্তায় পাঠাইয়া দিতেন।

বিপ্লববাদীরা আরও একটি কারণে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। সেনানিবাস ও ছাউনীতে তাঁহার অবাধ যাতায়াত ছিল। কাজেই সৈন্যদের গতিবিধির গোপনীয় তথ্যাদি তাঁহার অজানা থাকিত না। নূতন কিছু তাঁহার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি তাহা বিপ্লবীদের সদর দফতরে জানাইয়া দিতেন।

মওলানা আবদুল রহিম (২৮) আজিমাবাদের একজন বিশেষ খ্যাত-নামা ও বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। মিয়া আবদুল গফ্‌ফার বাল্যজীবনে মওলানা আবদুল রহিমের কর্মচারী ছিলেন। কাজী মিয়াজান ছিলেন মুজাহিদগণের একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং চাঁদপুরের অধিবাসী। নিম্ন বাংলায় তিনি মুজাহিদগণের প্রধান ছিলেন। আবদুল করিম (৩৫) ছিলেন সেখ মোহাম্মদ শফির আত্মীয় ও প্রতিনিধি। আবদুল গফুর (২৫) ছিলেন মোহাম্মদ জাফরের সহকারী। হোসাইনী (২৫) ইবনে মোহাম্মদ বখ্‌শ দলের সাংগঠনিক কর্মকর্তা ছিলেন। হোসাইন (৩৫) ইব্‌নে মীগু ছিলেন দলের সংবাদবাহক। ইলাহী বখ্‌শ ছিলেন মওলানা আহমদ উল্লার বিশেষ প্রতিনিধি এবং একজন ধনী ব্যবসায়ী। আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন মিঃ প্লোডেন, মিঃ শুডল্‌ ও মিঃ জনসন নামক তিন জন বিশিষ্ট ইংরেজ ব্যারিস্টার। গড়ে ইঁহাদের প্রত্যেককে দৈনিক এক হাজার টাকা ফিস দিতে হইয়াছিল।

আম্বালার দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালতে আপীল হয়। বিচারপতি নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া ফাঁসির আদেশ বাতিল করতঃ প্রথমোক্ত তিন জনের প্রতি যাব-জ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও দণ্ডাজ্ঞার কিছু রদবদল ঘটে। এইরূপে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী বীর সন্তানগণ তাঁহাদের গুণমুগ্ধ কোটি কোটি স্বদেশবাসীর দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যান। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মওলানা এহিয়া আলি, মিয়া আবদুল গফ্‌ফার, মুন্‌শী মোহাম্মদ জাফর এবং মওলানা আবদুর রহিমকে কিছুদিন পর আন্দামানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আন্দামানে মওলানা এহিয়া আলির মৃত্যু ঘটে। অবশিষ্ট তিনজন ১৬ বৎসরের উর্ধকাল পর মুক্তিলাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। মুনশী মোহাম্মদ জাফর আন্দামানে

দুইবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। মোট আটটি সন্তান-সন্ততি সহ তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার এক পুত্র আম্বালায় উকিল ছিলেন। সেস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি নিহত হন। বন্দী জীবনের উপর মুনশী জাফর একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আম্বালার ঐতিহাসিক মামলার বিচারের পর ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনায় মওলানা আহমদ উল্লাহর বিচার হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং আম্বালায় দণ্ডিত ব্যক্তিগণের ন্যায় ইহারও যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত হইয়া যায়।

মওলানা আহমদ উল্লাহ দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত মওলানা এহিয়া আলির জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ১৮৬৫ সালের জুন মাসে তিনি আন্দামানে নীত হন। দীর্ঘ ১৬ বৎসর তথায় অবস্থানের পর ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে আন্দামানের ভাইপার দ্বীপে তিনি পরলোকগমন করেন এবং বহু লোকের উপস্থিতিতে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় সমাহিত হন।

মালদহের মামলা

আনুমানিক ১৮৪০ সালের কোন এক সময় মালদহের প্রচার-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্ণৌর মওলানা আবদুর রহমান ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইনি মালদহে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সেস্থানেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর মালদহে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হন। ধর্মীয় সভাসমিতি আহ্বান করিয়া তিনি জেহাদের বাণী প্রচার এবং মুসলমানদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া লোক মারফৎ তাহা পাটনা কেন্দ্রে পাঠাইতেন। একার্যে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন রফিক মণ্ডল নামক একজন উৎসাহী কর্মী। সীমান্তের মুজাহিদগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিযোগে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে কিছু কালের জন্য কারাগারে আটক রাখিয়া পরে মুক্তি দেন।

রফিক মণ্ডলের পর মওলবী আমির উদ্দীন মালদহ কেন্দ্রের পরিচালক হন। মালদহ ছাড়াও মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহীর মুসলমানদের উপর ইঁহার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। ইঁহার নির্দেশে তাহারা জাকাৎ,

সাদ্‌কা, কোর্‌বানীর জন্তর চামড়ার দাম এবং মুষ্টি চাঁদার চাউল ইত্যাদি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিত। তিনি যথাসময় উহা সীমান্তে পাঠাইয়া দিতেন। জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি কয়েক শত কর্মীও তথায় পাঠাইয়াছিলেন। পাটনার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত মওলানা আহমদ উল্লাহর বিচারের সময় ইঁহার নাম প্রথম প্রকাশ পায়। তদনুসারে সরকার পাবনায় ইঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া মালদহে পাঠাইয়া দেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে ইনি দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগের জন্য ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে আন্দামান পৌঁছেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। ১৮৮৩ সালে মুক্তি লাভের পর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন।

মালদহের রাজদ্রোহের মামলার পর রাজমহলের ইব্‌রাহিম মণ্ডল নামক জনৈক প্রভাবশালী ও ধর্মভীরু ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করেন। যতদূর জানা যায়, ইনিও সীমান্তের মুজাহিদগণকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৭১ সালে তিনি বিচারে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিস্তর ভূসম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত হইয়া যায়। কোন এক অজ্ঞাত কারণে সরকার তাঁহাকে আন্দামানে প্রেরণ করেন না। দীর্ঘ ৮ বৎসর সশ্রম কারাবাসের পর লর্ড লীটনের আদেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর তিনি প্রায় ২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

পাটনার দ্বিতীয় মামলা

রাজদ্রোহিতার কার্যে লিপ্ত বিপজ্জনক ওহাবী আখ্যা দান করিয়া সরকার ১৮৭১ সালে পীর মোহাম্মদ, আমির খান, হাসমত দাদ খান, মোবারক আলি, তাবারক আলি, হাজী দীন মোহাম্মদ এবং আমিন উদ্দীন—এই সাত জনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া বিচারার্থ পাটনায় প্রেরণ করেন। পাটনার দায়রা জজ চারিজন এসেসরের সহায়তায় ইঁহাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা মিঃ জে. এইচ. রেলীর একখানি অসঙ্গতিপূর্ণ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই সরকার ইঁহাদের গ্রেফ্‌তার ও অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই মামলায় সরকার পক্ষে ১১৩ জন এবং আসামী পক্ষে ৪৬ জন সাক্ষ্য প্রদান করে।

আসামীগণের প্রত্যেকেই সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল। তন্মধ্যে হাসমত দাদ খান ও আমির খান নগদে ও ব্যবসা বাণিজ্যে বহু লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন। গ্রেফ্তারের সময় আমির খানের বয়স ছিল ৭৫ বৎসর। আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ হইতে খ্যাতনামা ইংরেজ আইনজীবী আনা হইয়াছিল। আমির খান ও হাসমত দাদ খান প্রত্যেকে এই মামলায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

প্রমাণাভাবে হাসমত দাদ খান এবং পীর মোহাম্মদ বেকসুর খালাস পান। অবশিষ্ট পাঁচ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহাদের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াফ্ত হয়। বাজেয়াফ্ত সম্পত্তির আয়ের টাকায় এখনও পাটনায় একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কারাবাসকালেই মোবারক আলির মৃত্যু ঘটে। সম্ভবতঃ অপর চারিজন ১৮৮৩ সালে গভর্ণর-জেনারেলের এক ঘোষণা অনুসারে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর ইঁহাদের কেহই অধিক দিন জীবিত ছিলেন না।

জাস্টিস নর্মানের হত্যা

১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর হঠাৎ ক্ষণেকের জন্য যেন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী চীফ্ জাস্টিস মিঃ নর্মান জনৈক মুসলমানের ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। হাইকোর্টের বর্তমান প্রাসাদতুল্য ভবনটির নির্মাণকার্য চলিতে থাকায় টাউন হলেই তখন বিচারকার্য সম্পাদিত হইত। সেদিন ছিল বুধবার। প্রখর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত প্রশস্ত রাজপথে লোকের ভীড় ঠেলিয়া বিচারপতি নর্মানের গাড়ীখানি যখন টাউন হলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন ঘড়িতে মাত্র এগারটা। বিচারপতি নর্মান গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্বক খট্‌খট্ করিয়া সিঁড়ির সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করেন। অনুমান অর্ধেক সংখ্যক সোপান অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বারপথে লুক্কায়িত স্থান হইতে এক ব্যক্তি ঝড়ের বেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হন। বিচারপতি নর্মানকে আত্মরক্ষার কোন

সুযোগই না দিয়া এই ব্যক্তি তাঁহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে বাম বক্ষে তাহার সুতীক্ষ ছোরাখানি বসাইয়া দেন। বিচারপতি নিজেকে সামলাইয়া লইবার পূর্বেই আততায়ী তাঁহার তলপেট লক্ষ্য করিয়া আবার ছোরাঘাত করেন।

এই আঘাতের পর প্রাণরক্ষার জন্য বিচারপতি নর্ম্যান ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আততায়ীও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। আক্রমণকারী তাহার তৃতীয় আঘাত হানিতে যাইবেন এমন সময় বিচারপতি নর্ম্যান একখানি ইট দেখিতে পাইয়া কম্পিত হস্তে উহা উঠাইয়া লইয়া আততায়ীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করেন। ইটের অব্যর্থ আঘাতে আততায়ী নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া সেস্থানেই বসিয়া পড়েন।

ইত্যবসরে বিচারপতি নর্মান রাজপথের মধ্যভাগে আসিয়া দাঁড়ান। অফিসমুখী লোকজন ও পথচারীরা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আক্রমণকারীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। কিন্তু তাহার রক্তাক্ত দেহ, বিকৃত চেহারা সর্বোপরি হস্তস্থিত ছোরা দেখিয়া কেহ তাহার নিকটস্থ হইতে সাহস পাইতেছিল না। আক্রমণকারী নিজেও বেষ্টনীর বাহিরে যাইবার কোন রকম চেষ্টা করিলেন না। মিনিট কয়েক পর জনৈক হিন্দু দিন-মজুর একটি বংশখণ্ড দ্বারা তাহার মস্তকে এত জোরের সহিত আঘাত করে যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভূতলশায়ী হইয়া পড়েন। এই দিন-মজুরটি ছিল বিহারের মোজাফ্‌ফরপুরের অধিবাসী। আততায়ী এরূপে কাবু হইয়া পড়িলে পুলিশের লোকজনরা আসিয়া তাহাকে থানায় লইয়া যায়।

এদিকে আহত মিঃ নর্মানকে একখানি পাল্‌কীতে করিয়া মেসার্স থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর দোকানে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় কলিকাতার তৎকালীন প্রখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসকগণ তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মিঃ নর্মানের প্রাণ রক্ষা পাইল না। থ্যাকার স্পিঙ্কের দোকানেই রাত্রি একটার সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পর দিবস প্রাতে ভারত ও প্রাদেশিক সরকারের জরুরী আদেশে সমগ্র মহানগরী কৃত্রিম শোকাভিভূত হইয়া পড়ে। উভয় সরকারের অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশিত নির্দেশ অনুসারে সেদিন কলিকাতার সমস্ত দোকানপাট, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, যানবাহন ইত্যাদি বন্ধ রাখিতে হয়। রাসেল

স্ট্রীটের যে বাড়ীতে বিচারপতি নর্মান বাস করিতেন, ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় সেই বাড়ী হইতে শব-শোভাযাত্রা বাহির হয়। মুসলমানেরা সরকারী নির্যাতনের ভয়ে, হিন্দুরা সরকারী অনুগ্রহ লাভের আশায় এবং খ্রীস্টানেরা আততায়ীর কার্যের নিন্দার জন্য এত অধিক-সংখ্যায় শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল যে, কলিকাতার জনসমাবেশের পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড সেদিন ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

যথাসময়ে আততায়ীকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। গ্রেফ্‌তারের সময় ও পরে তাহার উপর এত অত্যাচার হইয়াছিল যে, তিনি এজলাসে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। আঘাতের দরুন তাহার মস্তিষ্কেরও বিকৃতি ঘটিয়া গিয়াছিল। সরকার পক্ষের সাক্ষিগণকে কোন প্রশ্ন করিতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি প্রলাপোক্তি করিতে থাকেন। মস্তিষ্কবিকৃতির এই সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করেন। বিচারপতি স্যার জে. সি. পলের এজলাসে তাহার বিচার হয়। তিনি আসামীর ফাঁসির আদেশ দেন। কিছুদিন পর জেলের মধ্যেই তাহার ফাঁসি হইয়া যায়।

আততায়ীর নাম আবদুল্লাহ। পাঞ্জাবে ছিল তাহার বাড়ী। আবদুল্লাহ ছিলেন একজন বিপ্লবী। ছদ্মবেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুলতান, দিল্লী, শাহরাণপুর, বেরেলী প্রভৃতি স্থান হইয়া তিনি পাটনায় পৌঁছেন। তাহার পাটনা অবস্থানের সময় সরকার বহু সংখ্যক দেশপ্রেমিক মুসলমানকে গ্রেফ্‌তার করেন। পাটনার দায়রা জজ মিঃ প্রিন্সেপ চারিজন এসেসরকে লইয়া ধৃত হাসিম দাদ খান, কাজি দীন মোহাম্মদ, মোবারক আলি, আমিরউদ্দীন ও তাবারক আলীর বিচার করেন। প্রমাণাভাবে হাসিম দাদ খান ও পীর মোহাম্মদ খালাস পান। অবশিষ্ট পাঁচজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন। প্রধান বিচারপতি অপর দুইজন বিচারপতি সহ ইঁহাদের আপীল শ্রবণ করেন। পাটনা হইতে আবদুল্লাহ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। হাইকোর্টের বিচারের উপর এতকাল তাহার যে শ্রদ্ধা ছিল, উপরোক্ত মামলার রায়

প্রকাশিত হইলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। বিচারপতি নর্মানের হত্যার ইহাই একটি সহজবোধ্য কারণ।

ফাঁসির রজ্জু তিনি স্বহস্তে পরিধান করিয়াছিলেন—সৌখিন ব্যক্তিগণ যেভাবে গলায় ফুলের মালা পরিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৪৫ বৎসর।

বড়লাট হত্যা

বিচারপতি মিঃ নর্মানের হত্যার জের না মিটিতেই ভারতের বড়-লাট লর্ড মেয়ো সুদূর আন্দামানে নিহত হন।

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ সালের ১২ই জানুয়ারী বিদায়ী ভাইসরয় স্যার জন লরেন্সের নিকট হইতে যখন কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন এই বিশাল ভারতবর্ষের সর্বত্র পূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দুই বৎসর ইংরেজদের গোলাবারুদে যে সকল জনপদ ও শহর জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আস্তে আস্তে আবার গড়িয়া উঠিতেছিল। ফাঁসিমঞ্চে, সঙ্গীনের খোঁচায়, কামান বন্দুকের গুলিতে কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে পুলিশ, মিলিটারী ও বেসামরিক শ্বেতাঙ্গদের ভীষণ অত্যাচারে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত অসংখ্য নর-নারীর যাহারা সমাহিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের কবরগুলি আত্মীয়-স্বজনদের ভয়প্রসূত অবহেলায় গত কয় বৎসরে বৃক্ষলতা-গুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া বন্য পশুপক্ষীর আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছিল। এক কথায় লোকে সিপাহী বিদ্রোহের মর্মন্তুদ ঘটনার কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে এদেশে লর্ড মেয়োর আগমন হয়।

শাসনভার গ্রহণ করিয়া তিনি সর্বাগ্রে এদেশের কারাগার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। আন্দামানের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আন্দামান হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া তিনি সিমলা শৈল-শিখরে বসিয়া কতকগুলি নিয়ম-কানুন রচনা করেন। নবপ্রবর্তিত ব্যবস্থাদির কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকেফহাল হওয়ার জন্য তিনি ১৮৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনের

পথে সপরিবারে আন্দামান যাত্রা করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে 'গ্লাসগো' নামক একখানি ক্ষুদ্রাকারের রণতরী তাঁহাদিকে লইয়া আন্দামানের হোপ্‌টাউনে পেঁছে। নৌ-বহরের 'ঢাকা' নামক অপর একখানি জাহাজ 'গ্লাসগোর' পার্শ্বেই নোঙ্গর করে।

কার্যসূচী অনুসারে লর্ড মেয়ো সারাদিন ভাইপার ও রস দ্বীপ পরিদর্শনে অতিবাহিত করেন। হোপ্‌টাউনের জেটি হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত সহস্রাধিক ফিট উচ্চ মাউণ্ট হেরিয়েট নামক পর্বতশৃঙ্গে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে তিনি সদলবলে সূর্যাস্তের একটু পূর্বে তথায় পেঁছেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক তিনি বলিয়া উঠেন: 'এ সকল দ্বীপে বিশ লক্ষ কয়েদীর স্থান হইতে পারে। কি চমৎকার জায়গা!' মাউণ্ট হেরিয়েট হইতে তিনি সদলবলে যখন জেটিতে ফিরিয়া যান, তখন জাহাজে সাতটার ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। তাঁহাকে জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য একখানি লঞ্চ পূর্ব হইতে জেটিতে অপেক্ষা করিতেছিল। লর্ড মেয়ো তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী, জেলসুপার, 'গ্লাসগো'র ফ্ল্যাগ লেফ্‌টন্যাণ্ট, জনৈক কর্ণেল এবং আরও কতিপয় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া জেটির উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর মধ্য দিয়া লঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। জেটি হইতে লঞ্চে অবতরণের সিঁড়ির সোপানে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বেশ খানিক দূর পর্যন্ত প্রসারিত সুউচ্চ প্রস্তরখণ্ডগুলির মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া তড়িৎবেগে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। লর্ড মেয়োর সঙ্গীদের মধ্যে মাত্র দুই চারিজন মশালের আলোকে শুধু একখানি হাত ও একখানি ছোরা বার কয়েক নড়িতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় পনরজন লোক আততায়ীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। অতঃপর সকলে ধরাধরি করিয়া বড়লাটকে তীরে লইয়া যান।

জেটির পার্শ্বে রক্ষিত একখানি গো-শকটের উপর তাঁহাকে শয়ন করান হইলে এই সর্বপ্রথম সকলের নজরে পড়ে তাঁহার পরিহিত হাল্‌কা কোটটির পৃষ্ঠভাগে একটি কালবর্ণের ছিদ্রের প্রতি। এই ছিদ্রটি দিয়া তখনও রক্ত নির্গত হইতেছিল। এ সময় একবার লর্ড মেয়ো সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু না পারিয়া পিছন দিকে হেলিয়া পড়িয়া

গেলেন। 'আমার মাথাটি উঁচু করিয়া ধর'—এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেন। উপস্থিত সকলে মনে করিলেন, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই সে অবস্থায় তাঁহারা বড়লাটকে লঞ্চে লইয়া যান। লঞ্চখানি যতই জাহাজের নিকটবর্তী হইতেছিল, ততই ইহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে যে, তিনি জীবিত নাই। বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একজন বড়লাট আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন ভারতের মূল ভূভাগে নয়—কালাপানির দেশে।

শবদেহ পরীক্ষার পর জাহাজের ডাক্তারগণ জানান, আততায়ীর ছোরাখানি বড়লাটের স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া বক্ষদেশ স্পর্শ করিয়াছে। জাহাজে জিজ্ঞাসাবাদের পর আততায়ীকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সোপর্দ করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট মেজর প্লেফেয়ার পর দিবস বিচারার্থ তাহাকে জেনারেল স্টুয়ার্টের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সরাসরিভাবে বিচারকার্য সমাধা করিয়া আসামীর প্রতি ফাঁসির আদেশ দেন। হাইকোর্টের অনুমোদনের জন্য মামলার নথিপত্র যথাসময়ে কলিকাতা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিচারপতিগণ নথিপত্রে অনেক অসঙ্গতির সন্ধান পান। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা ফাঁসির আদেশ অনুমোদন করিয়া পাঠান। ১১ই মার্চ অর্থাৎ লর্ড মেয়োর হত্যার মাত্র এক মাস তিন দিন পর ভাইপার দ্বীপে আততায়ীর ফাঁসি হইয়া যায়।

আততায়ীর নাম ছিল শের আলী খান, বাসস্থান ছিল খাইবার এলাকায়। তিনি এককালে পাঞ্জাব অশ্বারোহী বাহিনীতে কার্য করিতেন। তাহার জনৈক রাজনৈতিক শত্রুকে হত্যা করার অভিযোগে ১৮৬৭ সালের ২রা এপ্রিল পেশোয়ারের কমিশনার কর্ণেল পোলক্ তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। শের আলি তখনই স্থির করেন, যে কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজকে হত্যা করিয়া তিনি এই অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ জানাইবেন। বলা বাহুল্য, শুধু উচ্চ নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ পদধারী ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ সালের মে মাসে তিনি আন্দামানে পৌঁছেন। সে স্থানে তিনি মোটামুটিভাবে শান্তশিষ্ট লোকের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিলেন। ১৮৭১ সালের ১৫ই মে তাহাকে হোপ্‌টাউনে স্থানান্তরিত করা হয়। লর্ড মেয়োর হত্যার দিন পর্যন্ত তিনি তথায় ক্ষৌরকর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

ঘটনার দিন লর্ড মেয়োর উপস্থিতি ঘোষণা করিয়া তোপধ্বনি হইতে থাকিলে সে তাহার ছোরাখানি ধারাল করিয়া লয়। অতঃপর সে অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে দূর হইতে অনুসরণ করিতে থাকে। কোথাও সুযোগ-সুবিধা না হওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে জেটি সংলগ্ন প্রস্তর খণ্ডগুলির মধ্যে সে গা ঢাকা দেয়।

ফাঁসির আদেশের পর কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে একদিন সে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া জনৈক সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ প্রহরীকে ঘুষি মারিয়া ভূতলশায়ী করিয়া তাহার প্রাণটা বাহির করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল। বিপন্ন প্রহরীর চিৎকার শুনিয়া অন্যান্য প্রহরী ছুটিয়া না আসিলে সেদিন তাহার আর উপায় ছিল না। ফাঁসির হুকুমের পর তাহার দেহের ওজন বাড়িয়া গিয়াছিল।

ন্যায় বিচারের নমুনা

উপরে হত্যার দায়ে যেই দুইটি ফাঁসির ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, উভয় ক্ষেত্রে হত্যাকারী ছিলেন ভারতবাসী। নিম্নে যে ঘটনাটি সন্নিবেশিত হইল উহার নায়ক ছিলেন একজন ইংরেজ। উভয়ক্ষেত্রে বিচারের তারতম্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। মিঃ ফুলার নামক জনৈক ইংরেজ আগ্রায় আইন-ব্যবসায় করিতেন। একদা রবিবারের এক সকালে তিনি পরিজনবর্গ সহ গীর্জায় উপাসনায় যোগদানের জন্য ভৃত্যকে নিজের গাড়ীখানি আনিতে আদেশ দেন। গাড়ীখানি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সহিস নাই। সহিসকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান হয়। সংবাদ পাইয়া সহিস তাড়াতাড়ি আসিয়া হাজির হইল। বেচারা সালাম নিবেদনের জন্য মিঃ ফুলারের নিকটবর্তী হইতেই তিনি বাম হাতে তাহার মাথার চুল টানিয়া ধরিয়া ডান হাতে তাহার মুখে, নাকে এবং ঘাড়ে ঘুষি মারিতে আরম্ভ করেন। আঘাতের চোটে সহিসের মুখ দিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। ইহাতেও মিঃ ফুলারের ক্রোধের উপশম হয় না। সহিস মাটিতে পড়িয়া গেলে মিঃ ফুলার তাহাকে অনেক কয় বার পদাঘাত করেন। অতঃপর তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াই ধর্মপরায়ণ মিঃ ফুলার গাড়ীতে করিয়া গীর্জায় চলিয়া যান। মিঃ ফুলারের ঘটনাস্থল

ত্যাগের পর লোকজন আসিয়া দেখে, ইতিমধ্যে সহিসের প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

আগ্রার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লীড্‌স ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারা অনুসারে মিঃ ফুলারকে অভিযুক্ত করিলেন। তখনকার দিনে ইংরেজদের হাতে এদেশীয়দের অপমৃত্যু বিরল ছিল না, বড় কথাও ছিল না। এ ধরনের মৃত্যুকে ভারতবাসীরা বিধাতার অভিশাপ মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রার যেই মেডিকেল অফিসার সহিস কাত্‌বারুর ময়না তদন্ত করিয়াছিলেন, আদালতে সাক্ষ্য দানকালে তিনি বলেন, প্লীহা ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মতে প্লীহাটি এত বড় হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য আঘাতে বা মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার দরুন উহা ফাটিয়া যায়। মিঃ লীড্‌স গুরুতর আঘাত সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস করিয়া বলেন, যেহেতু অন্য কোন রকম আঘাতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এজন্য তিনি লঘু আঘাতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মিঃ ফুলারের ত্রিশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে পনর দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিতেছেন। রায়ে তিনি ইহাও বলেন, জরিমানার টাকাটা কাত্‌বারুর বিধবা স্ত্রীকে দিতে হইবে। মিঃ ফুলারের ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া মিঃ লীড্‌স এই ভাবিয়া আত্মসন্তুষ্টি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ন্যায়বিচারক হিসাবে অতঃপর তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী ভারতবাসীদেরও শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু এইরূপ একটি গুরুতর অপরাধের জন্য যেক্ষেত্রে ফাঁসি না হোক্, অন্ততঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল, সেক্ষেত্রে মাত্র ত্রিশ টাকা জরিমানা ভাল শুনায় না। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাই প্রদেশের উচ্চতম আদালতকে দিয়া ইহা অনুমোদিত করাইয়া লইতে উদ্যোগী হন। বশংবদ আদালত মামলার নথিপত্র পাঠ করিয়া মন্তব্য করেন, এইরূপ অপরাধের জন্য তাঁহারা হয়ত আরও বেশী শাস্তির আদেশ দিতেন। তবে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট যেই শাস্তি দিয়াছেন উহার বিরুদ্ধে আপত্তিরও বিশেষ কিছু নাই। এভাবে মামলাটি চাপা পড়িয়া যায়। বিচারকার্যে মিঃ লীড্‌সের ন্যায়পরায়ণতা এবং তাহার প্রতি অকৃপণ বদান্যতার জন্য কাত্‌বারুর

বিধবা স্ত্রী প্রশংসা কীর্তন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল কিনা জানা যায় না।

ইহা ১৮৭৬ সালের কথা। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতাই ছিল তখনকার দিনে যাবতীয় আবেদন-নিবেদনের কেন্দ্রস্থল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যাও ছিল এ স্থানেই সর্বাধিক। ইহা সত্ত্বেও গোড়ার দিকে কলিকাতায় ইহা লইয়া কোন আন্দোলন হয় না। কিছুদিন পর হঠাৎ কলিকাতার কাগজগুলি মিঃ ফুলারের মামলার পূর্ণ বিবরণী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। ফলে মিঃ ফুলার, মিঃ লীড্‌স এবং হতভাগ্য কাত্‌বারুর নাম রাতারাতি সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এ সময়ে বাংলায়ও একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়। এই উভয় ব্যাপারে বাংলার অধিবাসীদের মন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, সভা-সমিতি ও ক্লাবে এদেশীয়দের উপর ইংরেজ রাজপুরুষদের অত্যাচারের কথা আলোচিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় ঘটনাটি এই:

পদাধিকার বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচালনাধীন হুগলী জেলার এক মিউনিসিপ্যালিটি উহার এলাকার মধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি পায়খানা তৈরী করে। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তখনকার দিনে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে সরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য থাকিত। এদেশবাসীর মনোভাবের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করাই ছিল তাঁহাদের নীতি। মিউনিসিপ্যালিটির সভায় এই বিষয়টি উত্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় জনৈক সদস্য অধিবাসীদের দাবীর জোর সমর্থন করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এদেশীয় সদস্যের এতটা ধৃষ্টতা বরদাশ্‌ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি উক্ত সদস্যকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া সভা হইতে বাহির করিয়া দেন। শ্বেতাঙ্গ ম্যাজেস্ট্রেটের এই বেআইনী ও অশোভন আচরণে উত্তেজিত হইয়া জনসাধারণ নবনির্মিত পায়খানার কয়েকটি পোড়াইয়া দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট ইহাতে আরও কুপিত হইয়া উপদ্রুত এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্পেশাল কনস্টেবলরূপে পালাক্রমে দিবারাত্রি অবশিষ্ট পায়খানা কয়টি পাহারা দিতে বাধ্য করেন। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকেও এই শাস্তি হইতে রেহাই দেওয়া হয় না।

ম্যাজিস্ট্রেটের এই অন্যায়কার্যে একান্ত সঙ্গতভাবে কলিকাতায় প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুদের প্রধান প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইহার নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের যথোচিত শাস্তির দাবী জানান। ইহার উত্তরে সরকার ম্যাজিস্ট্রেটকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকেও শাসাইয়া দেন যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে শ্বেতাঙ্গদের কার্যের কোন প্রতিবাদ না করেন।

মিঃ ফুলারের দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তাহাদের আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার এবং মিঃ লীড্‌সের নামও যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড লীটন বড়লাট হইয়া আসিলে ব্যাপারটি তাঁহার গোচরীভূত হয়। সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল মিঃ লীড্‌স এবং হাইকোর্টের আচরণের নিন্দা করিয়া অনেক বড় বড় বুলি আওড়ান। অতঃপর তিনি লীড্‌স সম্পর্কে নির্দেশ দেন, অধিকতর বিচারবুদ্ধির পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে হইলেও কোন জেলার চার্জ দিয়া যেন না পাঠানো হয়।

সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল অতঃপর এশিয়াবাসীদের সার্বজনীন রোগের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহেন, এভাবে তাহাদিগকে মারপিট করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে তাহাদের প্লীহা ফাটার আশঙ্কা থাকে। বলা অনাবশ্যক, পরবর্তীকালে কোন কোন সদাশয় ইংরেজ রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিদানের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আরও বহু ভারতীয়ের প্লীহার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া আদালতের ন্যায়বিচারে বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। স্মরণ করা যাইতে পারে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজ মনিবগণের হাতে ভারতীয় অসহায় ভৃত্যদের প্লীহা বিস্ফোরণের ঘটনা আতঙ্কজনক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্যভাবে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহে পদাঘাতের সাহায্যে প্লীহা ফাটাইয়া দিয়া অভিযুক্ত ইংরেজকে লঘু দণ্ড লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। ইংরেজ মালিকাধীন আসামের চা-বাগানগুলিতে প্লীহা ফাটার ঘটনাগুলির সহিত তথাকার শ্রমিক অসন্তোষের সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। বিগত ১৯২১ সালে ইহা প্রবল আকার ধারণ করিলে বঙ্গদেশের কংগ্রেস-নেতৃবর্গ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শত বর্ষস্থায়ী শাসনামলে তাঁহারা মুসলমানদিগকে সব দিক দিয়া এবং হিন্দুদিগকে শুধু সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া একেবারে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাক্-স্বাধীনতা ছিল অস্বীকৃত এবং রাজনৈতিক সভাসমিতি গঠনের উপর আরোপিত ছিল কঠোর নিষেধাজ্ঞা। অবশ্য মোগল আমলেও এদেশে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বলিতে কিছু ছিল না। কিন্তু সেটা ছিল মধ্যযুগ এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রীঃ) বহু পূর্বে ভারতবর্ষে না হইয়া থাকিলেও, ইংলণ্ড সহ পৃথিবীর অনেক দেশে মধ্যযুগের অবসান ঘোষিত হইয়া গিয়াছিল। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মধ্যযুগের অভিশাপগুলি এদেশের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে তাঁহারা যেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহ উহারই ভিত্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

কিন্তু বিদ্রোহের অবসানে ইংলণ্ডের রাণী যে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, উহা আর কোম্পানী আমলের ভারতবর্ষ ছিল না। পরিবর্তিত ভারতবর্ষের নূতন শাসক সমাজ উপলব্ধি করেন, শাসনকার্যে ভারতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা। তদনুসারে তাঁহারা সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করিলেন। মুসলমানরা ইতস্ততঃ করিতে থাকে, পক্ষান্তরে হিন্দুরা ইহা দৃঢ়ভাবে ধরিল। শিক্ষা-ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহার ফলে সিপাহী বিদ্রোহের পর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দুদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন একটি সমাজ গড়িয়া উঠিল রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য যাহাদের ব্যগ্রতা নানাভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইহাদের এই ব্যগ্রতা একটি এসোসিয়েশন আকারে রূপলাভ করে।

উপরে এক স্থলে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন অন্যতম। সম্ভবতঃ ইংরেজ আমলে ইহাই ভারতীয়দের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার কয়েক বৎসর পর ভারতের পারসিক সম্প্রদায়ের নেতা দাদাভাই নওরোজী বোম্বাই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত করেন। বোম্বাই এসোসিয়েশনের অনুকরণে ১৮৮১ সালে মাদ্রাজ মহাজন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড়ার দিকে মাদ্রাজে মহাজন সভায় রাজনৈতিক বিষয়ের উপর কোন আলোচনা হইত না। কিন্তু এই তিনটির কোনটিরই সর্বভারতীয় মর্যাদা ছিল না এবং প্রাদেশিক ব্যাপারেই ইহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই তিনটির মধ্যে মাদ্রাজ মহাজন সভা ছিল একক হিন্দু প্রতিষ্ঠান। অপর দুইটির দ্বার সব সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইতে থাকিলে তাঁহারা একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এইরূপ প্রতিষ্ঠান তখনকার দিনেও অনেকটা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। বৃটিশ সিভিলিয়ান মিঃ এ. ও. হিউম শিক্ষিত শ্রেণীকে এ সম্বন্ধে উৎসাহিত করিতে থাকেন। মিঃ হিউম তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিনের অন্তরঙ্গ ছিলেন। সুতরাং লর্ড ডাফ্‌রিন একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পত্তনে আপত্তি করিবেন না, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত ছিল।

তত্রাচ বোম্বাই এবং বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট জননায়ক এ সম্বন্ধে সলা-পরামর্শের জন্য প্রথমে একটি ঘরোয়া বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যারিস্টার শ্রী উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ হিউম হন ইহার সেক্রেটারী। এই উপলক্ষে লর্ড ডাফ্‌রিন উদ্যোক্তাগণের এই প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন। মিঃ হিউম ছাড়া আরও কতিপয় উচ্চপদস্থ ইংরেজ ইহার সহিত জড়িত থাকেন।

কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুসলমানদের দেহ হইতে সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষতের চিহ্ন এবং অন্তর হইতে ইংরেজ বিদ্বেষ অনেকটা মুছিয়া গিয়া থাকিলেও, শিক্ষিত হিন্দুদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ ও ঘৃণা হ্রাস পায় নাই। বিদ্রোহের শেষের দিকে বিশেষ করিয়া বিপর্যয়ের সূচনায় বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব মুসলমানদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সংগ্রাম হইতে সরিয়া পড়ার পর হইতে হিন্দুরা ক্রমশঃ মুসলমানদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করিতে থাকে। ইহার উত্তরে মুসলমানেরাও তাহাদিগকে আরও বেশী করিয়া পর ভাবিতে এবং সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। এজন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে তাহারা সেদিন সুনজরে দেখিতে পারে নাই। অথচ কংগ্রেসের হিন্দু ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠাতাগণ উদার প্রকৃতিরই লোক ছিলেন। হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানরাও ইহাতে যোগদান করুক, ইহা তাঁহারা ঐকান্তিকভাবে কামনা করিতেন।

দুঃখের বিষয়, মুসলমান চিন্তানায়কগণও তখন দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদের অনুসরণ এবং প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুইটির মধ্যে ইংরেজদের সহিত সহযোগিতার সমর্থক দলেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অপর পক্ষের ন্যায় তাহারাও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমান সন্দেহ পোষণ করিত। দিল্লীর স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন প্রথমোক্ত দলের নেতা। স্বভাবতঃই অনেকে মনে করিয়াছিলেন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি কংগ্রেসের সহিতও জড়িত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ স্বয়ং ইহাতে যোগদান করা দূরের কথা, মুসলমানদিগকেও ইহার ছায়া পর্যন্ত না মাড়াইতে সতর্ক করিয়া দেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় চাকুরী রক্ষা ও পদোন্নতির জন্য স্বদেশবাসীদের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বিদ্রোহের অবসানে বৃটিশ সরকারের অনুকম্পায় স্যার সৈয়দ হন ভারতীয় মুসলমান এবং ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। ইংরেজদের হাতে নিপীড়নের আশঙ্কায় তাহাদের খুব আস্থাভাজন, স্যার সৈয়দের বিরুদ্ধাচরণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান কোন ব্যক্তি এ সময় আগাইয়া আসেন নাই। কংগ্রেস এভাবে কিছুকালের জন্য মুসলমান-বর্জিত একটি সর্ব ভারতীয় হিন্দু প্রতিষ্ঠান হইয়া রহিল। এমন কি প্রগতিশীল মুসলমানদের নেতা জনাব

বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং জনাব রহিমতুল্লাহ্ সায়ানীর যোগদানেও মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটামুটিভাবে কংগ্রেসের প্রতি অনাকৃষ্ট থাকিয়া যায়।

এডুকেশন্যাল কনফারেন্স

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বৎসর পর স্যার সৈয়দ আহমদ 'মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স' স্থাপন করেন। মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহার মাধ্যমেই স্যার সৈয়দ শিক্ষিত মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সমকক্ষতা লাভের পূর্বে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতে থাকেন। স্যার সৈয়দের এই প্রচেষ্টারই নাম আলিগড় আন্দোলন। আলিগড়ে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইতিমধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ এই স্থানটিকেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া লইয়াছিলেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সময় লক্ষ্মৌতে মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের বার্ষিক সভা আহুত হয়। এই অধিবেশনে স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, ইহার আশা-আকাঙ্খা সাধারণ প্রকৃতির নয়, ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের সহিত ইহার সম্পর্ক যতটা ঘনিষ্ঠ ও উত্তম হওয়া উচিত ছিল, ততটা নয়। সর্বোপরি সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি ইহার বিশেষ লক্ষ্যও নাই। সম্মেলনে কংগ্রেসের বিরোধিতাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেসে মুসলমানের সংখ্যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহে স্যার সৈয়দের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়া ইহারা তাঁহার আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না। তদুপরি তাহারা স্যার সৈয়দের এই মতবাদকে বিভ্রান্তিমূলক মনে করিতেন যে পাশ্চত্য শিক্ষায় সমকক্ষতা লাভের পূর্বে কংগ্রেসে যোগদান মুসলমানদের জন্য বাঞ্ছনীয় হইবে না।

তাহারা বলিতেন, সমান সুযোগ-সুবিধালাভ এবং আগ্রহী হইলেও কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা অর্জন কখনও সম্ভবপর নয়, কারণ সংখ্যার প্রাধান্য থাকিয়া যাইবেই।

১৮৯৮ সালের ২৮শে মার্চ স্যার সৈয়দ পরলোকবাসী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর আলিগড় আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এটোয়ার মহসিন

উল্‌ মুল্‌ক নওয়াব সৈয়দ মেহেদী আলি। বিদ্রোহীদের হাতে এটোয়ার পতনের পর তিনি কোম্পানীর অধীনে সামান্য বেতনের কেরানীর পদটি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বিদ্রোহ অবসানের পর তিনি চাকুরীতে পুনর্বহাল হইয়া দ্রুত প্রমোশন পাইতে থাকেন। তাঁহার সর্বশেষ চাকুরী ছিল হায়দরাবাদে। মোটা পেন্সন এবং লম্বা উপাধিসহ তিনি স্যার সৈয়দের জীবদ্দশায় তথা হইতে এটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেস সম্পর্কে তিনিও স্যার সৈয়দের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তিনিও মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীকে কংগ্রেস হইতে দূরে রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

মহসিন-উল্‌ মুলক্‌ বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। কংগ্রেসে মুসলমানদের প্রবেশ রোধ করার জন্য অবশেষে তিনি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় মুসলমান সদস্যগণকে মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহার ফল উভয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শুভ হইয়াছিল। তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট জনাব বদরুদ্দীন তায়েবজীর সহিত সাক্ষাৎপূর্বক ১৯০৩ সালের এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করিতে তাঁহাকে সম্মত করান। জনাব তায়েবজীর যোগদানের পর হইতে আলিগড় আন্দোলনের প্রতি ইংরেজ-বিরোধী এবং কংগ্রেস-সমর্থক মুসলমান নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া শেষ পর্যন্ত আন্তরিক সমর্থনের রূপ পরিগ্রহ করে। তবে ইহাও সত্য যে, এ সময় হইতে কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানেরা উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট হইতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াও স্যার সৈয়দের ন্যায় এক্ষেত্রে ব্যর্থতাই অর্জন করিয়াছিলেন।

সিমলা ডেপুটেশন

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের দাবীর সমর্থনে শ্রী বালকৃষ্ণ গোখেল, শ্রী রমেশ দত্ত প্রমুখ সদস্যগণ ভারতীয় আইন সভায় সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের দাবী জোরের সহিত পেশ করিতে থাকেন। তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মর্লি ইংলণ্ডের কমন্স সভায় ভারতের বাজেট উত্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় উক্ত দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

দূরদর্শী নওয়াব মহসিন-উল. মুল.ক ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া মুসলমানদের দাবী-দাওয়াগুলি ভাইস্‌রয় লর্ড মিণ্টোর নিকট পেশ করিবার জন্য নওয়াব ইমদাদুল মুল.ক ও ভিকার উল্‌-মুল্‌ক নওয়াব মোস্তাক হোসেনের সাহায্যে একখানি স্মারকপত্র রচনা এবং মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করেন। এই ডেপুটেশনে তিনি স্বয়ং, হেকিম আজমল খান, স্যার আলি ইমাম, স্যার মোজাম্মেল উল্লাহ খান, স্যার রফিউদ্দিন আহমদ, স্যার মোহাম্মদ শফি, স্যার আবদুর রহিম, স্যার সলিম উল্লাহ্‌, বিচারপতি শাহেদীন প্রমুখ মুসলিম ভারতের ৩৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে পরামর্শ দানের জন্য আরও বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সিমলায় গমন করেন। কোন ভাইস.রয়ের নিকট এত বড় ডেপুটেশন ইতিপূর্বে বা পরে কখনো যান নাই।

লর্ড মিণ্টো ডেপুটেশনের দাবীগুলি সহানুভূতি সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। মিণ্টো-মর্লি সংস্কার নামে অভিহিত এদেশের শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য জাতীয়তা বিরোধী যে স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন হয় তাহা উপরোক্ত ডেপুটেশনের দাবীরই সাক্ষাৎ ফল। এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দারুণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি এবং অবশেষে দ্বিজাতি থিওরী বা এমন এক অদ্ভুত মতবাদের জন্মদান করে যাহা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমাকেই শুধু নয়, অধিকন্তু মুসলমান সম্প্রদায়কেও দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়া উভয়ের জন্য অশেষ অকল্যাণ সূচিত করিয়াছে।

মুসলিম লীগ

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রবেশ অপ্রত্যাশিত তো নয়ই, বরং একান্ত স্বাভাবিক ছিল। উপরে বলা হইয়াছে, স্যার সৈয়দ আহমদের 'আলিগড় আন্দোলন' মুসলমানদের একটি অংশকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট এবং ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের সহিত শর্তহীন পূর্ণ সহযোগিতার পথে বেশ খানিকটা আগাইয়া লইয়া গিয়াছিল। শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের মাধ্যমে সরকারের নিকট

দাবী-দাওয়া জ্ঞাপনের ব্যাপারে হিন্দুদের সাফল্য, মুষ্টিমেয় মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেও তাহাদের নিজস্ব অনুরূপ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। কিন্তু বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে এই অনুভূতি কার্যে রূপায়িত হইতে পারে না। এজন্য স্যার সৈয়দের নিষেধ সত্ত্বেও মুসলমানদের কেহ কেহ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ইহাকেই হিন্দু ও মুসলমানের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ ও মর্যাদা দানের চেষ্টায় ব্রতী হন। ইঁহাদের মধ্যে জনাব বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং জনাব রহিমত উল্লাহ্ সায়ানীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্যার সৈয়দের শিক্ষা, আদর্শ ও প্রচারণা শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাধারার উপর ইতিমধ্যে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহাদের একটি অংশ কংগ্রেসে যোগদান হইতে বিরত থাকিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের জন্য তাঁহার অলক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। তবে এক্ষেত্রেও স্যার সৈয়দের বিরোধিতার দরুন তাঁহার জীবদ্দশায় ইঁহাদের পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর নওয়াব মহ্সিন-উল্ মুল্ক এই অভাব পূরণের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট মুসলমানদের সহিত পত্রালাপ এবং একটি পরিকল্পনা রচনার ভার তিনি নওয়াব ভিকার উল্ মুল্কের উপর ন্যস্ত করেন। ইঁহারই উদ্যোগে ১৯০১ সালে আলিগড়ে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উপস্থিত নেতৃবর্গ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হন। মহ্সিন-উল মুল্ক সহজে হার মানিতেন না। তিনি ভিকার-উল্ মুল্ককে চেষ্টা চালাইয়া যাইতে উৎসাহিত করিতে থাকেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেও কংগ্রেস-সমর্থক নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যে সকল দেশপ্রেমিক মুসলমান আলিগড় আন্দোলনকে অত্যন্ত সন্দেহ ও অনেকটা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতে-ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নওয়াব মহসিন-উল্ মুল্ককে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। তবু আরও দুইটি বৎসর কাটিয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯০০ সালে যুক্ত প্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার এণ্টনী ম্যাক্ডোনেল এবং নওয়াব মহ্সিন-উল্ মুল্কের মধ্যে উর্দু-হিন্দি প্রশ্নে মতবিরোধ তীব্র হইয়া উঠিলে উর্দুভাষী

উত্তর ভারতের মুসলমানদের নিকট একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব আরও বড় হইয়া দেখা দেয়। স্যার এণ্টনী ম্যাকডোনেল আদালতে উর্দুর পরিবর্তে হিন্দি ব্যবহারের আদেশ দান করিয়াছিলেন। সুচতুর মহসিন-উল্ মুল্ক এই সুযোগ হাতছাড়া করেন নাই।

এদিকে বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতি প্রবর্তনের আংশিক দায়িত্ব বাংলার হিন্দুরা অনর্থক মুসলমানদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাহাদেরও বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকায়, বাংলার মুসলমানরা অনেকটা জেদের বশবর্তী হইয়াই তাহাদের তথাকথিত নবলব্ধ অধিকার রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। প্রধানতঃ, উপরোক্ত দুইটি কারণে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা আশু ও অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়।

সিমলায় প্রেরিত আগা খান ডেপুটেশনের অন্যতম সদস্য ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র আমন্ত্রণক্রমে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। স্মরণ থাকে যে কনফারেন্সের অধিবেশন এক এক বৎসর এক এক প্রদেশে আহূত হইত। অধিবেশনের শেষে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মহসিন-উল মুল্‌কের প্রস্তাবক্রমে বহু প্রতীক্ষিত মুসলিম লীগ জন্মলাভ করে। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন নওয়াব ভিকার-উল-মুল্‌ক। ইহার গঠনতন্ত্র রচনার ভার অর্পিত হয় তাঁহার ও নওয়াব ভিকার-উল মুল্‌কের উপর। কিন্তু ১৯০৭ সালে মহসিন উল মুল্‌ক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, ভিকার-উল মুল্‌ক একাকী এই দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় ঘরোয়া বৈঠকে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাব অনুসারে পরবর্তী বৎসর স্যার পীর ভাইর সভাপতিত্বে করাচীর অধিবেশনে স্থির হয়, আগা খান লীগের স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন। তবে বার্ষিক অধিবেশনে অপর কোন ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর এরূপে লীগ অল্প কয়েক ব্যক্তির একটি পকেট-প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিরাজ করে। মওলানা মোহাম্মদ আলিই ইহাকে কোটারীমুক্ত করিয়া ১৯১২ সালে ইহার দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ইহা আবার নওয়াব, খান বাহাদুর, খান সাহেব এবং সরকারের তল্পীবাহকদের কবলিত হইয়া পড়ে। পুরোপুরিভাবে ইহার আর পুনরুদ্ধার ঘটে নাই।

বিপ্লব আন্দোলন

বিনীত আবেদন-নিবেদনের মারফৎ অনিচ্ছুক বিদেশীয়দের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা যে সম্ভবপর নয়, তাহা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে একদল ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু যুবকের নিকট দিবা-লোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এদেশবাসীর নিম্নতম দাবী-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে কংগ্রেসের ব্যর্থতায় তাঁহারা ইহার উপর ক্রমেই আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। তবু চরম পন্থা গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেসের তোষণনীতির আমূল পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ নেতৃবর্গকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংখ্যায় কম ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সকল যুক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবীণদের ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হইয়া যাইতে থাকে। অগত্যা তাঁহারা ইংরাজী বক্তৃতা-বিলাসী প্রবীণ দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ব্রতী হইবেন স্থির করেন। এই বন্ধুর পথে সাফল্য অপেক্ষা-অসাফল্যের সম্ভাবনাই অধিক, ইহা তাঁহারা জানিতেন। কিন্তু শাসনক্ষেত্রে আংশিক ক্ষমতা পর্যন্ত হস্তান্তরের প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব এবং কংগ্রেসের ব্যর্থ তোষণনীতি তাঁহাদিগকে শেষ পর্যন্ত এই পথই গ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। বলা অনাবশ্যক, কংগ্রেস হইতে ইহাদের স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণের ব্যাপারটিকে সেই সময় কেহ বিশেষ কোন গুরুত্বই দান করেন নাই।

বিচ্ছিন্ন কয়েকটি হত্যাকাণ্ড দ্বারা তাঁহারা বিশাল ভারতবর্ষের দাসত্ব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন কিম্বা গোটা কয়েক বোমা ও পিস্তলের ভয়ে ইংরেজরা তাঁহাদের হাতে নিজেদের ভারী ওজনের মারণাস্ত্রগুলি তুলিয়া দিয়া তাঁহাদেরই কৃপাভিখারী হইয়া এদেশে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে থাকিবেন অথবা বোচ্‌কা-বুচকি লইয়া সাগর পাড়ি দিবেন, এমন উদ্ভট কল্পনা অতি বড় আশাবাদীর মনেও জাগে নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের সদ্য-জাগ্রত জনমতকে যাঁহারা নির্মমভাবে পদদলিত করিয়া চলিয়াছিলেন, ভারতবাসীদের সদিচ্ছার কোন মূল্য আছে বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেন না, বন্দুক-কামানের ভাষায় যাঁহারা এদেশবাসীদের দাবী সম্বলিত আবেদন-নিবেদনের উত্তর দান করিতেন, তাঁহাদিগকে একটা শিক্ষাদানের

ইচ্ছা ক্রমেই ইঁহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এ কারণেই ফলাফলের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের মধ্যে না গিয়া তাঁহারা বিপ্লবের পথটি বাছিয়া লইয়াছিলেন।

ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে বিপ্লব-আন্দোলন ছিল এই প্রথম। ইতিপূর্বে পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধ কালব্যাপী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে যে বিপ্লব-আন্দোলন ইংরেজদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আগাগোড়ায় ছিলেন মুজাহিদগণ। কিন্তু তাহারা আস্থাবান ছিলেন সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের উপর—সন্ত্রাসবাদের উপর নয়। এজন্ত তাহারা ব্যক্তি-বিশেষের হত্যার উপর কোন সময়ই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। অন্য পক্ষে হিন্দু যুবকগণ ব্যক্তি বিশেষের হত্যার উপর আরোপ করিলেন সমস্ত গুরুত্ব। কিন্তু তাহা হইলেও গোপনীয়তা রক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও ইহার ব্যবহারবিধি শিক্ষা, সাঙ্কেতিক ভাষায় পত্রালাপ প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা মুজাহিদগণেরই কার্যধারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আম্বালা, পাটনা, মালদহ, রাজশাহী, রাজমহল প্রভৃতি বহু জায়গায় বিভিন্ন সময় মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহের যে সকল মামলা আনিয়াছিলেন, উহাদের শুনানীর সময় বহু গোপন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী হিন্দু যুবকগণ তাহা হইতে নিজেদের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে ত্রুটি করেন নাই। এ কারণে পরবর্তীকালে কেহ কেহ ইহাদিগকে মুজাহিদগণের 'হিন্দু অনুজ' আখ্যা দিয়াছিলেন। মুজাহিদগণের আদর্শ ছিল মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম। পক্ষান্তরে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ হইল মুক্ত ভারতে রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ধর্মকে ভিত্তি করিয়া জেহাদ এবং সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে হিন্দুরা এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে মুসলমানরা অংশ গ্রহণ করে নাই।

সর্ব ভারতীয় আকারে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের গোড়া পত্তনের পূর্বেই হঠাৎ দক্ষিণাত্যে মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দেয়। ইহা নিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্য বৃটিশ সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে যথাক্রমে মিঃ র‍্যাণ্ড ও মিঃ আয়ার্স্ট হিন্দু সমাজ, বিশেষ করিয়া হিন্দু নারীদের সম্পর্কে অশোভন এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়া হিন্দুদের মনে দারুণ আঘাত

হানেন। ইহার ফলে সমগ্র দক্ষিণাত্যে বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র-প্রধান অঞ্চলে ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক ভ্রাতৃদ্বয় ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত দুইজন ইংরেজের প্রাণনাশের সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জুবিলী উপলক্ষে ১৮৯৭ সালে সেই প্রতীক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হয়। উৎসবের পর বোম্বাইয়ের লাটভবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় মিঃ র‍্যাণ্ড ও মিঃ আয়ার্স্ট পথে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে প্রাণ হারান। হিন্দু-সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক ইহাই প্রথম রাজনৈতিক হত্যা। ইহার কিছুদিন পর আরও দুইটি হত্যা সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদ্বয় ছিল ভারতীয়। ইহারা মিঃ র‍্যাণ্ড ও মিঃ আয়ার্স্টের হত্যাকারী দামোদর চাপেকারকে ধরাইয়া দিয়াছিল। বিচারে দামোদরের ফাঁসি হয়।

উপরোক্ত চারিটি হত্যাকাণ্ডের পর বৃটিশ সরকার পুনা, বোম্বাই, নাসিক প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক খানাতল্লাসী চালাইয়া কতিপয় যুবককে গ্রেফ্তার করেন। তন্মধ্যে চারিজনের ফাঁসি এবং একজন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অন্তরীণ ও মুচলেকায় আবদ্ধ রাখা হয় বেশ কিছু সংখ্যক যুবককে।

শ্রী বিনায়ক সাভারকর

কাথিয়াবাড়ের শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি 'ইণ্ডিয়া হোমরুল সোসাইটি' নাম দিয়া ১৯০৫ সালে বিলাতে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকর নামক জনৈক মহারাষ্ট্রী যুবক উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে ইংলণ্ড গমন করেন। তিনি ইণ্ডিয়া হোমরুল সোসাইটির কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে থাকায় ১৯০৯ সালে উহার পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া শ্যামজী প্যারিসে চলিয়া যান। শ্যামজীর উপর বিলাতের পুলিশ সন্তুষ্ট ছিল না। বিলাত গমনের পূর্বে বিনায়ক দামোদর সাভারকর নাসিক শহরে 'অভিনব ভারত সঙ্ঘ' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের

বিষয়, সর্বাগ্রে দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়রে ইহারই আদর্শে "নব ভারত সঙ্ঘ" নামে অপর একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

ঠিক সে বৎসরই রাজদ্রোহমূলক গ্রন্থ রচনার অভিযোগে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ সাভারকর নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। শ্রী মদন লাল ধিংড়া বিলাতে ইণ্ডিয়া হোমরুল সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বিনায়ক সাভারকরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গণেশ সাভারকরের দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশের সংবাদ বিলাতে পৌঁছিলে, মদন লাল ধিংড়া ইংরেজের উপর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হন। লণ্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের একটি সভায় মদন লাল তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড মর্লির এডিকং স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলীকে রিভলভারের গুলীতে হত্যা করেন। অপর এক ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে নিহত হইয়াছিল। বিচারে মদন লালের ফাঁসি হয়। রাজনৈতিক কারণে বিলাতে ইহাই বোধহয় প্রথম ভারতবাসীর ফাঁসি।

ইংরেজদের হাতে নির্যাতনের আশঙ্কা করিয়া ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়গণ মদন লালের কার্যের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ক্যাক্সটন হলে একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় উক্ত মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বিনায়ক সাভারকর উহার তীব্র বিরোধিতা করেন। বৃটিশ সরকার এই অপরাধে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া জাহাজযোগে ভারতবর্ষ অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু জাহাজখানি ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের নিকটস্থ হইলে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। সাঁতার কাটিয়া ফ্রান্সের তীরে উপনীত হওয়া মাত্রই ফরাসী পুলিশ তাঁহাকে বৃটিশ পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। বন্দী অবস্থায় ভারতবর্ষে আনীত হইলে পর তাহারা বে-আইনীভাবে বোম্বাইয়ের আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করে। রাজদ্রোহের জন্য সাভারকরের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। দ্বীপান্তরেই এইরূপে একে একে সাভারকরের চৌদ্দটি বৎসর কাটিয়া যায়।

প্রবাসী হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে সাভারকরই সর্বপ্রথম দেশপ্রেমের জন্য ভারতে দণ্ডিত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে বিলাতী কাপড় দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার

যাঁহাকে মামলা পরিচালনার জন্য আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনিই ভারতের প্রথম বিপ্লবী যাঁহার জীবনী সম্বলিত বই সরকার কর্তৃক বাজেয়াফত হইয়াছিল। তিনিই ভারতের একমাত্র কবি যিনি কাগজ কলমের অভাবে কারাগারের দেওয়ালে অঙ্গার দ্বারা কয়েক হাজার লাইন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ভারতীয় লেখক যাঁহার পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল। দ্বীপান্তরে অবস্থানকালে তাঁহার বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব মুসলিম-বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাবলী ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি করে। ইহা আরও কতিপয় বিপ্লবী হিন্দুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্থলে পাঞ্জাবের কট্টর বিপ্লবী ভাই পরমানন্দের নাম স্মরণ করা যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্রের কতিপয় যুবককে ফাঁসি দিয়া, কিছু সংখ্যককে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠাইয়া এবং বহুজনকে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়াই বৃটিশ সরকার ক্ষান্ত হন নাই। রাজদ্রোহের অভিযোগে 'কাল', 'বিহারী' এবং 'কেশরী' পত্রিকা সরকারের কোপানলে পতিত হইয়া এ সময় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা ছাড়া 'কেশরী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। মহারাষ্ট্রের অপর দুইজন মনীষী রাণাড়ে এবং গোখেলের ন্যায় ইনিও ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত।

এদিকে বিনায়ক সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ সাভারকরের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারক মিঃ জ্যাক্সন কিছুদিনের মধ্যে আততায়ীর গুলী-বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারান। এই হত্যার দায়ে তিনজনের ফাঁসি হয়। ইহা ছাড়া ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিলে সরকার বহু লোকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা আনয়ন করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ২৭ জন বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহা 'নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত।

ইংরাজী শিক্ষার দিক দিয়া বাংলার হিন্দুরা তখনও সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বাংলার দান ছিল সর্বাধিক।

সুতরাং সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে বাংলার স্থানই যে সর্বোচ্চ থাকিবে, স্বভাবতঃ ইহাই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র সেই মর্যাদা হইতে বাংলাকে বহু দিন বঞ্চিত রাখে। ইহার কারণ, বাংলার বিপ্লববাদীরা গোড়ার দিকে সর্ব ভারতীয় দূরে থাকুক্, কোন প্রাদেশিক নেতার সমর্থন পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই। তা'ছাড়া শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের এক বৃহদাংশ বৃটিশের গোলামীকে উহার পরম ও চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। অপর পক্ষে লোকমান্য তিলক এবং আরও কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবিগণ নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছিলেন। 'কেশরী' পত্রিকা দস্তুরমত বিপ্লববাদ সমর্থন করিতেন এবং উহার সমর্থন সূচক প্রবন্ধাদি ছাপাইতেন।

বাংলায় কে সর্বপ্রথম বিপ্লবের আদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে একই সময় এই প্রদেশে কয়েকটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাদের কিন্তু কোনটিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। শ্রী যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও ব্যারিস্টার শ্রী প্রমথ মিত্রকে বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের অগ্রদূত বলা হয়। তাঁহারা ১৯০৩ সালে কলিকাতায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। শ্রী অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বিদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া ইহাতেই যোগ দেন। ইঁহাদের চেষ্টায় অল্প কালের মধ্যে বাংলার কয়েকটি জেলায় শাখা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ পশ্চিম ভারতে অবস্থিত তাঁহার চাকুরীস্থল বরোদা রাজ্য এবং প্রবাসী বাঙ্গালীদের আরও কেহ কেহ বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে ইঁহাদিগকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে থাকেন।

বঙ্গভঙ্গ

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় বৃটিশ সরকার অনেক দিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড কার্জন অবশেষে ভারত সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গ

বিভাগের অনুকুলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ পাওয়া মাত্রই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর হইয়া উঠে। দূর মফঃস্বলেও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিয়া অসংখ্য সভা-সমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইতে থাকে। কিন্তু লর্ড কার্জন তাঁহার সিদ্ধান্তে অচল অটল রহিলেন। অধিকন্তু এত বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও বড়লাট সদর্পে ঘোষণা করিয়া দিলেন, তাঁহার সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হইবে না এবং ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর হইতে পূর্ব বাংলা ও আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবে। বড়লাটের এই সদম্ভ ঘোষণার উত্তরে বাঙ্গালী হিন্দুরাও অনুরূপ দর্পের সহিত জানান যে, তাঁহারা বঙ্গভঙ্গ নীতি কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবেন নাই।

শাসনকার্যে সুবিধা এবং ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার তাগিদে লর্ড কার্জন প্রায় একই সময় পাঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র অংশ সীমান্ত এলাকার সহিত জুড়িয়া দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তথায় তেমন কোন প্রতিবাদ হয় না।

বঙ্গভঙ্গের অনুকুলে যতটা যুক্তি ছিল, ইহার বিপক্ষে ততটা ছিল না। এমতাবস্থায় লর্ড কার্জন যদি ধীরে সুস্থে এ ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গোটা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইত কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। লর্ড কার্জনের গোঁয়ার্তমীর ফলে বাঙ্গালী হিন্দুদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে থাকে যে, তাহাদিগকে দুর্বল করার জন্যই তাহাদের একাংশকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং অপর অংশকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লর্ড কার্জন প্রশ্নের এই দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা বলা শক্ত।

প্রথম ভুলের সংশোধনের চেষ্টা করিয়া এ সময় লর্ড কার্জন আর একটি ভুল করিয়া বসেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি বৃটিশের সেই সনাতন ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ-পূর্বক অজ্ঞ মুসলমান সমাজের কাঁধে ভর করেন। মুসলমানদিগকে বুঝান হইতে লাগিল, পূর্ববঙ্গ ও আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে

হওয়ায় সংখ্যাগুরু হিসাবে তাহাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা যে একটা ভাওতা এবং মুসলমানকে দিয়া হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার একটা অপকৌশল মাত্র, তাহা মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর এক অংশ সহজে বুঝিয়া লইয়া লর্ড কার্জনের ফাঁদ হইতে দূরে সরিয়া রহিল।

অনন্যোপায় হইয়া তিনি ঢাকার জমিদার নওয়াব খাজা স্যার সলিম উল্লাহ্‌র সাহায্য গ্রহণ করেন। বিশাল জমিদারীর মালিক হিসাবে ইনি স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া কিছু সংখ্যক মুসলমানের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের মধ্যেই তাহাদের উন্নতি এবং সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ইহার জওয়াবে ব্যারিস্টার এ. রসুল, মওলবী লিয়াকৎ হোসেন, মওলবী আবুল কাসেম প্রমুখ মুসলিম জননায়কগণ উক্ত নওয়াবের জমিদারী এবং নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসামের সরকারী চাকুরীতে নবনিযুক্ত হিন্দু কর্মচারীদের সংখ্যার উল্লেখ করিতে থাকিলে, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুসলমানরা লর্ড কার্জন এবং পূর্ব বঙ্গ ও আসামের লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের মুসলিম-প্রীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার দল হইতে আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িতে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞ মুসলমানদের উপর আরও কয়েক বৎসর নওয়াব সলিম উল্লাহ্‌র প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকে। সরকারী উস্কানীর ফলে এ সময় বাংলার কোন কোন জেলায় ছোট-খাটো আকারে একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও সংঘটিত হয়। এ সকল দাঙ্গার দরুন অজ্ঞ মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, সরকারের হাত অধিকতর শক্তিশালী, বঙ্গভঙ্গ-সমর্থক মুসলমান নেতৃবর্গের খেতাব লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর এবং হিন্দু বিপ্লবীদের দল দ্রুত ভারী হইয়া উঠিতে থাকে। বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জনের মাধ্যমে হিন্দু জনসাধারণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করিয়া তোলে।

আন্দোলনের বিস্তৃতি

মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশের বিরোধিতা এবং সরকারী নির্যাতন সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে

বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। নেতৃস্থানীয় বিপ্লববাদীরা একটু দূরে থাকিয়া ভাবপ্রবণ ছাত্র সমাজ হইতে সদস্য সংগ্রহপূর্বক তাহাদের দলের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ্যের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। বিপ্লবীরা তাঁহার নিকট নূতন প্রেরণা লাভ করেন। শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার সাহায্যে দেশের সর্বত্র বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে থাকেন। ১৯০৭ সালে আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রায় শুনিবার জন্য সেদিন আদালতে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রী বিপিন চন্দ্র ছিলেন সেই মামলার একজন প্রধান সাক্ষী। কিন্তু তিনি আদালতে শপথ গ্রহণ করিতে কিম্বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী না হওয়ায়, মামলাটি ফাঁসিয়া যায়। ইহার ফলেই তাঁহাকে আদালত অবমাননার মামলায় শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আদালতের সম্মুখে জনতা নিয়ন্ত্রণের সময় মিঃ ই. বি. হুই নামক একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুশীল নামক একজন বিপ্লবীকে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারে। বীরবাহু সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহার গায়ের সমস্ত শক্তি লইয়া মিঃ হুইকে পাল্টা ঘুষি মারিয়া তাহার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। ঘটনাস্থলেই সুশীল ধৃত হইয়া বিচারের জন্য কলিকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে অভিযুক্ত হন। পর দিবস ম্যাজিস্ট্রেট তাহার প্রতি পনর ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সহস্র সহস্র নাগরিক এবং দেশী বিদেশী বহু পুলিশের উপস্থিতিতে সুশীল সেন মিঃ হুইকে ঘুষি মারিয়া যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দেন, তাহাতেই উপস্থিত বেশীর ভাগ লোক শুধু যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এমন নয়, তাহারা বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ, বিকল্পে উহা সমর্থন করার বিষয়ও চিন্তা করিতে করিতে সেদিন বাড়ী ফিরিয়াছিল। বেত্রাঘাতের পর সুশীল জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন।

যুগান্তর ও অনুশীলন দল

কলিকাতা এবং ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ বিপ্লব-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার বিপ্লববাদীরা 'যুগান্তর' এবং ঢাকার বিপ্লবীবাদীরা 'অনুশীলন' নাম দিয়া তাহাদের সমিতি গঠন করেন। সাধারণতঃ এই দুইটি সমিতির সদস্যগণই বোমা তৈরী ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিতেন। ইহার পর অন্যান্য নামেও মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উহারা কোন সময় বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। কারণ, অস্ত্রশস্ত্রের জন্য সব সময় তাহাদিগকে কলিকাতার উপর নির্ভর করিতে হইত। কলিকাতা বন্দরে আগত বিদেশীয় জাহাজের লোকজনের নিকট হইতে সাধারণতঃ উচ্চ মূল্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইত। সময় সময় ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগর হইতেও পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদি খরিদ করা হইত।

অনভিজ্ঞতার দরুন ব্যর্থতার ভিতর দিয়া বাংলার বিপ্লববাদীরা তাহাদের আদর্শ রূপায়নে অগ্রসর হন। এ কারণে তাহারা পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গের লেঃ গভর্ণর স্যার ফ্রেজারকে বোমার আঘাতে হত্যার চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারেন না। অবশ্য তাহাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট পশ্চিমবঙ্গের লেঃ গভর্ণরের ট্রেনের কয়েকখানি বগি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিপ্লবাদীগণকে ধরিতে না পারিয়া সরকার রেলের কয়েকজন নিরপরাধ কুলীকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের দ্বারা স্বীকারোক্তি করাইয়া তাহাদের লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। আদালতে ইহারা তাহাদিগকে শেখানো জবানবন্দীতে বলে যে, কতিপয় অজ্ঞাত-পরিচয় যুবকের প্ররোচনা এবং অর্থ প্রাপ্তির লোভে তাহারা এই ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হইয়াছিল।

এ সময় কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডকেও হত্যার চেষ্টা-চরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। মিঃ কিংসফোর্ডকে বাংলায় রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া কর্তৃপক্ষ অতঃপর তাঁহাকে মোজফ্‌ফরপুরে বদলী করিয়া পাঠান। কিন্তু মোজফ্‌ফরপুরেও মিঃ কিংসফোর্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলেন না। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের

শেষ দিন প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম নামক দুই জন বাঙ্গালী যুবক মোজফ্ফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডের বাংলার সম্মুখে রাত্রি আটটার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমার আঘাতে গাড়ীখানিতে তৎক্ষণাৎ আগুন ধরিয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ গাড়ীখানি ছিল খ্যাতনামা ইংরেজ ব্যারিস্টার মিঃ কেনেডির—মিঃ কিংসফোর্ডের নয়। গাড়ীতে সে সময় মিঃ কেনেডির পত্নী ও তাঁহাদের এক কন্যা ছিল। বোমার আঘাতে কন্যাটি ঘটনাস্থলেই এবং মিসেস কেনেডি দুইদিন পর হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বোমা নিক্ষেপের পর প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক হইয়া মোজফ্ফরপুর ত্যাগ করেন। পরদিবস সকালে মোজফ্ফরপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে একটি রেলওয়ে স্টেশনে মুদীর দোকানে বিশ্রাম গ্রহণের সময় ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। প্রফুল্ল চাকী মোজফ্ফরপুর হইতে সমস্তিপুর পৌঁছিয়া মোকামা ঘাটের উদ্দেশ্যে যেই গাড়ীতে উঠেন সেই গাড়ীতে শ্রী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুলিশের জনৈক সাব ইন্‌স্পেক্টর সাধারণ পোশাকে অন্যত্র যাইতেছিলেন। প্রফুল্ল চাকীর হাবভাব ও নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি মোজফ্ফরপুরের ঘটনার কথা ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হন এবং এমন হাবভাব দেখাইতে থাকেন যাহাতে প্রফুল্ল চাকী বুঝিতে পারেন, তিনিও একজন দেশপ্রেমিক। নানা আলাপ-আলোচনায় তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়তর হওয়ায় তিনি মোকামা ঘাটে পৌঁছিয়া প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেফ্তারের জন্য অগ্রসর হইতেই, প্রফুল্ল চাকী পিস্তল হস্তে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু নন্দলালের ডাকে পুলিশের লোকজন তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রফুল্ল চাকী অবশেষে স্বীয় পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি

মোজফ্ফরপুরে মিঃ কার্ণডফ্ নামক জনৈক অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে ক্ষুদিরামের বিচার হয়। বিচারক তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের

আদেশ দেন। হাইকোর্টে যথারীতি আপীল করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ১১ই আগস্ট মোজফ্‌ফরপুর জেলেই তাহার ফাঁসি হইয়া যায়। হ্যাঙ্গম্যান (জল্লাদ) যখন তাঁহার গলায় ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দিতেছিল, তখন তিনি স্মিতহাস্যে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন, কেন ফাঁসির দড়িতে এত মোম দেওয়া হয়। জল্লাদ কর্তৃপক্ষের ভয়ে ক্ষুদিরামের প্রশ্নটির কোন উত্তর দেয় নাই। ক্ষুদিরামের ন্যায় আরও কিছু সংখ্যক বিপ্লবী ফাঁসিমঞ্চে অনুরূপ মনোবল প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার নামে রচিত একাধিক গান এখনও গীত হইতে শোনা যায়।

প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর বাংলার বিপ্লব-আন্দোলন একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিপ্লব-আন্দোলনে মহারাষ্ট্রের স্থান দুই নম্বরে নামিয়া যায়।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় শ্রী উপেন্দ্র নাথ সেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন: "জেলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুই দিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার আড় দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তার শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারিজন পুলিশ। আমাদের দেখিয়া ক্ষুদিরাম একটু হাসিলেন। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাঁহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হয়। তারপর একটি সবুজ রংয়ের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁস লাগাইয়া দেওয়া হইল। মিঃ উডম্যান ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি হাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িল, তারপর সব স্থির।" এইরূপে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা সূচিত করেন। প্রফুল্ল চাকীর উপর কোন গান রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু ক্ষুদিরামের উপর রচিত 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি' গানটি এখনও শ্রদ্ধার সহিত গীত হইয়া থাকে।

বাংলায় বিপ্লব-আন্দোলনের প্রথম শহীদ শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী ১৮৮৮ সালে বগুড়ার বিহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রী রাজ নারায়ণ চাকী। মাইনর পরীক্ষা পাসের পর তিনি রংপুর জেলা স্কুল ত্যাগ করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। স্কুলের ছাত্ররা প্রফুল্লকে তাহাদের নেতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। কোন এক উপলক্ষে শ্রী বারীন্দ্র ঘোষের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিবার পর তিনি কলিকাতা যাইয়া একটি গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। কলিকাতায় তিনি বোমা প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব বঙ্গের লেঃ গভর্ণর স্যার ফুলারকে যে কয়বার হত্যার চেষ্টা হয়, প্রত্যেকবারই তিনি তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লববাদীরা একবার সংবাদ পান, স্যার ফুলারের ট্রেন ধূবড়ী হইতে রংপুর হইয়া কলিকাতায় যাইবে। তখনই স্থির হয়, রংপুর স্টেশনের কিছু দূরে ট্রেনখানি ধ্বংস করা হইবে। তদনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে লাইনের নীচে ব্যাটারীযুক্ত বোমা স্থাপন করা হয়। এতদসত্ত্বেও বোমা যদি না ফাটে তবু যেন স্যার ফুলারকে হত্যা করা যায়, সেই ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হইয়াছিল। বোমা না ফাটিলে এবং ট্রেনখানি নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিয়া আসিলে প্রফুল্ল চাকী ট্রেনখানিকে লাল আলো দেখাইয়া থামাইবেন এবং রিভলবার সহ ট্রেনের কামরায় প্রবেশ করিয়া স্যার ফুলারকে হত্যা করিবেন ঠিক হয়। কিন্তু স্যার ফুলারকে হত্যার এই শেষ চেষ্টাও পণ্ড হইয়া যায়। গভর্ণর ধূবড়ী হইতে রংপুর না গিয়া ভিন্ন পথে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের পিতা শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ বসু নাড়াজোল রাজ এস্টেটের একজন তহশীলদার ছিলেন। ১৮৮৯ সালে মেদিনীপুর জেলার হবিবপুরে তাহার জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ক্ষুদিরাম তাহার ভগিনীপতি শ্রী অমৃত লাল রায়ের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অমৃত লাল রায় মেদিনীপুর জজকোর্টের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। ক্ষুদিরাম ১৯০৫ সালে মেদিনীপুর জেলার বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে যান। কথিত আছে, ১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত শিল্প প্রদর্শনীতে 'সোনার বাংলা' নামক এক খানি রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা বিতরণের সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিতে উদ্যত হইলে ক্ষুদিরাম তাহাকে এক ঘুষি মারেন। উত্তেজিত পুলিশ

তাহাকে প্রতি-আক্রমণ করিতে যাইবে এমন সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ বসু পুলিশকে বলেন, ইনি ডেপুটি বাবুর পুত্র। ডেপুটি বাবুর নামে পুলিশের উত্তেজনা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং সমস্ত পুলিশ ক্ষুদিরামকে আর কিছুই বলে না। পরে যখন ব্যাপারটি জানা-জানি হইয়া পড়ে, তখন সরকারী অফিসে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কেরিনীগিরী চাকুরী চলিয়া যায়। স্বনামখ্যাত বিপ্লবী হেমন্ত দাস ও সত্যেন্দ্র নাথের সুপারিশ অনুসারেই মিঃ কিংসফোর্ডের হত্যার জন্য তাহাকে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গী মনোনীত করা হইয়াছিল। মোজাফ্‌ফরপুর গমনের পূর্বে গুপ্ত সমিতির অর্থাভাব দূরীকরণার্থ একবার তিনি এক ডাক হরকরার মেইল ব্যাগ ছিনাইয়া লইয়াছিলেন।

মোজফ্‌ফরপুরের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সময় গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লব-বাদীদের আড্ডা, কলিকাতার মুরারীপুকুর বাগানের সন্ধান পায়। ব্যাপক খানাতল্লাশীর ফলে পিস্তল, বোমা, বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং কিছু চিঠিপত্র তথায় পুলিশের হস্তগত হয়। এই উপলক্ষে পুলিশ শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবিগণকে গ্রেফ্‌তার করে। কলিকাতার বাহিরেও কয়েকজনকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। এইরূপে ধৃত ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪ জন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সকলকে অভিযুক্ত করা হয়। মামলা পরিচালনার জন্য সরকার পক্ষে স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ নর্টন এবং অভিযুক্তদের পক্ষে ব্যারিস্টার শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট নামক শ্রী অরবিন্দ ঘোষের জনৈক সহপাঠীর এজলাসে প্রায় এক বৎসরকাল মামলাটির শুনানী চলিয়াছিল। অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় বিচারে তিনি খালাস পান। বিচার চালু থাকাবস্থায় শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত জেলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামক জনৈক বিশ্বাস-ঘাতক বিপ্লবীকে হত্যা করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। শ্রী বারীন্দ্র কুমার ও উল্লাসকর দত্ত প্রাণদণ্ডে, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সহ আরও ৯ জন যাব-জ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং বাকী সকলে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টে আপীলে বারীন্দ্র কুমার ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ডাদেশ রদ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিণত হয়।

মামলা পরিচালনার ব্যাপারে মিঃ নর্টনকে সাহায্য করিবার জন্য সরকারি উকিল শ্রী আশুতোষ বিশ্বাসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ কারণে বিপ্লববাদীরা তাঁহারও উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। আশুতোষ বিশ্বাস ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে পুলিশ কোর্ট হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় জনৈক বিপ্লববাদীর গুলীর আঘাতে নিহত হন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্র শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং পণ্ডিত নেহেরুর মন্ত্রিসভার সদস্য হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের হত্যা

অবিভক্ত বাংলার অন্যতম মন্ত্রী শ্রী তুলশী চন্দ্র গোস্বামী হুগলীর যেই বিখ্যাত জমিদার পরিবারের লোক ছিলেন, সেই পরিবারেই নরেন্দ্র নাথ গোস্বামী নামক একটি সুদর্শন যুবক স্বেচ্ছায় বিপ্লবী দলে যোগদান করিয়াছিলেন। ধনশালী এই জমিদারপুত্রকে দলে পাইয়া বিপ্লবীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কারণ, গুপ্ত সমিতির জন্য অনেক চড়া দামে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ে অর্থের অভাব ঘটিত। নরেন্দ্র গোস্বামীর অর্থসাহায্যে বিপ্লবীরা সেই অভাব দুর করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল। অন্যান্যদের সঙ্গে নরেন্দ্র গোস্বামীও আলীপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জেলের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি মুক্তির বিনিময়ে রাজসাক্ষী হইতে স্বীকৃত হন। নরেন্দ্রনাথের হাবভাব হইতে তাহার সহকর্মীদের মনে সন্দেহ জাগে। গোপন তথ্যাদি প্রকাশ করিবার পূর্বেই তাই তাহাদের কেহ কেহ জেলের মধ্যেই তাহাকে হত্যার সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সহিত ইহাদের ব্যবহার এবং কথাবার্তায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সরকার তাহাকে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করিয়া দুইজন ইউরোপীয় কয়েদীকে তাহার দেহরক্ষী করিয়া দেন। ইহাতে বিপ্লবীদের সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়।

মেদিনীপুরের স্বনামধন্য বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ এ সময় অসুস্থ অবস্থায় জেলা হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি হেমচন্দ্র দাসের সহিত

পরামর্শক্রমে অতিকষ্টে জেলের মধ্যে দুইটি পিস্তল আনাইয়া লইলেন। অতঃপর তিনি নরেন্দ্র গোস্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাহাকে বুঝিতে দেন, তিনিও তাহার ন্যায় মুক্তির বিনিময়ে রাজসাক্ষী হইবেন স্থির করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছার কথা নরেন্দ্রনাথ পুলিশকে জানাইয়া দেন। পুলিশ এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়। আদালতে কি বলিতে হইবে না হইবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রায়ই নরেন্দ্র গোস্বামীকে জেল হাসপাতালে ডাকিয়া পাঠাইতেন।

হত্যার কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ চন্দননগরে বিপ্লবী শ্রী কানাইলাল দত্তকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করা হইবে স্থিরীকৃত হয়। ৩১শে আগস্ট কানাই লাল দত্ত পেট ব্যথার ভান করিয়া জেল-হাসপাতালে ভর্তি হন। পর দিবস সকালে সত্যেন্দ্রনাথ গোপন পরামর্শের জন্য নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান। তদনুসারে দেহরক্ষী মিঃ হিগিন্সকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথ হাসপাতালে যান। নরেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ গোপন আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া দেহরক্ষী একটু দূরে সরিয়া যান। সুযোগ বুঝিয়া সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার পকেটস্থ পিস্তলের ট্রিগার টিপিয়া দেন। প্রথম গুলীর আঘাত খাইয়াই নরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেন। ইত্যবসরে মিঃ হিগিন্স ছুটিয়া আসিয়া সত্যেন্দ্রনাথের হাত হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইবার জন্য তাহার সহিত ধবস্তাধবস্তি শুরু করিয়া দেন। পিস্তল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা হইতে পারে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমান সত্যেন্দ্রনাথ পূর্বেই নিজের কোমরের সহিত উহাকে শক্তভাবে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। হঠাৎ একটি গুলী হিগিন্সের হাতে লাগিতেই তিনিও ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহিরের দিকে দৌড় দেন।

কানাইলাল দত্ত এ সময় একটু দূরে ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পলাইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি হাসপাতালের ফটকের দিকে দ্রুত ছুটিয়া গেলেন। এবার উভয়ে একযোগে নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া আবার গুলী ছুড়িলেন। সর্বমোট চারিটি গুলীবিদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রনাথ সে স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন।

নরেন্দ্রনাথের হত্যার জন্য যথাসময়ে উভয়ের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিচারে কানাইলাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অধিকাংশ জুরি সত্যেন্দ্র-

নাথকে নির্দোষ ঘোষণা করায় জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলাটি হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন। হাইকোর্টের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিও ফাঁসির আদেশ হয়। ১০ই নভেম্বর কানাইলাল দত্তের এবং ২১শে নভেম্বর সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হইয়া যায়।

ইংরেজ কর্মচারিগণের ন্যায় তাঁহাদের এতদ্দেশীয় দালালদিগকেও বিপ্লবীরা তাহাদের এক নম্বর শত্রু বলিয়া মনে করিত। কাজেই তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষাদানের কোন সুযোগই তাহারা সহজে হাতছাড়া করিত না। শ্রী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুলিশের যে সাব ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যার জন্য এককভাবে দায়ী, ৯ই নভেম্বর অর্থাৎ কানাইলাল দত্তের ফাঁসির পূর্বদিন তিনি জনৈক বিপ্লবীর গুলীতে কলিকাতার সার্পেন্টাইন লেনে প্রাণ হারান।

জনাব শামসুল আলম নামক পুলিশের একজন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলিপুর বোমার মামলায় সরকারের পক্ষে সাক্ষী সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্যমের পরিচয় দিয়া বিপ্লববাদীদের রোষের উদ্রেক করিয়াছিলেন। উক্ত মামলা অবসানের পর সরকার তাঁহাকে বিপ্লববাদীদের আড্ডাগুলি আবিষ্কারের কার্যে নিযুক্ত করেন। বীরেন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্ত নামক আঠার বৎসর বয়স্ক জনৈক বিপ্লবীর উপর তাহার হত্যার ভার ন্যস্ত হয়। ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একদিন কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বারপথে বীরেন্দ্র নাথের গুলীতে শামসুল আলম প্রাণ হারান। বিচারে বীরেন্দ্র নাথের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয় এবং তদনুসারে ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহার ফাঁসি হইয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মুজাহিদগণের ন্যায় হিন্দু বিপ্লববাদীরাও ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের কার্যপ্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মুজাহিদগণ সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে আস্থাবান ছিল এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল, লড়াই করিয়া তাহারা ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবে। সেজন্য ব্যক্তি বিশেষের হত্যার উপর তাহারা কোন গুরুত্বই আরোপ করিত না। অন্যপক্ষে হিন্দু বিপ্লববাদীরাও সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে বিশ্বাস করিত। কিন্তু তৎপূর্বে তাহারা ব্যক্তি বিশেষের উপর হামলা চালাইয়া অন্যান্য ইংরেজদের

মনে ত্রাসের সঞ্চার করিবার পক্ষপাতী ছিল। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দুইয়ের মধ্যে ইহারাই ছিল অধিক বাস্তববাদী। বস্তুতঃ কয়েকটি গুপ্ত হত্যার পর ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের অর্থসংগ্রহের নীতিও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুজাহিদেরা জনসাধারণের ধর্মভাবের নিকট আবেদন জানাইয়া এবং মুষ্টি চাঁদা ধার্য করিয়া অর্থসংগ্রহ করিত। অপর পক্ষে হিন্দু বিপ্লবিগণ তাহাদের গুপ্ত সমিতির পরিচালনা এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ও নির্মাণের জন্য ডাকাতি ও রাহাজানি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিত। ডাকাতির ব্যাপারে ঢাকার শ্রী পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বাধীন অনুশীলন সমিতি বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দেয়। ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছোট বড় প্রায় ৫০টি ডাকাতি বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। সব কয়টিতেই যে তাহাদের মোটা রকমের অর্থলাভ হইয়াছিল তাহা নয়। এমন কি সঠিক তথ্যের অভাবে কোন কোনটি হইতে তাহাদিগকে একেবারে রিক্তহস্তেই ফিরিতে হইয়াছিল। কোন কোন ডাকাতিতে তাহাদিগকে গ্রামবাসিগণের সহিত লড়াই পর্যন্ত করিতে হইয়াছে।

এই ছদ্মবেশী ডাকাতদের গুলীর আঘাতে কিছু সংখ্যক নিরীহ গ্রামবাসীও নিহত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ চক্রবর্তী, মনোমোহন দে, মনোমোহন ঘোষ, রাজকুমার রায়, মতিলাল রায়, টিনেভ্যালির কালেক্টর মিঃ এ্যাস এবং ঢাকার একটি মামলার তিনজন সাক্ষীকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। ডাকাতি ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে কয়েক দফায় সরকার প্রায় দুইশত বিপ্লবীকে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রেফ্‌তার করিয়া তাহাদের বিভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিপ্লববাদীদের হাতে নিহতদের মধ্যে কেহ পুলিশের পরামর্শে গোপন তথ্যাদি সরবরাহের জন্য দলে যোগদান করিয়াছিল, আর কেহ কেহ পুলিশের নির্যাতন বরদাশত করিতে না পারিয়া মুক্তির বিনিময়ে রাজসাক্ষী হইয়াছিল।

আলিপুর বোমার মামলা হইতে নিষ্কৃতি লাভের পর শ্রী অরবিন্দ ঘোষ পুনরায় গ্রেফতারের ভয়ে গোপনে চন্দননগরে পলায়ন করেন।

তথায় বিপ্লবী মতিলালের গৃহে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি একখানি জাহাজযোগে দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের শাসনাধীন পণ্ডিচেরী গমন করেন। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর ন্যায় অরবিন্দ ঘোষও পিতামাতার আদুরে সন্তান ছিলেন। পলায়নের পশ্চাতে যে কারণই থাকুক্ না কেন, বাংলার বিপ্লবীরা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অরবিন্দ ঘোষ অতঃপর পণ্ডিচেরীতে একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হন। এক্ষেত্রে তাঁহার খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও পরিব্যাপ্ত ছিল। বাংলায় বিপ্লববাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে তিনি আজীবন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ত্রিশের দশকে তিনি দুইবার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ

বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনমতকে তাচ্ছিল্য সহকারে পদদলিত করিয়া লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত না করিলেও বিপ্লব আন্দোলন একদিন মাথাচাড়া দিয়া উঠিত। কেননা, বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। কংগ্রেস অনুসৃত আবেদন-নিবেদন নীতির প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। নিয়মতান্ত্রিকতার পথ যে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পথ নয়, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহারা ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল। তবে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাই যে বিপ্লব আন্দোলনের জন-প্রিয়তা ও বিস্তৃতির জন্য বহুলাংশে দায়ী, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ঔদ্ধত্যের বশীভূত হইয়া লর্ড কার্জন যাহা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে প্রেস্টীজের প্রশ্নটাই হয়ত তাহা হইতে তাঁহার পশ্চাদপ-সরণের পথ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আন্দোলন দমনের জন্য লর্ড কার্জন সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখনও পাকিস্তানে, ভারতে ও বাংলাদেশে যেই গোয়েন্দাগিরি প্রথা চালু আছে, তাহাও লর্ড কার্জনেরই উদ্ভাবিত। কিন্তু দেশের মুক্তিসাধনায় উদ্বুদ্ধ কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে না পারিলে মুক্তি-প্রচেষ্টা যে সংক্রামক হইয়া উঠে, চণ্ডনীতির উপাসক লর্ড কার্জন

সম্ভবতঃ ইতিহাসের সেই সত্যটি জানিয়া না লইয়াই বড়লাটের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বাংলায় তাঁহার চণ্ড-নীতির ব্যর্থতা তিনি স্বয়ং দেখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। পরবর্তী ভাইসরয়ের আমলেও বাংলার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে আনা বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

তাহা ছাড়া বাংলার দেখাদেখি সারা ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করায় ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী মহল তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিমধ্যে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। দেশীয় মূলধনে স্থাপিত এবং দেশীয়দের পরিচালিত অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ সময় গড়িয়া উঠে। বিদেশীয়দের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার মানসে এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্বদেশী আন্দোলনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিল। রাজ-নৈতিক, বাণিজ্যিক এবং শাসনকার্য সম্পর্কিত পরিস্থিতির ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া তাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রদ করিয়া পুনরায় উভয় বঙ্গকে একত্রিত করণের একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যুতে সেই সুযোগ উপস্থিত হয়। রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে মহাসমারোহে এক দরবারের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন। বিপ্লববাদীরা তাহাদের এই মহাবিজয়ে বোমা ও পিস্তলের কার্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রথমবার নিঃসন্দেহ হইল। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পথে তাহাদের এই বিজয় অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অনেকটা আগাইয়া দিবে, ইহা মনে উদিত হইতেই নিহত সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় সেদিন তাহাদের মস্তক নত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভুলের খেসারৎ

বঙ্গবিভাগ রদ করিয়া বৃটিশ সরকার একটা বড় রকমের দাঁও মারিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাঁহারা

বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনমতকে শান্ত করিতে পারিবেন এবং জনমত শান্তভাব ধারণ করিলে বিপ্লব আন্দোলনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু এই ধারণা যে কত ভ্রমাত্মক, তাহাই যেন প্রতিপন্ন করিবার জন্য মাত্র এগারো দিন পর অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের সদ্য-বিঘোষিত রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশের দিন বিপ্লবীরা স্বয়ং বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। দৈবক্রমে তিনি সামান্য আহত হইয়া বাঁচিয়া গেলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার একজন আর্দালী নিহত হইল। বিস্ময়াবিষ্ট বৃটিশ সরকার দেখিলেন, বঙ্গবিভাগের ন্যায় উভয় বঙ্গের সংযুক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও বিপ্লবীরা পণ্ড করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারেন, প্রদেশের সীমানায় রদবদল নয়, বরঞ্চ গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই তাহাদের লক্ষ্য।

অতঃপর নূতন করিয়া আবার বৃটিশ সরকার ইহাদের দমনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন। একার্যে এবার মুসলমানদের সক্রিয় সাহায্য দূরে থাকুক মৌখিক সহানুভূতি লাভের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছিল। কারণ, ১৯১১ সালে যখন উভয় বাংলাকে সংযুক্ত করা হয়, তখন মুসলমান সমাজের মতামত যাচাই করা পর্যন্ত তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহাদের এই বিশ্বাসঘাতকতায়, বঙ্গভঙ্গের প্রধান সমর্থক নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ অত্যন্ত ব্যথিত হন। দুঃখে, ক্ষোভে এবং লজ্জায় তিনি দিল্লী দরবার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগদান না করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ রহিতের পর কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের কার্যতঃ অবসান ঘটিয়াছিল রাজা পঞ্চম জর্জের দিল্লী ঘোষণার দিবস হইতে। পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদ দমনে মুসলমানরা বৃটিশের তেমন কোন সাহায্য করে নাই।

কিছুটা আদর্শের পার্থক্যের জন্য এবং কিছুটা দৃঢ় মনোবলের অভাবে তাহারা হিন্দু বিপ্লববাদীদের সাথে যোগদানও করিতে পারে নাই। তবে এ কথাও ঠিক, হিন্দুদের তরফ হইতে আহ্বান আসিলে তখন তাহারা কি করিত তাহা এখন বলা শক্ত। অনেকের বিশ্বাস, বিপ্লব আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান পাইলেও মুসলমান যুব সমাজ তাহাতে সাড়া দিত

না। কারণ হিন্দু বিপ্লববাদীদের আদর্শ ছিল শিবাজীর স্বপ্নের বাস্তবায়ন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের কাল্পনিক "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠা। তা'ছাড়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ প্রণালীও মুসলমান যুবকদের নিকট হয়ত আপত্তিকর বিবেচিত হইত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিপ্লব আন্দোলনে যোগদানের জন্ম বহু মুসলমান যুবক আগাইয়া যাইত।

আন্দোলনের প্রসার

মহারাষ্ট্রে বিপ্লব আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণ উপরে বলা হইয়াছে। অপর কয়েকটি প্রদেশেও, বিশেষ করিয়া যুক্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে ১৯০৬-১৪ সালের মধ্যে এই আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। ঠিক কোন্ সময়, কোথা হইতে, কে বিপ্লবের বাণী তথায় বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। চাকুরী, ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি কার্যোপলক্ষে উত্তর ভারতের সর্বত্র বহু সংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু স্থায়ীভাবে তথনও বাস করিতেন। বাংলার বিপ্লবী যুবকগণ পুলিশের হাত হইতে নিজেদের রক্ষার জন্ম সময় সময় প্রবাসী বাঙ্গালীদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। খুব সম্ভব তাহাদেরই চেষ্টায় উত্তর ভারতে বিপ্লব আন্দোলন বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এ সম্পর্কে যে কয়টি নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে বর্ধমানের শ্রী রাসবিহারী বসু পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রী বিনোদ বিহারী বসু ভারত সরকারের ছাপাখানায় একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুত্রের শিক্ষার জন্ম তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কিন্তু পড়াশুনার প্রতি রাসবিহারীর মনোযোগ মোটেই ছিল না। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করায় তাহার পিতা পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়েন।

অনেকের মতে কোন এক সূত্রে চন্দননগরের বিপ্লবী মতিলাল রায়ের সহিত পরিচিত হওয়ার পর তিনি কলিকাতার বিপ্লবীদের দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছিলেন। পুলিশ তাঁহার সন্ধান করিতেছে জানিয়া রাসবিহারী ১৯১০ সালে দেরাদুনে চলিয়া যান এবং জীবিকা নির্বাহের জন্ম একটি

সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহারই চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতে বিপ্লবীদের একটি সুসংহত দল গড়িয়া উঠে। রাসবিহারী বসুর প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। বসন্ত বিশ্বাস নামক একটি বালককে এজন্য তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। রাসবিহারী তাহাকে বালিকার বেশে সুসজ্জিত করিয়া দিল্লীস্থ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ভবনের উপর হইতে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা রচনা করেন। তদনুসারে যথাসময়ে বোমাও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ রক্ষা পান। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য ছিল সিলেট জেলার মৌলবীবাজারের অত্যাচারী মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাপ্টেন গর্ডনের হত্যার চেষ্টা। ক্যাপ্টেন গর্ডন পাঞ্জাবে বদলী হইলে পর রাসবিহারী তাঁহার দলের জনৈক বিপ্লবীকে দিয়া তাঁহার যাতায়াতের পথে একটি বোম রাখিয়া দেন। কিন্তু বোমাটি বিস্ফোরিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হওয়ায় ক্যাপ্টেন গর্ডন রক্ষা পাইয়া যান। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ও গ্রেফ্‌তার এড়াইবার জন্য অতঃপর তিনি ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বেনারসে অবস্থান করিতে থাকেন।

এই ঘটনার প্রায় দশ মাস পর তথায় দীননাথ নামক জনৈক বিপ্লবী ধৃত হন। পুলিশের অত্যাচারে দীননাথ তাহাদের নিকট অনেক গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেন। ইহার পর হইতে পুলিশ রাসবিহারীর খোঁজখবর করিতে থাকে। কিন্তু তিনি ধরা পড়িলেন না। দীননাথের বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া পুলিশ বহু জায়গায় তল্লাশী চালায় এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফ্‌তার করে। ইহাদিগকে লইয়াই দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। বিচারের সময় দীননাথের অনুকরণে মুলতান চাঁদ নামক অপর একজন বিপ্লবী প্রথমে পুলিশের নিকট এবং পরে আদালতে স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। বিচারে বালমুকুন্দ, আমির চাঁদ ও অপর একজনের মৃত্যুদণ্ড এবং অবশিষ্টদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হয়। রাসবিহারীর অনুপস্থিতিতেই তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আদেশ কার্যকর করিবার জন্য পুলিশ তাঁহার কোন সন্ধানই পায় নাই। কাজেই চরম দণ্ডাদেশ কাগজের পৃষ্ঠায় থাকিয়া গেল। এদিকে তিনি ছদ্মবেশে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে পূর্ববৎ বিপ্লবের বাণী এবং আদর্শ প্রচার করিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় দলের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয়।

গাদ্দার পার্টি

হরদয়াল নামক পাঞ্জাবের একজন সাহসী যুবক ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ১৯১০ সালের মধ্যভাগে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। পর বৎসর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়া সে স্থানে একটি বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তখন বহু সংখ্যক শিখ নানাভাবে জীবিকার্জনে রত ছিল। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ক্যানাডা সরকারই ইহাদের বহিষ্কারের জন্য পর পর কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতীয়দের পক্ষে তথায় প্রবেশ এবং অবস্থান এক রকম অসম্ভব করিয়া তোলেন। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেও ভারতীয় বিদ্বেষ বিস্তার লাভ করিতেছে দেখিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকেন। হরদয়ালের পরিচালনায় গাদ্দার নামক একখানি পত্রিকা তথা হইতে প্রকাশিত হয়। গাদ্দার পার্টির মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। অধ্যাপক বরকত উল্লাহ, সোহান সিং প্রমুখ আরও কতিপয় বিপ্লবী ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, গাদ্দার পার্টির শক্তি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায় এবং ইহার শাখা শীঘ্রই চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ফিজি, মালয় প্রভৃতি দেশে সংস্থাপিত হয়। বরকত উল্লাহর আগে উত্তর ভারতের আরও কয়েকজন মুসলমান যুবক বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহাদের কেহই বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। দলে ইহাদের অবস্থিতির কালও অজ্ঞাত রহিয়াছে। এদিকে হঠাৎ একদিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ হরদয়ালকে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগে গ্রেফ্তার করিয়া বিচার সাপেক্ষে জামিনে খালাস দেন। হরদয়াল জেল-জরিমানাকে ভয় করিতেন না। কিন্তু স্মরণযোগ্য কিছু একটা সম্পাদনের পূর্বে জেল-প্রকোষ্ঠে বসিয়া কড়ি-বড়গা গণনা করিয়া সময় কাটাইবারও

পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। বড় রকমের কিছু একটা করিবার উদ্দেশ্যে তাই জামিনে মুক্তিলাভের পর তিনি গোপনে ইউরোপ প্রস্থান করেন।

এদিকে আমেরিকা-প্রবাসী শিখগণ ভারত সরকারের মারফৎ তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হন। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ এবং বৃটিশ-বিদ্বেষ দেখা দেয়। আইন-সঙ্গত উপায়ে প্রতিকারের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত চিন্তা করিয়া অগত্যা তাহারা ক্যানাডার ইমিগ্রেশন আইন লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মালয়ের বিখ্যাত ভারতীয় কণ্ট্রাক্টর গুরুদিৎ সিং সর্বসম্মতিক্রমে এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। গুরুদিৎ সিং স্বীয় অর্থে কোমাগাটামারু নামক একখানি প্রকাণ্ড স্টীমার ভাড়া করিয়া ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে হংকং হইতে বহু শিখকে ইমিগ্রেশন আইন অমান্যের জন্য ক্যানাডার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়া দেন। জাহাজখানি ২৩শে মে ভ্যানকুভার বন্দরে পৌঁছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যাত্রিগণকে তীরে অবতরণ করিতে তো দিলেনই না, উপরন্তু জাহাজে তাহাদের এক দল পুলিশ প্রেরণ করেন। যাত্রীরা ইহাতে কুপিত হইয়া মারধর করিয়া পুলিশকে তাড়াইয়া দেয়। ইহার প্রত্যুত্তরে কর্তৃপক্ষ একখানি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া গোলা বর্ষণের ভয় প্রদর্শনপূর্বক জাহাজখানিকে অবিলম্বে বন্দর ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৯১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কোমাগাটামারু কলিকাতার নিকট বজবজে পৌঁছে। যাত্রীরা তখনই মাত্র জানিতে পারে তাহাদিগকে পাঞ্জাবে লইয়া যাইবার জন্য একখানি ট্রেন পূর্ব হইতে সেস্থানে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। উত্তেজিত শিখগণ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া দলবদ্ধভাবে পদব্রজে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলে পুলিশ তাহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। ফলে দুই দলে সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে পুলিশের কয়েকজন হতাহত এবং শিখদের ১৮ জন নিহত এবং প্রায় একশত জন কমবেশী আহত হয়। অতঃপর পুলিশ ৬০ জন শিখকে বলক্রমে ট্রেনে বসাইয়া দেয়। গুরুদিৎ সিং ঘটনাস্থল হইতে অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করেন।

বিদেশে শিখদের উপর নির্যাতন, বজবজে পুলিশী জুলুম প্রভৃতি ঘটনা শিখদের অন্তরে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দেয়। এ কারণে কয়েক স্থানে

পুলিশের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়। সুযোগ বুঝিয়া শ্রী রাসবিহারী, শ্রীবিষ্ণু গণেশ পিংলে, শ্রী শচীন্দ্র সান্যাল, শ্রীভাই পরমানন্দ প্রমুখ বিপ্লবিগণ এ সময় পাঞ্জাবে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও তৎপরতা কেন্দ্রীভূত করেন। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে অচিরে পাঞ্জাবের বহু স্থানে গুপ্ত সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং প্রচুর অর্থ এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগৃহীত হয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র

কোমাগাটামারু ভারতে ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ইউরোপে প্রথম মহাসমর আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। শ্রী রাসবিহারী বিপ্লবীদিগকে বুঝাইলেন, বৃটিশকে আঘাত হানিবার ইহাই উপযুক্ত সময় ও সুযোগ। অতঃপর তিনি বিপ্লবীদের একটা সভা আহ্বান করিয়া ভারতব্যাপী একই সঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সকলকে যথারীতি প্রস্তুত হইতে বলেন। কোমাগাটামারুর দুর্ঘটনার পর হইতে সর্ব শ্রেণীর শিখদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, বিপ্লবিগণ পাঞ্জাবকেই কেন্দ্র করিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। প্রদেশওয়ারী তুলনামূলক হারে বৃটিশ বাহিনীতে সে সময় এতদ্দেশীয়দের মধ্যে পাঞ্জাবীদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। এ কারণেও বাংলা এবং মহারাষ্ট্রের পরিবর্তে তাঁহারা পাঞ্জাবের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। নেতৃস্থানীয় বিপ্লবিগণের বিশ্বাস ছিল, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তাঁহারা শিখ সৈন্যদের সাহায্য পাইবেন। কর্তার সিংহ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিপ্লব প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি যে অসীম সাহস এবং দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সত্যই উহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। সেনানীর বেশে তিনি সৈন্যদের ব্যারাকে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতেন। বিপ্লবের জন্য ভূমি পূর্ব হইতেই এমন প্রস্তুত ছিল যে, বহু ব্যারাকের সৈন্যরা বিপ্লবীদের প্রথম আহ্বানেই সাড়া দিয়াছিল।

যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার গোয়েন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দেরী হইলে বিপ্লবীদের পরিকল্পনার বিষয় সরকার জানিতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। বিপ্লবীরা ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে বহু অস্ত্রশস্ত্রও আমদানী করিয়া লইয়া-

ছিলেন। প্রস্তুতি যখন সমাপ্তির পথে, তখন কৃপাল সিংহ নামক জনৈক গুপ্তচর সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিষয় জানাইয়া দেয়। সরকার মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া সৈন্যনিবাস এবং অস্ত্রাগারগুলিতে শক্তিশালী পাহারাদার বসাইয়া একই দিনে বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের আড্ডায় হানা দেন। মার্চ মাসের শেষের দিকে দশটি বোমা সহ বিষ্ণু পিংলে মীরাটে গ্রেফ্তার হন। কর্তার সিং প্রমুখ বহু বিপ্লবী প্রায় একই সময় বিভিন্ন স্থানে গ্রেফ্তার হইয়া লাহোরে নীত হন। নিঃসঙ্গ রাসবিহারী বসু আবার কাশীতে যাইয়া ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে থাকেন।

যথাসময়ে ধৃত বিপ্লবিগণকে বিচারার্থ একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। বিচারে ২৪ জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু পিংলে, কর্তার সিংহ, হরনাম সিংহ প্রমুখ মাত্র সাত-জনকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অবশিষ্ট ১৭ জনের শাস্তি হ্রাস করিয়া উচ্চ আদালত তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। বাকী আসামীগণের প্রতিও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিম্বা দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। এদিকে কাশীতে কিছু দিন অবস্থানের পর ভারতের বাহিরে বিপ্লব আন্দো-লনে সহায়তা এবং বিদেশীয়দের সাহায্যলাভের ব্যবস্থা করিবার জন্য পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপান গমনের পাসপোর্ট সংগ্রহ করিয়া রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সালের ১২ই মে একখানি জাপানী জাহাজযোগে ভারত ত্যাগ করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি শ্রী শচীন্দ্র সান্যালের উপর তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রাসবিহারীর ভারত ত্যাগের কিছু দিন পর শচীন্দ্র সান্যাল এবং দলের আরও অনেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বেনারসে ইঁহাদের বিচার হয়। শচীন্দ্র সান্যাল যাবজ্জীবন ...ান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্রথম রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর হইতে জাপান সম্পর্কে এদেশে একটি ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচ্যের হাতে পাশ্চাত্যের উক্ত পরাজয়ের মধ্যে পরাধীন এশিয়াবাসীরা যেন তাহাদের মুক্তি পথের সন্ধান পাইয়াছিল। তখন হইতে তাহারা জাপানকে এশিয়ার মুক্তিদাতা হিসাবে শ্রদ্ধা জানাইয়া আসিতে থাকে। ভারতের ভাবী মুক্তি-সংগ্রামে

জাপানের সাহায্য লাভের আশায় তাই রাসবিহারী বসু জাপানে গমন করেন। শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা সভ্যতার ন্যায় পররাজ্য হরণের ব্যাপারেও জাপান যে ইউরোপ এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল ইহা অনেকের ন্যায় জাপান পৌঁছার পূর্বে রাসবিহারী বসুরও অজ্ঞাত ছিল। জাপানে পৌঁছার পর আস্তে আস্তে তাঁহার সেই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঘটে। অপ্রত্যাশিতভাবে জাপান প্রথম মহাসমরে মিত্র শক্তির পক্ষে যোগদান করিয়া চীনের উপকূলে অবস্থিত জার্মান অধিকৃত স্থানগুলি দখল করিয়া বসে। ইহার কিছুদিন পর বৃটিশ সরকারের অনুরোধে জাপান সরকার রাসবিহারীকে তাঁহাদের দেশ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেন। নিরুপায় হইয়া রাসবিহারী আত্মগোপন করেন। সেই অবস্থায় তাঁহার দশটি বৎসর অতিবাহিত হয়।

আত্মগোপনের সময় জনৈক সহৃদয় জাপানী তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পর তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করেন, জাপানের সহিত কয়েকটি ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান শক্তিগুলির তখন মতবিরোধ চলিতেছিল। বৃটিশের সহিত সম্ভাব্য সংঘর্ষে রাসবিহারীকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের কথা চিন্তা করিয়াই বোধ হয় জাপান সরকার তাঁহার উপস্থিতিতে এই দফা আর আপত্তি করেন নাই। তখন হইতে তিনি জাপানেই প্রকাশ্যভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু প্রথম মহাসমরে বিজয়ীপক্ষ পর্যন্ত এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর তাহাদের মধ্যে বিবাদ না বাধায় রাসবিহারী জাপানকে এবং জাপান রাসবিহারীকে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহারের কোন সুযোগই পায় না। অবশেষে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যখন মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মহাসমরে অবতীর্ণ হয়, তখন সুযোগসন্ধানী রাসবিহারী ভারতবর্ষ উদ্ধারের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। কোন বিপ্লবী ইতিপূর্বে এত দীর্ঘকাল ব্যাপী এতটা ধৈর্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

স্বাধীন ভারত সরকার

প্রথম মহাসমরের পূর্ব হইতে শিক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে

কিছু সংখ্যক ভারতীয় জার্মানী এবং উহার অধিকৃত এলাকায় অবস্থান করিয়া আসিতেছিলেন। যুদ্ধ ঘোষিত হইলে, ইহারা ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য জার্মান সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হন। জার্মান সরকারও ইহাই আশা করিতেছিলেন। উভয় পক্ষে আলাপ-আলোচনার পর ডঃ তারক দাস, অধ্যাপক বরকত উল্লাহ্, হরদয়াল, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবিগণের উদ্যোগে বার্লিনে একটি সমিতি গঠিত হয়। তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর বরকত উল্লাহ ইউরোপ হইতে কাবুলে উপনীত হন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তুরস্কের যুদ্ধে যোগদানের দরুন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে বিপ্লবীদের কাজ সহজতর হইবে। কাবুলে তিনি ওবায়েদ উল্লাহ সিন্ধি, ফাতেহ মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ আলি, মিয়া মাহমুদ আনসারী প্রমুখ পলাতক বিপ্লবিগণের সহিত একত্রিত হন। ইহারা মহাসমর আরম্ভের এক বৎসর পর গোপনে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া কাবুলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ বিতাড়নে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের আশায় তখন হইতে তাঁহারা কাবুলে অবস্থান করিতে থাকেন। হাতরাসের বিশিষ্ট জমিদার রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ বার্লিন হইতে আসিয়া ইহাদের সঙ্গে পরে যোগ দেন।

অতঃপর ইঁহাদের সাহায্যে অধ্যাপক বরকত উল্লাহ কাবুলে ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করেন। এই অস্থায়ী সরকারে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রেসিডেণ্ট, অধ্যাপক বরকত উল্লাহ প্রধান মন্ত্রী, মওলানা ওবায়েদ উল্লাহ সিন্ধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন। দলের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য মওলানা মাহমুদুল হাসান হজ্জব্রত উদযাপন উপলক্ষে মক্কায় গমন করিয়া হেজাজের তুর্কী শাসনকর্তা গালিব পাশার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। অতঃপর জার্মানী ও তুরস্ক হইতে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র কাবুলে প্রেরিত হইতে থাকে। কালক্রমে এই ষড়যন্ত্রের সহিত মক্কার শেরিফ হোসেন এবং আফগান আমীর হাবিবুল্লাহ খানও জড়িত হইয়া পড়েন। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার তখন হইতে দুর্গম পথে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ভারতে প্রেরণ করিতে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুখ্যতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেসের সমর্থন লাভের আশায়

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে সরকারের প্রধান করা হইয়াছিল। ইনি কংগ্রেসের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

শেরিফ হোসেনের ভূমিকা

ইতিমধ্যে শেরিফ হোসেনের বিশ্বাসঘাতকতায় এই ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজরা জানিয়া ফেলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আমীর হাবিবুল্লাহকে প্রচুর অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করিয়া আফগানিস্তানের মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য প্রাপ্তির পথে নানা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করেন। ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য ইতিপূর্বে মাহমুদ আনসারী, আবদুল্লাহ, ফাতেহ মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ যে সকল বিপ্লবী ভারতের উদ্দেশ্যে কাবুল ত্যাগ করিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের নামও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া সীমান্তে তাঁহারা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়িয়া যান। প্রমাণাভাবে বিচারে খালাস পাইলেও তাঁহাদিগকে ১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রি অনুসারে দীর্ঘ দিন কারাগারে আটক রাখা হয়। এদিকে আমীর হাবিবউল্লাহর চাপে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার ভাঙ্গিয়া দিয়া নেতৃবর্গ কাবুল ত্যাগ করিয়া বার্লিন ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া যান। বিদেশী ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের পুনঃপ্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হইলে সেই সুযোগে অল্প কয়জন বিপ্লবী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাকী বিপ্লবীরা তৎপূর্বেই বিভিন্ন দেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

প্রথম মহাসমরের পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু ভারতীয়ের বাস ছিল। এজন্য শ্যামের রাজধানী ব্যাংককে এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী বাটাভিয়ায় দুইটি বিপ্লব-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকক কেন্দ্রটি চীন, জাপান এবং আমেরিকার গাদ্দার দলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত। পক্ষান্তরে বাটাভিয়া কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ ছিল বাংলার বিপ্লবী দলের। শ্যাম দেশ স্বাধীন ছিল বটে, কিন্তু সেখানে বৃটিশের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় বিপ্লবীদের কার্যে তাঁহারা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে থাকেন। বাটাভিয়ায় ও অনুরূপ অসুবিধা ছিল। ইন্দোনেশিয়া ছিল তখন হল্যাণ্ডের শাসনাধীন।

প্রথম মহাসমরে হল্যাণ্ড নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু এশিয়ায় তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য তাহাকে বৃটিশের সদিচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইত। প্রায় আড়াই হাজার দ্বীপ লইয়া গঠিত সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ছিল প্রায় আড়াইশত বৎসর হইতে তাহার পদানত। ইন্দোনেশিয়ায় তখন মুক্তি-আন্দোলন বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকায় ভারতীয় বিপ্লবিগণ তাঁহাদের ইন্দোনেশীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে কোন সময় বঞ্চিত হন নাই সত্য। কিন্তু বৃটিশের ভয়ে ডাচেরা বিপ্লবীদের কার্যে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। বাটাভিয়া হইতে সিঙ্গাপুরের দূরত্ব খুব বেশী নয় এবং সিঙ্গাপুরে তখনও বহু সহস্র ভারতীয়ের বাস ছিল। এ কারণে বাটাভিয়ার বিপ্লবীদের সহিত বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ শেষ পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইহা ছাড়া বাটাভিয়াস্থ জার্মানদের সাহায্যে তাঁহারা ইউরোপে হর-দয়াল প্রমুখ তাঁহাদের অন্যান্য সহকর্মীদের সহিতও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বাটাভিয়াস্থ জার্মান কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বিপ্লবিগণকে এ সময় জানান যে, অধিকতর সাহায্য প্রদানের পূর্বে তাঁহারা নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। তদনুসারে শ্রী নরেন্দ্র ভট্টাচার্য বাংলা হইতে তথায় প্রেরিত হন।

মেভারিকের অভিযান

বাটাভিয়াস্থ জার্মানদের পক্ষ হইতে থিওডোর হেলফারিক নামক জনৈক পদস্থ ব্যক্তি নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে জানান, 'মেভারিক' নামক একখানি জাহাজ ক্যালিফোর্নিয়া হইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য ৩০ হাজার রাইফেল, প্রচুর গোলাবারুদ এবং কয়েক লক্ষ টাকা লইয়া যাত্রা করিয়াছে। জাহাজখানি করাচী বন্দরে নোঙ্গর করিবে প্রথমে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য উপরোক্ত দ্রব্যাদি নোয়াখালী জেলার সন্দীপের নিকট এক স্থানে খালাসের কথা জানাইয়া দিয়া বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এস্থানে আসিয়া তিনি যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অতুল ঘোষের সহিত পরামর্শের পর সন্দীপে, কলিকাতার অদূরে এক স্থানে, এবং বালেশ্বর

ভাগাভাগি করিয়া জাহাজের মাল খালাস করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা যথাসময়ে বাটাভিয়ায় জানাইয়া দেন। সন্দীপের নিকটবর্তী একটি নির্জন দ্বীপে এতগুলি মাল খালাস এবং তথা হইতে অন্যত্র প্রেরণের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়াই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক স্থানের কথা হইয়াছিল। মাল খালাসের জন্য যথা-সময় সন্দীপ ও হাতিয়ায় লোকজন গেল। কিন্তু পক্ষকাল অপেক্ষার পরও জাহাজের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না দেখিয়া বিপ্লবিগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। ব্যাপারটি আসলে দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ :

তখন পর্যন্ত নিরপেক্ষতার মুখোসধারী যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দেওয়ার মানসে 'মেভারিক' কোন মাল না লইয়াই কালিফোর্নিয়া বন্দর ত্যাগ করে। স্থির হয়, পথে 'এ্যানি লার্সেন' নামক জাহাজ হইতে পূর্বোক্ত মালগুলি তুলিয়া লইয়া মেভারিক জাভা হইতে সন্দীপ অথবা হাতিয়ায় যাইবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক এলাকায় বে-আইনী-ভাবে অস্ত্রশস্ত্র বহনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র 'এ্যানি লার্সেন'কে আটক করিয়া অস্ত্রশস্ত্রগুলি বাজেয়াফ্‌ত করিলে, 'মেভারিকের' সন্দীপ যাওয়ার প্রস্তাব অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইরূপে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় বটে ; কিন্তু থিওডোর হেল্‌ফারিক হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি বাংলার বিপ্লবিগণকে জানাইলেন, পাঁচ হাজার রাইফেল, গোলাবারুদ এবং প্রচুর অর্থ তাঁহাদের জন্য সন্দীপ ও হাতিয়ায় পাঠানো হইতেছে। দুঃখের বিষয়, নানা কারণে ইহাও যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। অতঃপর সাংহাইস্থিত জার্মান কন্সালের উদ্যোগে আরও দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ জাহাজ প্রেরণের চেষ্টা হয়। কিন্তু সমুদ্রে পাহারারত বৃটিশ রণপোতগুলি সেই চেষ্টাও পণ্ড করিয়া দেয়। বিপ্লবিগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ একই উদ্দেশ্যে প্রেরিত 'হেনরী' নামক অপর একখানি অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজও পথি-মধ্যেই ধৃত হইয়া পড়ে।

বিপ্লবিগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পরপর কয়েকখানি অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই জাহাজ ধৃত হওয়ায় বৃটিশ সরকার বঙ্গোপসাগরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা তো করিলেনই, উপরন্তু বিপ্লবিগণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য একটি বিরাট

গোয়েন্দা বাহিনীও নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের কয়েকজনকে সন্দীপ ও হাতিয়ায় পাঠান হয়। কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে অতঃপর এই উভয় স্থানের স্টীমার ও নৌকাঘাটে প্রত্যেক যাত্রীর মালপত্র তল্লাশী হইতে থাকে। এই ব্যবস্থা ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

সুন্দরবন হইতে টেক্‌নাফ্ পর্যন্ত উপকূল ভূভাগের উপর কড়া দৃষ্টি রাখার জন্য সন্দীপে একটি অস্থায়ী নৌঘাঁটি নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল কতিপয় সামরিক ও নৌ-বিশেষজ্ঞ সমভিব্যাহারে সন্দীপ গমন করিয়াছিলেন। ছোট-খাটো একটি নৌ-ঘাঁটির জন্য তাহারা স্থানটি মনোনীতও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রায় পর পরই জার্মানীর বিখ্যাত রণপোত 'এমডেন' ভারত মহাসাগরে চড়ায় ঠেকিয়া বৃটিশের হাতে ধরা পড়ায় বঙ্গোপসাগর কণ্টকটা নিরাপদ হয় এবং উপরোক্ত পরিকল্পনাটিও চাপা পড়িয়া যায়।

থিওডোর হেলফারিকের সহিত পরামর্শের জন্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্য পুনরায় বাটাভিয়ায় গমন করেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি এবং উহা বাংলায় পাঠাই-বার কোন ব্যবস্থাই এবার তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রাসবিহারী বসুও বৃটিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়াইয়া সাংহাই বন্দর হইতে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতে সমর্থ হইলেন না। বিপ্লবী দল অতঃপর জার্মানী হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিয়া নিজেদের সীমিত শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য নূতন করিয়া আবার প্রস্তুত হইতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে পুলিশ তাহাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়া লইতে পারিয়াছিল। কলিকাতা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী শ্রী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুলিশের মতলবের কথা জানা মাত্রই চন্দননগর চলিয়া যান। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় গোয়া হইতে বাটাভিয়ার সংবাদ লইবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া তথায় ধৃত হন। কিছু দিন পর তিনি পুনা জেলের মধ্যে আত্মহত্যা করেন। এই আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। অনেকে সন্দেহ করেন, স্বীকারোক্তি আদায় করিতে না পারিয়া পুলিশ গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।

যতীন্দ্রনাথের আত্মদান

এদিকে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ চারিজন সঙ্গী লইয়া 'মেভারিকের' মাল খালাস করিবার জন্য ইতিপূর্বেই বালেশ্বর গিয়াছিলেন। পুলিশ তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে জানিয়া তিনি সঙ্গিগণসহ ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। পুলিশের নিকট কিন্তু ইহা গোপন রহিল না। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য মিঃ টেগার্ট, মিঃ বার্ড এবং একদল সশস্ত্র পুলিশ সহ ময়ূরভঞ্জে গমন করেন। এই সংবাদ পাইয়া যতীন্দ্রনাথ সদলবলে অন্যত্র গমনের উদ্দেশ্যে বুড়ীবালাম নদীর তীরে অবস্থিত চাষাখন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে স্থানীয় লোকজন তাঁহাদিগকে ডাকাত সন্দেহ করিয়া দূর হইতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে থাকে এবং কয়েক ব্যক্তি গিয়া নিকটবর্তী থানায় সংবাদ দেয়। সংবাদ পাওয়া মাত্রই বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় তিনশত পুলিশ ও সৈন্য লইয়া জঙ্গলটি ঘিরিয়া ফেলেন। পরক্ষণেই উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় শুরু হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পর সৈন্যদের গুলীতে চিত্তপ্রিয় আহত হইয়া পড়েন। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার সময় সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত অপর একটি গুলীতে যতীন্দ্র নাথ মারাত্মক আঘাত পান। অতঃপর যতীন্দ্র নাথেরই পরামর্শক্রমে তাঁহারা সকলে সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। চিত্তপ্রিয় সে স্থানেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়েন। চিকিৎসার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্র নাথকে তাড়াতাড়ি বালেশ্বর হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া, অবশিষ্ট তিন জনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যান। বালেশ্বর হাসপাতালেই যতীন্দ্র নাথের মৃত্যু ঘটে।

বিপ্লবীদের দলে যতীন্দ্র নাথের ন্যায় দুঃসাহসী কোন যুবক ছিলেন না। এজন্য তিনি বাঘা যতীন নামে অভিহিত হইতেন। আহত অবস্থায় ধৃত হওয়ার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকরণে সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের লোকজনরা সামরিক কায়দায় তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়াছিল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং অন্যান্য কতিপয় অভিযোগে কটক জেলের মধ্যে যতীন্দ্র নাথের সঙ্গী নীরেন্দ্র নাথ ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি এবং জ্যোতিষের প্রতি হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ। আন্দামানে অবস্থানের সময় মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা দিলে

জ্যোতিষকে ফেরৎ আনা হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তিনি রংপুর জেলে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এদিকে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য বাটাভিয়া হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের কোন সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া 'মেভারিক' জাহাজযোগে আমেরিকায় চলিয়া যান। অবনী মুখোপাধ্যায় সাহায্য লাভের চেষ্টায় গোপনে জাপান গিয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সিঙ্গাপুরে ধৃত হন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশে ঘটনাবহুল জীবন যাপনের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এস্থানে তিনি র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন পূর্বক পরোক্ষভাবে পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে একটি আসন লাভ এবং নেহেরু মন্ত্রিসভায় যোগদানের আহ্বান পাইয়াছিলেন। মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের একজন দৃঢ় সমর্থক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং বহু ভাষাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, এম. এন. রায় ছদ্মনামধারী এই বিপ্লবী বীর পরিণত বয়সে দেরাদুনে দেহত্যাগ করেন। এই গ্রন্থখানির ভূমিকা তাঁহারই লেখার কথা ছিল।

জার্মান সামরিক মিশন

জার্মান সরকার প্রথম মহাসমরে তুরস্ক, পারস্য এবং আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া উহাকে রূপদানের জন্য এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানের নিকট সহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে লালা হরদয়াল, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, ওবায়েদ উল্লাহ্ সিন্ধি ও বরকত উল্লাহ্‌র সহিত জার্মান সরকারের সবিস্তার আলাপ-আলোচনা হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মহাসমরের প্রারম্ভে এবং ওবায়েদ উল্লাহ্ সিন্ধি ১৯১৫ সালে গোপনে ভারত ত্যাগ করেন। শিখ ধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় বাল্যকালে ইসলাম গ্রহণের পর হইতে তিনি ধর্মচর্চায় বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করিতে থাকেন। ওবায়েদ উল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদের প্রায় পনর জন লোকও সে সময় ভারত ত্যাগ করেন। স্থলপথে ভারতবর্ষ আক্রমণের ষড়যন্ত্র পাকাপাকি করিবার জন্য একটি জার্মান-তুরস্ক সামরিক মিশন আফগানিস্তানে আগমন করিলে ইঁহারা

তাঁহাদের সহিত যথারীতি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। উক্ত চুক্তি অনুসারে স্থির হয়, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া কাবুলে ভারতের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হইবে এবং ওবায়েদ উল্লাহ্ স্বয়ং ইহার ব্যবস্থাপনা করিবেন। ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের সমর্থন লাভের জন্যই রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে অস্থায়ী সরকারের 'প্রধান' করা হইয়াছিল, ইহা উপরে এক স্থানে বলা হইয়াছে।

হেজাজের তদানীন্তন তুর্কী গভর্ণর গালিব পাশাও এই আলোচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মক্কার শেরিফ হোসেন এই ষড়যন্ত্রের সহিত প্রথমাবধি জড়িত ছিলেন। অধিকন্তু মুসলমানদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারই উপর। এই ষড়যন্ত্র অনুসারেই যথাসময়ে কাবুলে ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ইহার পর হইতে জার্মান সরকার কাবুলে ইঁহাদের নিকট টাকা-কড়ি এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতে থাকেন। কিন্তু ১৯১৬ সালে শেরিফ হোসেন হেজাজের স্বাধীন বাদশাহ হইবার লোভে ষড়যন্ত্রের বিষয় বৃটিশের নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ওলট পালট হইয়া যায়। ইহার ফলে কাবুলস্থ অস্থায়ী ভারত সরকারের পক্ষে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন একটি সাধ্যাতীত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত জরুরী পত্রাদি এবং চুক্তিটি হরিদ্রাবর্ণের এক খণ্ড রেশমী কাপড়ের উপর সোনালী অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে রেশমীপত্র ষড়যন্ত্র বলা হইয়া থাকে। বিশ্বাসঘাতক শেরিফ হোসেন ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, উপরন্তু তুরস্কের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া সমগ্র আরব হইতে তুরস্কের শাসন লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সমরে জার্মানীর অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ইহা একটি প্রধান কারণ।

প্রথম মহাসমর এত আকস্মিকভাবে শুরু হইয়াছিল যে, বিপ্লবিগণকে পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেদের কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় রদবদল করিয়া লইতেই কয়েক মাস ব্যয় করিতে হয়। তাহারা বৃটিশ সরকারের শক্তি সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ১৯১০ সাল হইতে তাহারা বিপ্লব আন্দোলনের সম্প্রসারণের দিকেই

অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। কোন বৈদেশিক শক্তির সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত ভারতবর্ষে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভবপর হইলেও সাফল্যের সম্ভাবনা যে খুব অধিক নয়, নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা তাহা বিশ্বাস করিতেন। এজন্যই তাঁহারা মহাসমর আরম্ভেরও বেশী কিছুদিন পূর্ব হইতে জাপানের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে রাশিয়ার সহিতও যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু প্রথম মহাসমর জার্মানীকেই তাঁহাদের নিকট অধিক আপন করিয়া তোলে। জার্মানীও বিপ্লবীদিগকে সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে বহু চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার আন্তরিকতা এবং যুদ্ধে সাফল্য দর্শনে বিপ্লবীরা তাহাদের জয় সম্পর্কে অনেকটা স্থির-নিশ্চয়ও হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এ কারণে যুদ্ধের গোড়ার দিকে তাহারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন জার্মানী হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে। জার্মানী কর্তৃক প্রেরিত প্রথম কিস্তির ৩০ হাজার রাইফেল ও গোলা-বারুদ তাঁহাদের হাতে পৌঁছিলে সে সময়ের ইতিহাস যে অন্যভাবে লিখিত হইত, ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাবুল ও বাটাভিয়ার মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হইলে পর তাহারা আবার সন্ত্রাসবাদের পুরাতন নীতিতে ফিরিয়া যান। কিন্তু রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবী নায়কগণ তখন আর তাহাদের পুরোভাগে না থাকায় মহাসমরের শেষ কয় বৎসর তাহারা কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন না। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ইহার জন্য অনেকটা দায়ী।

এ সময় আই. বি.-র কুখ্যাত ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়, পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের পুলিশের ডেপুটি সুপার যতীন্দ্র মোহন ঘোষ, গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা মধুসূদন ভট্টাচার্য, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় পুলিশ কর্মচারীর হত্যা ছাড়া বিপ্লবিগণ অপর কোন কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু এ সকল হত্যার বিনিময়ে তাহাদিগকেও বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। সব দিক হইতে প্রশ্নটির বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে

হয়, ১৯১৪-১৯১৯ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর ছিল বিপ্লব আন্দোলনের 'অন্ধকার যুগ'। অথচ এই সময় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতে পারিলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িত। কারাগারের বাহিরে বিপ্লবীদের সংখ্যাল্পতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রের দারুণ অভাবই ছিল এই ব্যর্থতা এবং অক্ষমতার অপর একটি কারণ। ভারতে এ সময় বৃটিশ সশস্ত্র বাহিনীর লোকজনের সংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশে নামিয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভারতীয়দের জন্য আরও অধিকার আদায়ের দাবী জোরদার করিয়া তোলার জন্য তাঁহাদের চরম দুর্দিনে, ১৯১৬ সালে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌ শহরে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইহার ফলে ভারতব্যাপী গণ-আন্দোলনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। ঠিক এ সময় ডঃ এ্যানে বেসাণ্ট ভারতবর্ষের জন্য হোমরুল-এর দাবী উত্থাপন করিয়া গণমনে বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টি এবং চরম লক্ষ্য সম্পর্কে তাহাদের অস্পষ্ট ধারণার অবসান ঘটান। বিপ্লববাদ ফ্রন্টে শূন্যতা এইরূপে নিয়মতান্ত্রিক ফ্রন্টের তৎপরতায় পূর্ণ হইয়া যায় এবং এই সর্বপ্রথম কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্তভাবে বৃটিশ সরকারের দুশ্চিন্তার খোরাক যোগায়।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি রচনায় এবং উহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতির ব্যাপারে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রী অম্বিকা মজুমদার, জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, স্যার ওয়াজির হাসান, শ্রী বিজয় রাঘব আচারিয়া প্রমুখ নেতৃবর্গের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭-৫৮ সালে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের পর এই সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমান দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য একযোগে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হন। স্মরণ করা যাইতে পারে, মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা শওকত আলি এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ সেই সময় অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গণ-সংগ্রামের সূচনা

মিত্র শক্তির পক্ষ হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমরে যোগদান জার্মানীর জয়-লাভের সম্ভাবনাকে তাহার নিশ্চিত পরাজয়ে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে সন্ধির প্রার্থনা জানাইয়া রণশ্রান্ত ও নৌ-বিদ্রোহে দুর্বল জার্মানী যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল—পতনোন্মুখ বৃটিশ সাম্রাজ্য আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। আঘাতের পর আঘাত হানিয়া জার্মানী যখন পৃথিবীর সর্বত্র বৃটিশের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন কাবুল, বাটাভিয়া এবং ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতেছিল, বোমার আঘাত এবং রিভলভারের গুলীর ভয়ে এদেশে প্রত্যেকটি ইংরেজ এবং তাহাদের দালালের দল যখন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই চরম দুর্দিনে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনায়কগণ নানা প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যুদ্ধে ভারতবাসীর সক্রিয় সাহায্য ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে যে মোটেই আন্তরিকতা ছিল না এবং উহা ভবিষ্যতে পালন করিতে হইবে না বলিয়াই যে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা যেন ভারতবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্যই যুদ্ধাবসানে বৃটিশ সরকার নূতন মূর্তি ধারণ করিলেন।

যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতিগুলি বিস্মৃতির গহ্বরে ঠেলিয়া দিয়া বিপ্লববাদ দমনের নামে তাঁহারা ব্যাপক ক্ষমতা-সম্বলিত নূতন নূতন আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের উদ্যোগ-আয়োজন করিলেন। যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর বিপ্লবীদল তাঁহাদিগকে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়াছিল সত্য; কিন্তু বৃটিশ সরকারও বিপ্লবীদের এক বিরাট অংশকে জেলে দিয়া, দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিয়া, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া এবং অনেককে স্বদেশ ত্যাগ পূর্বক অজানা, অচেনা দেশে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাসনে যাইতে বাধ্য করিয়া উহার প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ফলতঃ যুদ্ধের শেষ দুই বৎসর

এদেশে বিপ্লবীদের অস্তিত্বই অনুভূত হয় নাই। মনে হইতেছিল, একেবারে মরিয়া না গিয়া থাকিলেও বিপ্লববাদের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বিপ্লবীরা সহজে এবং শীঘ্র মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারিবে না।

বস্তুতঃ, বিপ্লবীদের এই সাময়িক পরাজয়ই বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থাগুলি যুদ্ধাবসানে স্থায়ী আইনে পরিণত করিয়া লইবার পক্ষে উৎসাহ যোগায়। তাই তাঁহারা ইংলণ্ডের খ্যাতনামা আইনজীবী মিঃ রৌলটের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রৌলট বিল নামে অভিহিত একটি খসড়া 'কালো' আইন উত্থাপন করেন। এই আইনে কতকগুলি জঘন্য বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল যাহাকে মানুষের প্রাথমিক অধিকারের সরাসরি অস্বীকৃতি বলা যায়। যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি অনুসারে যে সময় ভারতবাসীরা শাসনকার্যে অধিকতর ক্ষমতা লাভের প্রতীক্ষায় ছিল, ঠিক সে সময় বিপ্লববাদ দমনের ভূয়া অজুহাতে কোটি কোটি নরনারীর প্রাথমিক অধিকার হরণের এই প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই তাহাদিগকে ভয়ানক বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ফলে রৌলট আইনের তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে সমগ্র দেশে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য প্রমুখ উদারপন্থী নেতৃবর্গ বৃটিশ সরকারের ঔদ্ধত্যের জওয়াবে গর্জিয়া উঠিলেন, আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন, বৈঠকে-মজলিশে এবং জনসভায় দাঁড়াইয়া কঠোর ভাষায় ইহার তীব্র নিন্দা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই ইহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না—সরকার পক্ষের ভোটের জোরে আইনটি যথারীতি পাস হইয়া গেল। মর্মাহত জনাব জিন্নাহ্, পণ্ডিত মালব্য এবং আরও কতিপয় নেতা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-পদে ইস্তফা দিয়া আইনের বিরুদ্ধে দেশে জনমত গঠনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এত কিছু দেখিয়াও শাসক সম্প্রদায় তাঁহাদের মতের পরিবর্তন সাধন করিলেন না—দেশব্যাপী আন্দোলন তাঁহাদের চিন্তাধারার উপর সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করিতে পারিল না। উপরন্তু যে কোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তাঁহারা আরও নূতন নূতন আইন রচনার কথা চিন্তা করিতে থাকেন।

দেশব্যাপী হরতাল

রৌলট আইনের বিরুদ্ধে একটি সুচিন্তিত ও কার্যকর কর্মপন্থা রচনার জন্য যখন দেশের চিন্তানায়কগণ অত্যন্ত ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সমগ্র ভারতবর্ষে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য এক আবেদন প্রচার করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নাম ইতিপূর্বেই দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কিছু কাল পূর্বে বিহারে চম্পারণ জেলার শ্বেতাঙ্গ নীলকর ও দেশীয় জমিদারগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণাশ্রয়ী শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিয়াও বহু পূর্বে তিনি এদেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই এই ক্ষেত্রেও যে তিনি সফলকাম হইবেন, জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধারণা করিয়া লইয়াছিল।

ব্যারিস্টার হিসাবে বোম্বাই হাইকোর্টে সুনাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাঁহার পিতার জনৈক মুসলমান ধনাঢ্য বন্ধুর অনুরোধে শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটি মামলা পরিচালনা উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করিয়াছিলেন। সেখানে শ্বেতাঙ্গদের হাতে ভারতীয়দের লাঞ্ছনা দেখিয়া উহার প্রতিকারের জন্য তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারই উদ্যোগে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান তথায় গড়িয়া উঠে। তখন ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, উত্তরকালে ইনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। জীবদ্দশায় পৃথিবীর অপর কোন জননায়ক এত দীর্ঘকাল এত অধিক মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই।

মহাত্মা গান্ধীর আবেদন ব্যর্থ হইল না। নির্দিষ্ট দিন ভারতের সর্বত্র পূর্ণ এবং নিরুপদ্রব হরতাল পালিত হইল। পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার এই হরতালের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ আবিষ্কার করিয়া পাঞ্জাবের সর্বজনমান্য দুইজন নেতা, ডাঃ সাইফ্‌উদ্দীন কিচ্‌লু ও ডঃ সত্য পালকে ৯ই এপ্রিল তারিখে বিনা কারণে গ্রেফ্‌তার-পূর্বক কোন এক অজ্ঞাত স্থানাভিমুখে পাঠাইয়া দেন। বাজারে গুজব রটিল, বৃটিশ সরকার ইঁহাদিগকে ফাঁসি দিতে লইয়া গিয়াছেন। এরূপ

অযথা কার্যে ইংরেজেরা বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার অগণিত নজীর থাকায়, গুজবে প্রায় সকলেই কান দিল এবং বহু লোক ইহার উপর আস্থাও স্থাপন করিল। ইঁহাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে পর দিবস পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর এবং অমৃতসহরে আবার হরতাল পালিত হয়। অপরাহ্নে অমৃতশহরের অধিবাসীরা নেতৃবর্গের গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং বিনাশর্তে অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তির দাবী জানাইবার জন্য এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করে। পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর অনাবশ্যক কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করিয়া তাহাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক করিল। ক্ষিপ্ত জনতা তখন গুলীর ভয় অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজদের কয়েকজনকে হত্যা এবং কয়েকটি সরকারী অফিসে ও বিদেশীয়দের ব্যাঙ্কে অগ্নিসংযোগ করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এতদসত্ত্বেও রাত্রি আটটায় শহরে শান্তি ফিরিয়া আসে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

পরবর্তী দুই দিন দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে পুলিশ বহু নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করিলেও শহরে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। শহরে শান্তিরক্ষার ভার ছিল তখন জেনারেল ডায়ারের উপর। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ১৩ই এপ্রিল বৈশাখী মেলা উপলক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগে বহু সহস্র লোক সমবেত হয়। ডাঃ কিচলু ও ডঃ সত্যপালের মুক্তির দাবীতে সেদিনও তথায় একটি জনসভা আহুত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে সরকার সকল প্রকার সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া সভার উদ্যোক্তাগণ সভা করিলেন না। তবে মেলার বেচাকেনা এবং অন্যান্য কাজকর্ম যথারীতি চলিতে থাকে।

জালিয়ানওয়ালাবাগটি ছিল চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। একটি মাত্র ফটক দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে ও বাহিরে আসিতে হইত। অপরাহ্ন ৩-৪ টার সময় জেনারেল ডায়ার একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়া পার্কের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলকে পার্ক খালি করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দেন। ফটকের কাছে যাহারা উপবিষ্ট ছিল তাহারা ছাড়া আর কেহ তাঁহার এই আদেশের কথা

জানিতেই পারিল না। তাই বালক-বালিকারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত রহিল, দোকানীরা বেচাকেনা করিতে লাগিল এবং পার্কের এক কোণে গান-বাজনা পূর্বের মতই চলিতে থাকিল।

হঠাৎ গুলীবর্ষণ আরম্ভ হইয়া যায়। মুহূর্তের মধ্যে শত শত লোক ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। ভয়ার্ত নারী, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলে ফটকের দিকে দৌড়াইয়া গেল। কিন্তু ভিড়ের দরুন ফটক পার হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিল না—ফটকের ভিতরেই জড়াজড়ি করিয়া বহু লোক সৈন্যদের গুলীতে প্রাণ হারাইল। দশ মিনিটে প্রায় পাঁচ হাজার রাউণ্ড গুলী বর্ষণের পর জেনারেল ডায়ার সৈন্যদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দেন। পরবর্তীকালে একটি সরকারী তদন্ত কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান উপলক্ষে তিনি দম্ভ সহকারে বলিয়াছিলেন, "গুলী শেষ না হইয়া গেলে আমি সকলকে খতম করিয়া দিতাম। তখন যদি আমার হাতের কাছে মেশিন গান থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাও ব্যবহার করিতাম।"

গুলী বর্ষণের পর জেনারেল ডায়ার যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ ত্যাগ করেন, তখন পার্কের ভিতরে কয়েক শত মৃতদেহ এবং সাংঘাতিকভাবে আহত প্রায় দুই সহস্র নরনারী ব্যতীত সেই এলাকায়ও কোন জনমানব ছিল না—যে যে দিকে পারিয়াছিল ইতিমধ্যে ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। জেনারেল ডায়ার আহতদের চিকিৎসার এবং নিহতদের স্থানান্তরের কোন ব্যবস্থা না করায় ইহারা সকলে সারারাত্রি পার্কের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। অনেকের মতে, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে আরও তিনশত লোক বাঁচিয়া যাইত। সরকারী হিসাব অনুসারে এই হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত এবং ১৫০০ জন আহত হইয়াছিল। বেসরকারী কমিটি বিশেষ অনুসন্ধানের পর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন নিহতদের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি। সরকারী হিসাব সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন, কোন সরকারই এসব ক্ষেত্রে কোনদিনই সঠিক তথ্য প্রকাশ করেন না। বেচাকেনা, গাল-গল্প এবং আমোদ-প্রমোদে মত্ত নিরস্ত্র জনতার উপর এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের নজীর পৃথিবীতে বিরল। সিপাহী বিদ্রোহের পর একই স্থানে একই দিন ইংরেজ সৈন্যদের হাতে এত অধিক লোক ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নিহত হয় নাই।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ পাইলে তাই সমগ্র পাঞ্জাব শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার লাহোর, অমৃতশহর এবং অন্যান্য কয়েকটি শহরে সামরিক আইন জারী করিলেন। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন খবর ও মতামত প্রকাশ করিতে সংবাদপত্র পরিচালকগণকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া অন্য প্রদেশ হইতে কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পাঞ্জাবে প্রবেশও তাঁহারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

সামরিক আইন জারী, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সভাসমিতি নিষিদ্ধ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পাঞ্জাবে প্রবেশাধিকার হরণ করিয়া বৃটিশ সরকার বহির্জগৎ হইতে ইহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্বিকারচিত্তে সমগ্র পাঞ্জাবে অত্যাচারের বন্যা প্রবাহিত করিয়া রাখিলেন। পুলিশ ও সৈন্যরা হাজার হাজার লোককে ধরিয়া লইয়া জেলে পুরিতে লাগিল। ইহার ফলে কয়েক দিনের মধ্যে প্রদেশের সমস্ত কারাগার পূর্ণ হইয়া গেল। ছাত্র ও শিক্ষকগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রহারের ভয় প্রদর্শন পূর্বক বৃটিশ পতাকা অভিবাদন করিতে বাধ্য করা হইল। ধৃত লোকজনকে নির্বিচারে রাস্তায় হামাগুড়ি দিতে এবং পুলিশ ও সৈন্যদের সামনে নতজানু এবং জোড়হাত হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করা হইল। বিনা অপরাধে এবং বিনা বিচারে বহু লোককে প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত করা হইল, হাত পা বাঁধিয়া অনেককে প্রচণ্ড রৌদ্রাতপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখা হইল এবং বহু মহিলার শ্লীলতা এবং সম্ভ্রমের হানি করা হইল। ফলতঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর এমন নির্মম অত্যাচার এত ব্যাপকভাবে এত প্রকাশ্যে আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

সভ্য জাতি বলিয়া গর্বিত এবং অভিহিত ইংরেজদের হাতে ভারত-বাসীর উপর এহেন অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিল্লীর স্বনামধন্য হেকিম আজমল খান সরকার প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করিলেন। ইহার কিছু দিন পর বড়লাটের শাসন পরিষদের তৎকালীন একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যার সি. এস. নায়ারও সদস্যপদে ইস্তফা দেন। ইহাদের দেখাদেখি আরও অনেকে বৃটিশ প্রদত্ত উপাধি ইত্যাদি ফেরৎ দেন।

এণ্ডরুজের গ্রেফ্‌তার

কিন্তু সংবাদপত্রের উপর কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের অত্যাচারের কথা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়ে। সরকারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ড্রুজ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া গ্রেফতার হইলেন। অনেকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিবার কোন সুযোগই পাইলেন না—সীমান্ত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পাঞ্জাবে প্রবেশের চেষ্টা করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধীও ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বোম্বাই লইয়া গিয়া বিনাশর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আরম্ভ হয় ধৃত ব্যক্তিদের বিচার। কত লোককে সেই সময় গ্রেফতার করা হইয়াছিল তাহা বলা কাহারও পক্ষে সহজ নয়। কেননা, আদালতে উপস্থিত না করিয়া, থানা ও কারাগারে ভীষণ মারধরের পর শত শত লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। একমাত্র অমৃতসহরের সামরিক আদালত ৫১ জনের ফাঁসি, ৪৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ৭৯ জনের ৭ বৎসর, ১০ জনের ৫ বৎসর, ২ জনের ১০ বৎসর এবং ১৩ জনের ৩ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।

সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হইলে, পাঞ্জাবের মর্মন্তুদ ঘটনাবলী সমগ্র ভারতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং সহস্র সহস্র লোকের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া জনসাধারণ অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য নয় বরঞ্চ উত্তেজিত জনসাধারণকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ইহার পর একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিটির ইংরেজ সদস্যগণ হত্যাকাণ্ড সমর্থন এবং ভারতীয় সদস্যদ্বয় গুলী বর্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া রিপোর্ট দেন। এদিকে ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্স জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় মামুলী ধরনের দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হাউস অব লর্ডস জেনারেল ডায়ারের কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইংরেজ মহিলারা তিন লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাহা জেনারেল ডায়ারকে উপহার দিলেন। বৃটিশ পার্লামেণ্ট এবং ইংরেজ মহিলাদের এই কার্যকে ভারত-

বাসীরা চরম অবমাননা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় রহিল।

পাঞ্জাবের ব্যাপারে সমগ্র ভারত যখন বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত, ঠিক সে সময় সেভার্স সন্ধির শর্তাবলী প্রকাশিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে মিত্রশক্তি বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যবস্থা করেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া মহাসমরে তাঁহারা ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি বিশেষ করিয়া বৃটিশ উক্ত প্রতিশ্রুতির বিষয় বেমালুম হজম করিয়া বসেন। তুরস্কের সুলতান পদাধিকারবলে মুসলিম জগতের খলিফা ছিলেন। সুতরাং সেভার্স সন্ধির শর্তানুসারে খলিফার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন দেখিয়া ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা শওকত আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ সর্বজনমান্য নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল পরে এ সময় কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহারা জনসাধারণের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। প্রিয় নেতৃবৃন্দকে পাইয়া বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমান জনসাধারণের রাগ-রোষ যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

এই অবস্থায় ভাবী কার্যসূচী রচনার জন্য বৃটিশের মহাসমরকালীন চণ্ডনীতির চাপে মৃতকল্প মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একটি অধিবেশন এলাহাবাদে আহুত হয়। এই অধিবেশনে মওলানা আবুল কালাম আজাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমান কর্তৃক অনুসৃত অসহযোগ নীতি পুনরায় অবলম্বনের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। বলা বাহুল্য, সভায় তাঁহার প্রস্তাবটি বিনাবাধায় গৃহীত হয়। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে মহাত্মা গান্ধীও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মওলানা আজাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা দর্শনে মহাত্মা গান্ধী এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, প্রথম পরিচয়েই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। অনুরুদ্ধ হইয়া সভায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'সত্যাগ্রহ নীতি' বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে পর, অসহযোগ নীতির অংশ হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে তাহাও গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম খিলাফত সম্মেলনে

দেশের পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মওলানা আজাদের প্রস্তাবিত অসহযোগ নীতি এবং উহার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ নীতি একই প্রস্তাবাকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে তুরস্কের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের নিকট ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য সদ্য কারামুক্ত মওলানা মোহাম্মদ আলির নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। বাংলা হইতে বর্ধমানের মওলবী আবুল কাসেম উহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ডেপুটেশনের সদস্যগণ লণ্ডন ও প্যারিসে বিশেষ চেষ্টা তদবীর সত্ত্বেও তুরস্ক সম্পর্কে বিজয়ী মিত্রশক্তির নীতি কোন পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ হইয়া শূন্যহস্তে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার পর হইতেই অসহযোগ আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা যায়, এলাহাবাদে লীগ কাউন্সিলে এবং বোম্বাই খিলাফত সম্মেলনে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ নীতি গৃহীত না হইলে কংগ্রেস কর্তৃক উহা আদৌ গৃহীত হইত কিনা বলা যায় না। কারণ, তখন পর্যন্ত কংগ্রেসে নরমপন্থী নেতৃবর্গের প্রাধান্য ছিল।

উপরে যথাস্থানে বলা হইয়াছে, আবেদন-নিবেদনের সাহায্যে দেশের শাসন ব্যাপারে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্য লইয়াই কংগ্রেস জন্মলাভ করে। ন্যূনাধিক ২০ বৎসর কাল কংগ্রেস নিষ্ঠার সহিত এই নীতিই অনুসরণ করে। লোকমান্য তিলক, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবর্গ সর্বপ্রথম ইহার তোষণমূলক নীতিতে পরিবর্তন আনয়ন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত কংগ্রেস জড়িত হইয়া পড়ায়, কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। কংগ্রেসেরই ন্যায় আবেদন-নিবেদনই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র করণীয় কাজ। মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা জাফর আলি খান, জনাব জিন্নাহ, স্যার ওয়াজির হাসান প্রমুখ নেতৃবর্গের যোগদানের পর হইতে মুসলিম লীগের নীতিতেও পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। কিন্তু প্রথম মহাসমরের প্রারম্ভেই ইঁহাদের অনেককে হঠাৎ গভর্ণমেণ্ট অন্তরীণাবদ্ধ করায় মুসলিম লীগেও আবার প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাই রৌলট আইনকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন, হরতাল ও দাঙ্গাহাঙ্গামা

সংঘটিত হইয়াছিল, মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহাতে বিশেষ কোন অংশই গ্রহণ করে নাই। তবে ইহার নেতৃস্থানীয় সদস্যগণের বেশীর ভাগ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

অসহযোগ নীতি

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অনেক বাদানুবাদের পর অসহযোগ নীতি গৃহীত হয়। নির্যাতিত পাঞ্জাবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছা নির্বাসন হইতে সদ্য প্রত্যাবৃত্ত লালা লাজপৎ রায়কে এই অধিবেশনে সভাপতি করা হইয়াছিল। বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট নেতা এবং জনাব জিন্নাহ প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সেই বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেসের উদারপন্থী দলের অন্যতম নেতা হিসাবে জনাব জিন্নাহ অসহযোগ নীতির আবার তীব্র বিরোধিতা করিয়া অকৃতকার্য হন। কংগ্রেস অধিবেশনে ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ উপস্থিতি।

কংগ্রেস কর্তৃক অসহযোগ নীতি পুরোপুরিভাবে গৃহীত হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীর নিকট সরকারী বিদ্যালয়, আদালত, আইন সভা ও উপাধি বর্জনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। মাদক দ্রব্যাদি এবং বিদেশী পণ্য বর্জনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের সময় বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলন বাংলায় বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই নিকট হইতে এ ব্যাপারে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির আহ্বানে স্কুল-কলেজ হইতে দলে দলে ছাত্ররা বাহির হইয়া আসিতে থাকিলে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন নামে কলিকাতায় একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকিল জনাব ওয়াহেদ হোসেন ইহার কর্মসচিব এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে পদত্যাগী শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ সময় মফস্বলেও অনেক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু ব্যারিস্টার, উকিল, মোক্তার আদালত বর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে মামলাকারীরা তাহাদের মামলা উঠাইয়া লইয়া গ্রাম্য

পালিসের হাতে ন্যস্ত করিতে থাকে। বহু হিন্দু ও মুসলমান আইন সভার সদস্যগিরি, সরকারী খেতাবধারীরা তাহাদের খেতাব এবং মদ্যপায়ীরা মদ ত্যাগ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই গণজাগরণ সত্যই ছিল অভূতপূর্ব।

সমগ্র দেশ যখন অসহযোগ আন্দোলনে আলোড়িত, সে-সময় সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয়, ইংলণ্ডের যুবরাজ (অষ্টম এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে আসিতেছেন। তাঁহার আগমনের প্রতিবাদে ১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর সমগ্র ভারতবর্ষে আবার পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া এ সময় সহস্র সহস্র লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান, জনাব তমিজউদ্দিন খান, শ্রীপদ্মরাজ জৈন, শ্রী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, জনাব মুজিবর রহমান, শ্রী জে. এম. সেনগুপ্ত, পীর বাদশা মিয়া, জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এবং আরও বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেফতার হন। বস্তুতঃ জনাব ফজলুল হক ছাড়া নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের প্রায় সকলেই এ সময় গ্রেফতার হইয়াছিলেন। জনাব ফজলুল হক সে-সময় মত ও পথ ঘনঘন পরিবর্তন করিয়া দেশবাসীর আস্থা খানিকটা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

এদিকে গ্রেফ্তারের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, আন্দোলন ততই ব্যাপক ও জোরদার হইয়া উঠিল। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম খিলাফত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে খিলাফত কমিটি তুরস্ক সম্বন্ধে মিত্রশক্তির সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধন এবং খিলাফতের প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য ইহার কিছুদিন পূর্বে মওলানা মোহাম্মদ আলির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তাঁহারা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। দমন-নীতির ব্যাপক প্রয়োগক্রমে সহস্র সহস্র লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া বৃটিশ সরকার আন্দোলনের শ্বাসরোধ করিয়া

ইহাকে মারিয়া ফেলিতে তাঁহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁহাদের সেই অপচেষ্টা ফলবতী হইতে দিলেন না। তাঁহারা উভয়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করিয়া জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের দর্শনের জন্য এক একটি সভায় এত জনসমাগম হইত যে, ইতিপূর্বে আর কখনও সেরূপ দেখা যায় নাই।

খিলাফত ডেলিগেশনের নেতা হিসাবে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মওলানা মোহাম্মদ আলি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বর্জনের জন্য উহার ছাত্র ও অধ্যাপকগণের নিকট আবেদন জানান। ইহাতে সাড়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের এক বৃহৎ অংশ বাহির হইয়া পড়ে। আলিগড়ের বিকল্প বিদ্যালয় হিসাবেই 'জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দিল্লীতে এখনও চালু রহিয়াছে। এদেশের ধনিকদের সন্তানদিগকে অত্যধিক ব্যয়ে বিলাতী আদব-কায়দায় কথাবার্তা, চালচলনে অভ্যস্ত এবং একটি অ-ভারতীয় ও অ-ইংলিশ জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া ইংরেজ অধ্যাপকগণের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে বৃটিশ রাজভক্ত ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ সযত্নে আলিগড়ে যে সৌধ নির্মাণ করেন, আলিগড়েই শিক্ষাপ্রাপ্ত মওলানা মোহাম্মদ আলির প্রথম আঘাতে এইরূপে উহার ভিত্তিদেশে ফাটল ধরে। এই ফাটল বন্ধ করিতে কয়েক বৎসর অনেক কাঠখড়ি পোড়াইতে হইয়াছিল।

বর্দৌলীর সিদ্ধান্ত

ইতিমধ্যে ধর-পাকড় এবং অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে থাকায় উহার প্রতিষেধক হিসাবে মহাত্মা গান্ধী বর্দৌলীতে কর বন্ধের আন্দোলন চালাইবার উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন বর্দৌলী যদি এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে একই সময় সমগ্র ভারতে কর বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। তাঁহার এই ঘোষণার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি নিপতিত হয় বর্দৌলীর উপর। বর্দৌলী ছিল সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের কর্মক্ষেত্র।

কিন্তু ভারতবর্ষ কর বন্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা লাভ করুক, ইহা বিধাতার যেন ইচ্ছা ছিল না। তাই বর্দৌলী হইতে বহু শত মাইল দূরে হঠাৎ এমন এক ঘটনা সংঘটিত হয়, যেজন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে বাধ্য হন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্ত-প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত চৌরীচৌরা থানার অধিবাসীরা পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উক্ত থানা আক্রমণ এবং উহাতে অগ্নি সংযোগ করে। ফলে ২১ জন কনস্টেবল সহ থানার দারোগা অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনেকের ধারণা, মহাত্মা গান্ধীকে কর বন্ধ আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালাইবার জন্য পুলিশকে যেমন উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিজেদের গুপ্তচরদের সাহায্যে জনসাধারণকে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্ররোচনাও দিয়া আসিতে-ছিলেন। এই সন্দেহের পশ্চাতে কোন সত্য আছে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বর্দৌলী গমন পূর্বক মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের এই সাক্ষাৎকার এবং গোপন আলোচনা মহাত্মা গান্ধীর মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তিনি তাঁহারই ভাষায় 'হিমালয় পর্বত প্রমাণ' ভুল করিয়া বসেন। কর বন্ধ আন্দোলন আপাততঃ স্থগিত রহিল, এই মর্মে চৌরীচৌরার বেদনাদায়ক ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পরে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। যেহেতু এই সিদ্ধান্তের সহিত পণ্ডিত মালব্যের নাম যুক্ত রহিয়াছে, তজ্জন্য চৌরীচৌরার ঘটনার পশ্চাতে বৃটিশ সরকারের হাত ছিল বলিয়া লোকের ধারণা। কারণ কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন সভাপতি হইয়াও তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাহাতে বিদ্যালয় বর্জন না করে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান হইতে বিরত ছিলেন।

বর্দৌলীতে কর বন্ধ আন্দোলন স্থগিতের কারণ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, চৌরীচৌরার ঘটনা হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন,

দেশ অহিংস সংগ্রামের জন্ম প্রস্তুত হয় নাই এবং হিংসার পথ বাহিয়া স্বরাজ আসিবে না এবং উহা তাঁহার কাম্যও নয়। দেশকে গড়িয়া তোলার জন্ম তাই তিনি কংগ্রেসের সম্মুখে একটি গঠনমূলক কার্যসূচী উপস্থাপিত করেন এবং কংগ্রেস কর্তৃক উহা যথারীতি গৃহিতও হয়। কিন্তু এই কার্য-সূচী যুব সম্প্রদায়ের মনঃপূত হইল না। ফলে যাহারা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া কারাবরণ করিয়াছিল, মুক্তির পর তাহাদের শতকরা ৮০ জন আবার স্কুল-কলেজে প্রবেশ করিল। আইনজীবিগণ আদালতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং বাজারে আবার বিদেশী পণ্যদ্রব্য দেখা দিল। প্রথমে এক মাস, পরে এক বৎসরের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতিশ্রুত 'স্বরাজ' আসিল না। যে আশায় বুক বাঁধিয়া সহস্র সহস্র লোক কারাবরণ করিয়াছিল তাহা সুদূর পরাহত মনে হইতেই অনেকেরই মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল, অনেকের মনে সংশয় দেখা দিল, অনেকে অনুতপ্ত হইল।

কিন্তু বাহ্যতঃ আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়িলেও গঠনমূলক কার্য অব্যাহতভাবে চলিল শহরে এবং গ্রামে গ্রামে। চারিদিকে হতাশা এবং নিরুৎসাহের মধ্যেও মুসলিম লীগের আহমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতীয় মুসলমানের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। সভাপতি হিসাবে এই উপলক্ষে ভারতের অগ্নি-পুরুষ মওলানা হসরত মোহানী যে জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রায় একই সময় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনেও মওলানা হসরত মোহানী স্বাধীনতার প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর স্বয়ং বিরোধিতা করায় ভোটাধিক্যে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। বর্দোলীর ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের স্থায় ইহাও কংগ্রেসের পক্ষে একটি লজ্জার ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপনের অভিযোগে মওলানা হসরত মোহানীকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

উপরে বলা হইয়াছে, মহাসমরের মধ্যভাগে বৃটিশ সরকার বিপ্লবী-দিগকে এমনভাবে দমন করেন যে, তাহারা যে আবার সহজে এবং শীঘ্র মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন এ বিশ্বাস অনেকেরই লোপ পাইয়া-ছিল। মহাসমর অবসানের পর অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনে

সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বরাজ লাভের জন্য এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করেন। মুসলমানেরা তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আন্দোলনে যোগদান করায় স্বাধীনতার আন্দোলন এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, সন্ত্রাসবাদের আর কোন আবশ্যকতাই তখন অনেকের কাছে অনুভূত হয় নাই। নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁহারা তখনও আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারা সেই অবস্থায়ই অলস জীবন যাপন করিতে থাকেন। অনেকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯১৯ সালে রচিত মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তনের মুখে ১৯২১ সালে বিপ্লবীদের অনেকে কারাগার হইতে ছাড়া পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অবশিষ্ট বিপ্লবীরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া অসহযোগ আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিতে থাকেন।

বিপ্লবীদের পুনরাবির্ভাব

কংগ্রেস কর্তৃক মধ্যপথে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে, উহার ব্যর্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া বিপ্লবীরা তাহাদের সাবেক কার্যে ফিরিয়া যান। গোড়াতেই তাহাদের অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিপ্লবী বরেন্দ্র ঘোষ অপর তিনজন সঙ্গীসহ ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতার অন্যতম জনবহুল অঞ্চল শাঁখারীটোলার পোস্টঅফিসে হানা দিয়া পোস্টমাস্টার অমৃত লাল রায়ের নিকট সরকারী তহবিলের টাকা দাবী করেন। পোস্টমাস্টার অস্বীকার করায় বিপ্লবীরা তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করেন। কিন্তু পোস্টঅফিসের দুইজন কর্মচারী জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া পলায়নপর বিপ্লবীদের পশ্চাদ্ধাবন পূর্বক বরেন্দ্রকে ধরিয়া ফেলে। বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিলে এই দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। কিন্তু রাজানুকম্পায় তাঁহার ফাঁসির আদেশ পরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্তিত হয়।

শাঁখারীটোলার ঘটনার কিছু দিন পূর্বে হাওড়া জেলার কোনা নামক স্থানে যুগান্তর সমিতির কতিপয় বিপ্লবী একটি ডাকাতি করেন। ইহাতে তাহাদের গুলীতে দুইজন গ্রামবাসী নিহত হয়। এতদ্ব্যতীত খুব সম্ভব উপরোক্ত সমিতির বিপ্লবীরাই উল্টাডাঙ্গা পোস্টঅফিস লুণ্ঠন এবং কলিকাতার গড়পার রোডে একটি বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতিতেও এক ব্যক্তি নিহত হয়। সরকার এ সকল ঘটনার কোন কূল-কিনারা করিতে না পারিয়া ছাড় প্রাপ্ত বিপ্লবীদের খোঁজ-খবর লইতে ও গ্রেফতার করিতে শুরু করেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত আছেন সন্দেহে এ সময় তাঁহারা শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসুকে আটক করেন। তিনি সে সময়ে কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট বিপ্লবীদের এক নম্বর শত্রু ছিলেন। গোপীনাথ সাহা নামক শ্রীরামপুরের জনৈক বিপ্লবী তাঁহার হত্যার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতার মেসার্স কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানীর ম্যারিন সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ আর্ণেস্ট ডে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া চৌরংগী রাস্তার উপর অবস্থিত হল এণ্ড এণ্ডার্সনের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিনিসপত্র দেখিতেছিলেন। গোপীনাথ তাঁহাকে টেগার্ট মনে করিয়া তাঁহার উপর উপর্যুপরি কয়েকবার গুলী বর্ষণ করেন। প্রথম দুই গুলীতেই মিঃ ডে-র সংজ্ঞা লোপ পায়।

গুলীর শব্দ শুনিয়া চারিদিক হইতে লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে আসিতে থাকিলে, গোপীনাথ পার্কস্ট্রীট ধরিয়া পূর্বদিকে দৌড়াইতে থাকেন। জনৈক ট্যাক্সি-চালক তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে দেখিয়া গোপীনাথ তাহাকেও লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়েন। গুলীটি তাহার তলপেট বিদ্ধ করে। পার্কস্ট্রীটের দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গোপীনাথ একজন ট্যাক্সি-চালককে তাঁহাকে লইয়া ওয়েলেসলী অভিমুখে যাইতে বলেন। ট্যাক্সি-চালক সম্মত না হওয়ায় তিনি তাহার উপরও গুলীবর্ষণ করেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটেও তিনি অপর একজনকে একই কারণে আহত করেন। অবশেষে ওয়েলেসলী ও রিপন স্ট্রীটের সংগমস্থলে শ্রান্ত গোপীনাথ ধরা পড়িয়া যান।

যথাসময়ে গোপীনাথকে কলিকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করেন। এক মাস পর বিচারপতি পিয়ার্সনের এজলাসে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি স্পেশাল জুরী গোপীনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিলে, বিচারপতি তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া তাহার ফাঁসির আদেশ দেন। ১লা মার্চ অতি প্রত্যুষে প্রেসিডেন্সী জেলে গোপীনাথের যখন ফাঁসি হয়, সে সময় শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জেলের সদর ফটকে উপস্থিত ছিলেন। গোপীনাথের আত্মদান সমগ্র দেশে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ঐক্য ফর্মুলা

ইহার কিছুদিন পর কিন্তু সেই বৎসরই সিরাজগঞ্জে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে গোপীনাথের দেশপ্রেম ও নীতির সমর্থনসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি লইয়া সভায় ভয়ানক মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। সিরাজগঞ্জেই দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস রচিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ফর্মুলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় এই অধিবেশনটি সমধিক গুরুত্ব লাভ করে। এই ঐক্য ফর্মুলা দেশবন্ধুকে হিন্দু-মুসলমানের নিকট অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু ফর্মুলাটি বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়। এই সুযোগে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য-বিরোধী দল ১৯২৬ সালে উহার কৃষ্ণনগর অধিবেশনে ফর্মুলাটি নাকচ ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। মূলতঃ ইহারই ফলে কংগ্রেসের উপর মুসলমানদের আস্থা হ্রাস পাইতে থাকে।

কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান ছিল। হিংসাত্মক কোন কার্যই কংগ্রেস আয়ত্ত-সমর্থন করিতে পারিত না। এমতাবস্থায় গোপীনাথ সম্পর্কিত প্রস্তাবের বৈধতার প্রশ্ন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে

আলোচিত হইবে স্থির হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তৎপূর্বেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে শুধু উহারই প্রতিধ্বনি হইল। পর বৎসর ডঃ মোখ্‌তার আহমদ আনসারীর সভাপতিত্বে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। প্রস্তাব গ্রহণ ও পরে বাতিলের মধ্য দিয়া এরূপে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দলের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের একদল অহিংস নীতির দৃঢ় সমর্থক ছিল, পক্ষান্তরে অপর দলটি প্রয়োজনবোধে দেশের স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করিতেও প্রস্তুত ছিল। বাংলা দেশে শ্রী যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু যথাক্রমে এই দুইটি দলের নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাহাদের নেতৃত্বের কোন্দলে প্রাদেশিক কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে।

মোপলা বিদ্রোহ

দক্ষিণাত্যের মালাবার এলাকায় বহু মুসলমানের বাস। ইহারা সাধারণতঃ মোপলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা নিজেদের আরব বণিকদের বংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করে। ইহারা সাহসী ও ধর্মভীরু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহারা বৃটিশ সরকারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে চারিবার যথা, ১৮৭৩, ১৮৮৫, ১৮৯৪ এবং ১৮৯৬ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের হাতে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে। কৃষিই মোপলাদের প্রধান উপজীবিকা। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়া অত্যন্ত অনগ্রসর বলিয়া হিন্দু জমিদার, হিন্দু মহাজন ও হিন্দু তহশীলদারগণ ইহাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কোন মহল হইতেই ইহারা তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার পাইত না।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ মালাবারকেও স্পর্শ করে। পবিত্র খিলাফতের পুনরুদ্ধার এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন করিয়া নিজেদের দীর্ঘকালের অভাব-অভিযোগের অবসান ঘটাইতে পারিবে মনে করিয়া ইহারা অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে পর বৃটিশ সরকার ইহাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইহার দরুন আর একটি নূতন বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া বৃটিশ সরকার সমগ্র মালাবারে জনসভার অনুষ্ঠান, বাহির হইতে সংবাদ ও সংবাদপত্রের প্রবেশ এবং মালাবারে হইতে বাহিরে বিনা সেন্সরে টেলিগ্রাম ও ডাকযোগে পত্রাদি প্রেরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া কার্যতঃ মালাবারের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। এদিকে পুলিশ ও সৈন্যরা প্রত্যেকটি বাড়ীতে তল্লাশী চালাইতে থাকে। হিন্দু মহাজন, জমিদার ও তহশীলদারগণ একার্যে পুলিশ এবং সৈন্যদিগকে সাহায্য করিতে থাকায় মোপলারা অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের ন্যায় তাহাদেরও বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অত্যাচার চরমে পৌঁছিলে, ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মোপলারা দস্তুরমত স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দেয়।

বিদ্রোহ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে মোপলারা বৃটিশ সরকারের হাত হইতে এরনাদ এবং ওয়ালুভানাদ নামক দুইটি বৃহৎ তালুক ছিনাইয়া লইয়া সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের নেতাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর তাহারা পার্শ্ববর্তী তালুকগুলি অধিকারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সংবাদ ভারতবর্ষে সর্বত্র চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি এবং বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া দিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলি মোপলাদের শান্ত করার জন্য মালাবার যাইতে প্রস্তুত হন। ইহা জানিতে পারিয়া বৃটিশ সরকার বলিয়া পাঠান, মালাবারের বাহিরের কোন লোককেই তাঁহারা সেখানে প্রবেশ করিতে দিবেন না। এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞা কেন নেতৃবর্গ ভঙ্গ করেন নাই, তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

ট্যাঙ্ক ও রণপোত আমদানী

ইতাবসরে বৃটিশ সরকার মালাবারে শত শত সৈন্য, ছোট বড় ট্যাঙ্ক, কামান, বোমা, কয়েকখানি গানবোট এবং রণপোত প্রেরণ করিয়া এমন এক অবস্থার অবতারণা করেন যেন তথায় কোন বড় রকমের

যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিদ্রোহের গোড়ার দিকে, বিশেষ করিয়া স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৃটিশ সৈন্য ও পুলিশের ন্যায় কতিপয় অত্যাচারী জমিদার এবং মহাজন জনতার রুদ্র রোষে পতিত হইয়া প্রাণ হারান। বৃটিশ সরকার ইহাদের হত্যাকে সাম্প্রদায়িকতার রূপদান করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়কে মোপলাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দেন। ইহার ফলে মালাবারের হিন্দু জনসাধারণ সৈন্য এবং পুলিশের সহায়তার জন্য আগাইয়া যায়। ইহার পর হইতে মোপলাদিগকে হিন্দুদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এক মাসের ঊর্ধ্বকাল স্থায়ী এই অসম যুদ্ধে বৃটিশ সরকার মোপলা এলাকাসমূহের উপর আকাশ হইতে বোমা, রণতরী হইতে শেল, ট্যাঙ্ক এবং কামান হইতে নির্বিচারে গোলাগুলী বর্ষণ করিয়া প্রায় দশ হাজার মোপলা নরনারীর প্রাণ সংহার ও তাহাদের বাড়ীঘর, দোকানপাট, ক্ষেত-খামার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া দেন। ইহার পর আরম্ভ হয় ধর পাকড় এবং পৈশাচিক অত্যাচার। ইহা কত চরমে পৌঁছিয়াছিল তাহা এই একটি মাত্র ঘটনা হইতে অনুমেয়ঃ বিদ্রোহের আশি জন নেতাকে বন্দী করিয়া সৈন্যরা রেলগাড়ীর একটি বন্ধ কামরায় কালিকটে প্রেরণ করে। কালিকটে কামরাটির দরজা খোলা হইলে দেখা যায়, পথে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ছেষট্টিজন প্রাণ হারাইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মোপলাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের লাশের প্রতিও কোন সম্মান প্রদর্শন করা হয় না এবং তাহা আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করিতে সরকার অসম্মত হন।

বিচার ও দণ্ড

এতদ্ব্যতীত বিদ্রোহের অভিযোগে প্রায় বিশ সহস্র মোপলা নরনারীকে এ সময় গ্রেফতার করা হয়। জেল হাজতে ইহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের পর সরকার ইহাদিগকে বিচারের জন্য স্পেশাল কোর্টে প্রেরণ করেন। বাহিরের কোন আইনজীবীকে মালাবারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া ইহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতেও বঞ্চিত থাকে। কারণ মোপলাদের মধ্যে যেই নগণ্য সংখ্যক আইনজীবী ছিলেন, তাঁহা-দের সকলকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। এক তরফা বিচারের ফলাফল

প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বিচারাধীন মোপলাদের ঘরে ঘরে অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার উঠে। বহু নারী ও শিশু এ সময়ে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। বিশ হাজার আসামীর মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক মোপলা বিচারে খালাস পায়। প্রকাশ, প্রায় এক হাজার লোকের ফাঁসি হয়। যাবজ্জীবন, দীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত মোপলার সংখ্যা ছিল দুই হাজারের উপর। পাঁচ হইতে দশ বৎসর সশ্রম কারাবাস লাভ করিয়াছিল প্রায় আট হাজার মোপলা। অবশিষ্টদের মধ্যে কাহারও কারাদণ্ড ছয় মাসের কম ছিল না। উপদ্রুত এলাকার মসজিদগুলির প্রায় সব ইমামই রাজদ্রোহিতার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মোপলারা দ্বীপান্তরে কয়েক বৎসর বর্ণনাতীত দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর, বৃটিশ সরকার ইহাদের পরিজনবর্গকে তাহাদের সঙ্গে বসবাসের জন্য আন্দামানে যাইতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে অনেকেরই অসহায়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তথায় গমন করেন।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ইতিহাসে মোপলাদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী মোপলাদিগকে সাহসী, দেশপ্রেমিক ও ধর্মভীরু নামে অভিহিত করা সত্ত্বেও, নিখিল ভারত কংগ্রেস মোপলাদের ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবন্মৃত মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজও বৃটিশ সরকারের দরবার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। একমাত্র খিলাফত কমিটি ইহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্যদান করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে অনাহারে আরও কয়েক সহস্র নরনারীকে অকালে মৃত্যুবরণ করিতে হইত। মোপলাদের ব্যাপারে কংগ্রেসের এই নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তা কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যগণের মনে দারুণ ক্ষোভ ও দুঃখ সঞ্চারিত করিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, মোপলা হত্যাকাণ্ডে মালাবারের হিন্দুদের সমর্থন ছিল বলিয়াই কংগ্রেস নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল। মোপলাদের এই বিচারের সহিত সিপাহী বিদ্রোহোত্তর দিল্লীর পাইকারী বিচার ও শাস্তির হুবহু সাদৃশ্য রহিয়াছে। মওলানা শওকত আলি নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির সভাপতি ছিলেন। মোপলাদের ব্যাপারে কংগ্রেসের অর্থপূর্ণ নীরবতায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বাগ্রে ইহার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার

প্রথম মহাসমরকালীন প্রতিশ্রুতি পালনের কোন অভিপ্রায়ই বৃটিশ সরকারের ছিল না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু মুখ রক্ষার জন্য কিছু না করিয়াও উপায় ছিল না। এইজন্য তাঁহারা ১৯১৯ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে 'ভারত শাসন আইন' নাম দিয়া একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। তদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং ভাইসরয় লর্ড চেম্‌সফোর্ডের নামানুসারে ইহা মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই আইনে ভারতবাসীর হাতে যে সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায়, তাঁহারা দেশবাসীকে উহা বর্জনের আহ্বান জানান। ইহার ফলে ১৯২১ সালের নির্বাচনে যোগ্য ব্যক্তিগণের বেশীর ভাগ প্রতিদ্বন্দিতা হইতে দূরে থাকেন।

কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা বৃটিশ সরকারের প্রতি তাহাদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের জন্য অবাঞ্ছিত ও অযোগ্য লোকদিগকে ভোট দিয়া আইন সভার সদস্য করিয়া পাঠান। নোয়াখালীর অধিবাসীরা মোকারম আলি নামক গরুর গাড়ীর জনৈক নিরক্ষর গাড়োয়ান এবং ততোধিক মূর্খ রসিকলাল চর্মকার নামক এক মুচিকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নির্বাচিত ও সরকার মনোনীত সদস্যগণের সমবায়ে গঠিত আইন সভার কাজ চলিতে থাকে। ইহাদের দ্বারা সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী আইনকানুন রচনা করিতে থাকায়, নেতৃবর্গের কেহ কেহ আইন সভা বর্জনের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করেন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠা এই উপলব্ধিরই ফল। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস ছাড়াও সর্বভারতীয় জননায়কগণের মধ্যে ডঃ এম. এ. আনসারী এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এই নীতির অন্যতম প্রধান সমর্থক

ছিলেন। তবে ডঃ আনসারী আইন পরিষদের কোন নির্বাচনে প্রার্থী হন নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মৃত্যুর পূর্বে একবার তিন বৎসর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা সমন্বিত এবং সর্বস্তরে ভাইসরয় ও প্রাদেশিক গভর্ণর-গণের নিয়ন্ত্রণাধীন মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার ভারতবাসীরা গ্রহণ করিবে না বুঝিতে পারিয়াই বিক্ষুব্ধ জনমতের সান্ত্বনার জন্য ১৯২০ সালে বৃটিশ সরকার দণ্ডপ্রাপ্ত ও অন্তরীণাবদ্ধ বহু বিপ্লবীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত শ্রী শচীন্দ্র সান্যালও সে সময় মুক্তিলাভ করেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য যোগেশ চ্যাটার্জী, রাজেন্দ্র লাহিড়ী এবং তিনি কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং কাশীতে নূতন করিয়া আবার একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। কিন্তু শীঘ্রই শচীন্দ্র সান্যাল রাজদ্রোহের অভিযোগে দুই বৎসরের জন্য জেলে চলিয়া যান। যোগেশ চ্যাটার্জী তৎপূর্বেই অন্তরীণাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুপস্থিতি দারুণভাবে অনুভূত হইলেও দলের কাজ ভালভাবেই চলিতে থাকে। তবে ১৯২০ সালের পূর্বে বেশী সংখ্যক যুবক এদিকে আকৃষ্ট হয় না।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা

দলের অর্থাভাব দূর করিবার জন্য ১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশের একদল বিপ্লবী কাকোরী ও আলম-নগর স্টেশনের মধ্যবর্তী এক স্থানে শিকল টানিয়া একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামাইয়া গার্ডের গাড়ীতে রক্ষিত লোহার সিন্দুকটি নামাইয়া ফেলে। বিপ্লবীদের ধারণা ছিল, বাক্সে বহু টাকা আছে। কিন্তু বাক্সে ছিল মাত্র সাড়ে চারি হাজার টাকা। বিপ্লবীরা যখন বাক্সটি ভাঙ্গিতেছিল তখন কিছু সংখ্যক যাত্রী তাহাদিগকে সাধারণ ডাকাত মনে করিয়া ধরিবার জন্য অগ্রসর হয়। আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবীরা গুলী ছোড়ে। ইহাতে একজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুলিশ বহু জায়গায় হানা দেয় এবং সর্বমোট ৪৪ জনকে গ্রেফ্‌তার করে। তাহারা এ সম্পর্কে বিপ্লবী আশ্‌ফাক উল্লাহ, চন্দ্রশেখর আজাদ, শচীন্দ্র বক্‌শী প্রমুখ আরও কতিপয় বিপ্লবীর খোঁজ করিতে থাকে।

কাকোড়ীতে ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়। লক্ষ্ণৌ শহরে জনৈক শ্বেতাঙ্গ বিচারকের এজলাসে ১৯২৬ সালের ৩রা মে ধৃত ব্যক্তিগণের বিচার আরম্ভ হইয়া ১৯২৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী মামলার শুনানীর শেষ হয়। ইহার প্রায় চারি সপ্তাহ পর বিচারক তাঁহার রায়ে রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রওশন ও রাম প্রসাদের ফাঁসির আদেশ দেন। শচীন্দ্র সান্যাল পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহা ছাড়া দুই পর্যায়ে বিচারে বনোয়ারী লাল, গোবিন্দ কর, মুকুন্দ লাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ নাথ গুপ্ত, প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়, রামকিষণ ক্ষেত্রী, সুরেশ ভট্টাচার্য, বিষ্ণু শরণ, রাজকুমার সিংহ, রাম দুলাল ত্রিবেদী প্রমুখ বিপ্লবীগণ বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রমাণাভাবে হরগোবিন্দ ও শচীন্দ্র নাথ এবং রাজসাক্ষী বানারসী লাল ও ইন্দুভূষণ মুক্তি পায়। ধরা পড়িবার পর পলাতক আশফাক উল্লাহর প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রওশন, রাম প্রসাদ ও আশফাকের পক্ষ হইতে লক্ষ্ণৌর জুডিশিয়াল কমিশনারের নিকট আপীল করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন জেলখানায় ইঁহাদের চারিজনের একই দিন ফাঁসি হয়। যুক্ত-প্রদেশের বিপ্লবীদের মধ্যে আশফাক উল্লাহ্র স্থান ছিল দ্বিতীয়।

করাচীর মামলা

মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার বর্জনের পর আশু করণীয় কিছু না থাকায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি গঠন-মূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। বৃটিশ সরকার তবু নেতৃবর্গকে অধিক দিন কারাগারের বাহিরে থাকিতে দিলেন না। করাচীতে একটি সম্মেলন উপলক্ষে খিলাফত আন্দোলনের নায়কগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাইয়া সরকার ১৯২২ সালে বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহাদিগকে গ্রেফ্তার করেন। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলি, ডঃ সাইফ্উদ্দীন কিচলু, মওলানা হোসেন আহমদ ছিলেন অন্যতম। রাজদ্রোহ ও সৈন্যদের মধ্যে বৃটিশ-বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে

করাচীতেই ইঁহাদের বিচার হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এই বিচারের সময় যে সাহস ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে সত্য ও ত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকিবে। খাঁটি অসহযোগী হিসাবে নেতৃবর্গ আদালতের কার্যে সাক্ষাৎভাবে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। ফলে এক তরফা বিচারে একমাত্র হিন্দু নেতা শ্রী শঙ্করাচার্য ব্যতীত অপর ছয়জন নেতার প্রত্যেককে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারাগারেই মওলানা মোহাম্মদ আলির স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। অখাদ্য পরিবেশনের প্রতিবাদে কারাগারে ডঃ কিচ্‌লু একবার প্রায়োপবেশনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মীদের ধর-পাকড় পূর্ণোদ্যমে চালু থাকাবস্থায় মহাত্মা গান্ধী কয়েকটি অভিযোগে ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যারবেদা জেলে প্রেরিত হন। কারাগারে অবস্থানকালে তাঁহার পেটে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের পরামর্শের ব্যতিক্রমে তিনি জনৈক ইংরেজ সিভিল সার্জনকে দিয়া অস্ত্রোপচারের কাজ সমাধা করিয়া লইয়া অসাধারণ মনোবলের পরিচয় প্রদান করেন।

দ্বিতীয় দফা ধর-পাকড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সরকার প্রথমবারের ন্যায় পাইকারীভাবে কংগ্রেস এবং খিলাফত কর্মিগণকে গ্রেফ্‌তারের পরিবর্তে শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকেই গ্রেফতার করিয়া তাঁহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে থাকেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, এই উপায়ে তাঁহারা আন্দোলনকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই আশা স্বপ্নই থাকিয়া যায়। লাভের মধ্যে বিপ্লববাদীদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। শুধু তাই নয়, এইবার পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায় হিন্দু ছাত্র ও যুবক বিপ্লবীদের দলে যোগদানের জন্য আগাইয়া আসিতে থাকে। হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়ায় স্বভাবতঃই তাহারা বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। জেল ভীতি তাহাদের মন হইতে ইতিপূর্বেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। সংস্কারমুক্ত হইয়া হিন্দু বিপ্লবীরা এই সময় যদি মুসলিম যুবকদিগকে দলে টানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তবে বহু মুসলমান যুবকও ইহাতে যোগ দিত। কিন্তু হিন্দু বিপ্লবীরা এ ক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা

কাকোড়ী ট্রেন ডাকাতির কিছুদিন পর কলিকাতায় শোভাবাজারের একটি বাড়ীতে এবং কলিকাতা হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরে দুইটি বাড়ীতে পুলিশ বোমা তৈরীর কারখানা, কয়েকটি বোমা, বোমা তৈরীর দ্রব্যাদি, রিভলভার প্রভৃতি বহু আপত্তিকর জিনিসপত্র আবিষ্কার করে। এ সম্পর্কে পুলিশ হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের প্রখ্যাত বিপ্লবী রাজেন্দ্র লাহিড়ী, প্রমোদ চৌধুরী, অনন্ত হরি এবং আরও কতিপয় কর্মীকে গ্রেফতার করে। ইহাদিগকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা চলে। বিচারে উক্ত তিনজনেরই দশ বৎসর করিয়া এবং অন্যান্যদের প্রত্যেকের দুই হইতে পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়। কাকোড়ী ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ রাজেন্দ্র লাহিড়ীর খোঁজ করিতেছিল। সুতরাং বিচারের জন্য তাঁহাকে লক্ষ্মৌ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেই বিচারে তাঁহার উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ হওয়ায় দক্ষিণেশ্বর মামলার বিচারে প্রদত্ত শাস্তি ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় নাই। গ্রেফতারের পর পুলিশ তাঁহার উপর বর্ণনাতীত অত্যাচার করিয়াছিল। যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবীদের তালিকায় তাঁহার স্থান ছিল তৃতীয়।

দেহ ও মন উভয়কে পাথরের ন্যায় শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে খাঁটি বিপ্লবী হওয়া যায় না—ক্ষমার অবতার হইলে মোটেই না—বিপ্লবীরা তাঁহাদের জীবনে এই সত্যটি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে কোন উচ্চ মূল্যে হোক না কেন আঘাতের পরিবর্তে আঘাত হানাই ইহারা প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। জেলের কঠোর শাসনের মধ্যেও তাঁহারা এ নীতিরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন আগাগোড়া। ইহাদের উপস্থিতির জন্যই কারাগারগুলিতে পাহারাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়।

নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যার কথা উপরে বলা হইয়াছে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯২৬ সালের ২৮শে মে বিপ্লবীদের দ্বারা আর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। দক্ষিণেশ্বর এবং শোভাবাজার হইতে ধৃত দশজন বিপ্লবীকে রাখা হইয়াছিল এই জেলে। তাঁহাদের ওয়ার্ডের পার্শ্বেই ছিল রাজনৈতিক কারণে আটক অন্যান্য বন্দীদের ওয়ার্ড। কখন এবং কোথায় তাঁহাদের

বিচার হইবে কিম্বা আদৌ হইবে কিনা, তাহা আটক বন্দীদিগকে কখনও জানিতে দেওয়া হইত না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে অনেকের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িত। আরও একটি উপায়ে পুলিশের লোকজনরা বিপ্লবীদের ধৈর্য ও মনোবল ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিত। জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাহারা কোন কোন বিপ্লবীকে নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসাইয়া রাখিত। একই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না। একই বিপ্লবীকে হয়ত দিনে ৪/৫ ঘণ্টা এবং রাত্রে ৪/১ ঘণ্টা বসাইয়া রাখা হইত। ইহার ফলে বিপ্লবীদের অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত এবং শাস্তির কথা চিন্তা না করিয়া, এমন কি মিথ্যা স্বীকারোক্তি পর্যন্ত করিত। পুলিশ ইহাদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টার সামান্যতম ত্রুটিও করিত না। এই উদ্দেশ্যে আটক এবং বিচারাধীন বিপ্লবীদের ওয়ার্ডে তাহারা সময়-অসময়ে যাতায়াত করিত। রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী নামক গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী উচ্চ খেতাব, পদ এবং আরও পুরস্কারের লোভে বিপ্লবীদের সম্পর্কে সব সময় কেবল খোঁজ-খবর করিয়াই বেড়াইতেন। উক্ত ওয়ার্ডে যাতায়াতের কোন নির্দিষ্ট সময় তাঁহার ছিল না। ঘটনার দিন আটক বন্দীদের ওয়ার্ড হইতে বাহিরে আসা মাত্রই কয়েকজন বিপ্লবী দৌড়াইয়া গিয়া একটি লৌহদণ্ডের আঘাতে তাঁহার মস্তকটি এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেন যে, কোন সাহায্য পৌঁছার পূর্বেই ঘটনাস্থলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

ট্রাইবুন্যালের রায়

উপরোক্ত কারণে মাত্র দুই সপ্তাহ পর আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে দশজনের বিচার হয়। বিচারে বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত হরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরী মৃত্যুদণ্ডে এবং অবশিষ্ট বিপ্লবীরা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টে আপিলে অনন্ত হরি ও প্রমোদ চৌধুরীর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা বহাল থাকে। যে পাঁচজন খালাস পান তন্মধ্যে ট্রাইবুন্যালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। অপর তিনজনের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

কাকোড়ী ট্রেন-ডাকাতির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পুলিশ বিপ্লবীদের গুপ্ত আড্ডাগুলি হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বোমা তৈরীর যন্ত্রপাতি ও বিস্ফোরক

দ্রব্যাদি হস্তগত করে। সম্ভবতঃ অস্ত্রশস্ত্রের অভাবেই ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জীর হত্যার পর বেশ কিছু দিন তাঁহারা চুপচাপ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুনরায় যখন তাঁহারা মাথাচাড়া দিয়া উঠেন, তখন কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছিল জোরেসোরে। দেশের হাওয়াও তখন বহিতেছিল ভিন্ন মুখে। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছিল অবসাদ ও নৈরাশ্য। কংগ্রেসের লক্ষ্য হইবে পূর্ণ স্বরাজ না ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ একমত হইতে পারিতেছিলেন না। তদুপরি দেশে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে তাঁহারা কিছুতেই রোধ করিতে না পারিয়া এক প্রকার হাল ছাড়িয়া দিয়াই বসিয়াছিলেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনের কিছুদিন পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চুক্তিটি সমাধিস্থ হয়। ইত্যবসরে বৃটিশ সরকার তাঁহাদের ভেদনীতির সাহায্যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রয়াস পান। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই উত্তেজনা ১৯২৬ সালে প্রথমে কলিকাতায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার ফলে বহু লোক হতাহত, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট এবং একের প্রতি অপরের সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা

এদিকে মুসলিম লীগেও ইতিমধ্যে ভয়ানক অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কোথাও মুসলমানরা পুলিশ-সাহায্যপুষ্ট হিন্দুদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অহিংসবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যে আস্থাবান কংগ্রেসী নেতাদের কেহ কেহ এ সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উস্কানী দিতে থাকায়, মুসলমান জনসাধারণের নিকট কংগ্রেস অত্যন্ত ঘৃণার স্থল হইয়া উঠে। আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে মুসলমানেরা একদা দিল্লীর জুম্মা মসজিদের ইমামের জন্য নির্দিষ্ট স্থান হইতে

বক্তৃতা করিতে দিয়া উদারতার পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সেই উদারতার কথা ভুলিয়া গিয়া কোন এক অদৃশ্য হস্তের অশুভ ইঙ্গিতে তিনি হঠাৎ আজরাইলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে এই ধর্মীয় নেতা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। লাহোর জেলে উক্ত প্রদেশের একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর সহিত তাঁহার গোপন সাক্ষাৎকারের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই কারাগার হইতে তাঁহার মুক্তিলাভ হয় এবং দিল্লী পৌঁছিয়াই তিনি মুসলমানদিগকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিবার সংকল্পের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। এই নূতন প্রচেষ্টার 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামকরণ করিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমানদিগকে এক অপবিত্র জাতির পর্যায়ে ঠেলিয়া দিবার যে অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিলেন তাহা ভারতীয় মুসলমানদের মনে দারুণ আঘাত দেয়। ইতিমধ্যে গুরগাঁও, আলোয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে সংখ্যালঘু এবং অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে নানা প্রলোভন এবং হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া ধর্মান্তরিত করা হইতে থাকে। ধর্মান্তরের পুর্বে মুসলমানদিগকে গোবরের পানি খাইতে এবং উহাতে অবগাহন করিতে বলা হইত। বল-প্রয়োগক্রমে এরূপে অল্প দিনের মধ্যে বহু সহস্র নিরক্ষর মুসলমানদিগকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

হিন্দু কিম্বা মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বৃটিশ সরকারের কোন কালেও কোন দুর্বলতা বা আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। কিন্তু নিজেদের স্বার্থে তাঁহারা এ ব্যাপারে নীরব ও নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া রহিলেন। অবশেষে আবদুর রশিদ নামক জনৈক মুসলমান যুবক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিবালোকে হত্যা করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দেন। গৌহাটিতে সেই সময় কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন চলিতেছিল। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় হাজার হাজার লোকের ন্যায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দও অবগাহন করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন সত্য। কিন্তু

কংগ্রেসের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সাময়িক। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিনা কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কংগ্রেস মহলেও তাঁহার কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। কলিকাতা করপোরেশন ছিল সেই সময় কংগ্রেসীদের করতলগত। এই সন্দেহভাজন ব্যক্তির প্রতি করপোরেশনের শ্রদ্ধার নির্শন স্বরূপ কংগ্রেসী কাউন্সিলরগণ বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের নামবাহী মির্জাপুর পার্কের নাম পরিবর্তন করিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্ক রাখেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গদীচ্যুতির পর এই পার্কের নিকটে অবস্থিত একটি দ্বিতল বাড়ী মীর জাফরকে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

সংগঠন আন্দোলন

শুদ্ধি আন্দোলনের প্রায় একই সময় মধ্যভারতে ডঃ মুঞ্জে ও পাঞ্জাবে প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা ভাই পরমানন্দ 'সংগঠন' আন্দোলনের সাহায্যে হিন্দুদিগকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। ইহার বিষক্রিয়া হিসাবে নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। অবস্থা মুসলমানদের প্রতিকূলে দ্রুত অবনতির দিকে যাইতে থাকিলে, ডঃ সাইফ্‌উদ্দীন কিচলু 'তানজীম' এবং আম্বালার সৈয়দ গোলাম ভিক্ নায়রঙ্‌ 'তবলীগ' আন্দোলন লইয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহাদের উভয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলনের বেগ শীঘ্রই মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হ্রাস পাইবার পূর্বে লাহোরের রাজপাল নামক জনৈক আর্য সমাজী 'রঙ্গীলা রসুল' নাম দিয়া হজরত মোহাম্মদের কুৎসাপূর্ণ একখানি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। ইহার ফলে আবার মনোমালিন্য বাড়িতে থাকে। ইলমউদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান রাজপালকে হত্যা করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। অনুরূপ কারণে কলিকাতার জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক তাঁহার দোকান-গৃহেই জনৈক মুসলমান কর্তৃক ছোরার আঘাতে নিহত হন।

মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনার অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য আর্যসমাজীদের উস্কানীর দরুন ইহার পর ১৯২৬

সালে কলিকাতায় এক ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দূর মফঃস্বলেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্মীবৃন্দ হিন্দু-মুসলমান সকলের নিকট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য আবেদন করিয়া ব্যর্থ হওয়ায়, একান্ত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহাসভার প্রভাব হিন্দু জনসাধারণের উপর বৃদ্ধি পায়। ইহার পাল্টা জওয়াবে না হোক্ স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে মুসলিম লীগের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ সমর্থক দল এমন প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে যে, সাত বৎসর পূর্বে যে-প্রতিষ্ঠান পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসকে পর্যন্ত পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছিল, ১৯২৮ সালে কলিকাতায় সেই লীগেরই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন মাহমুদাবাদের মহারাজার ন্যায় একজন প্রতিক্রিয়াশীল এবং বৃটিশ সরকার-ভক্ত ব্যক্তি। দেশের যখন এই অবস্থা, ঠিক সে সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয়। স্বভাবতঃই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়ে ইহার উপর। তাহারা আশা করিতে থাকেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ন্যায় একজন উদারপন্থী ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

সর্বদল সম্মেলন

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল বিষয় লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল, আপোষে উহাদের মীমাংসার জন্য এ সময় কলিকাতায় একটি সর্বদল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের বিদায়ী প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মুখ্‌তার আহমদ আন্‌সারী ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ চুক্তির জন্মদাতা ১৯১৬ সালের কংগ্রেস-লীগের অধিবেশন ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধরনের সর্বদল সম্মেলনের নজীর নাই।

মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে অমুসলমানদের জন্য মুসলমানদের বিরাট স্বার্থ ত্যাগের বিনিময়েও কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানকে মাত্র তিনটি

অতিরিক্ত আসন দানের ব্যাপারে কতিপয় হিন্দু এবং শিখ নেতার অনমনীয় মনোভাবের দরুন অচলাবস্থার মধ্যেই সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সম্মেলনের ব্যর্থতা মুসলমানকে কংগ্রেস হইতে আরও দূরে সরাইয়া দেয়। সর্বদল সম্মেলন সমাপ্তির দুই দিন পর মুসলমান নেতৃবর্গ দিল্লীতে একটি বৈঠকে একত্রিত হইয়া মুসলমানদের সর্বসম্মত অন্যতম দাবী হিসাবে চৌদ্দ দফা রচনা করিয়া বৈঠকের সভাপতি জনাব জিন্নাহ্‌কে ইহা সংশ্লিষ্ট মহলে পেশের জন্য ক্ষমতা দেন।

কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে যখন কংগ্রেসের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অধিবেশন চলিতেছিল, সে সময় ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদের নেতৃত্বে কয়েক সহস্র শ্রমিক কংগ্রেস প্যাণ্ডালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উহাতে প্রবেশাধিকার এবং অংশ গ্রহণের দাবী জানায়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর শোভাযাত্রীরা এই শর্তে তাহাদের দাবী প্রত্যাহার করে যে, প্যাণ্ডালের মধ্যে তাহাদিগকে সভা করিতে দেওয়া হইবে। তদনুসারে তাহারা সভা করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কংগ্রেস প্যাণ্ডাল ত্যাগ করে। এই ঘটনার মধ্যে চমকপ্রদ কিছু ছিল না। কিন্তু দেশবাসী এই সর্বপ্রথম জানিতে পারে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, বিপ্লবী দল ছাড়া আরও একটি দল আছে যাহাদের আদর্শ হইতেছে ধনিকদের অর্থনৈতিক শোষণ হইতে জনসাধারণের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা। এই আদর্শেরই নাম কমিউনিজম। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক বর্তমানে কমিউনিজম মতবাদে আস্থাবান।

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের অধীনে ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনই কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হয়। মাত্র এক বৎসর পূর্বে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের ইহা ছিল সরাসরি খেলাপ। এই প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ইহা প্রমাণিত হইয়া পড়ে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে কংগ্রেসে রাইটিস্ট বা ডানপন্থীদের প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টি ইহাদের চিন্তার বাহিরে ছিল।

সাইমন কমিশন

আইন সভার মধ্যে নির্বিচারে সরকারকে বাধা দানের উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত স্বরাজ্য দল ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রদেশে সরকারকে এমন অসুবিধায় ফেলিয়া দিয়াছিল যে, নির্দিষ্ট দশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকে। কৌশলে ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে আর এক দফা ঠেকাইয়া রাখার জন্য তাই বৃটিশ সরকার ১৯২৮ সালে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের তিন বৎসর পূর্বে ভারতে একটি রয়েল কমিশন প্রেরণ করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। কমিশনে একজনও ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইহাকে বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তাহা সত্ত্বেও কমিশনের সদস্যগণ যথাসময়ে সাড়ম্বরে বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন। বোম্বাইয়ের নাগরিকবৃন্দ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপতাকা সহকারে সম্বর্ধনা জানায়।

বোম্বাইর অনুকরণে অন্যান্য স্থানেও জনসাধারণ তাহাদের উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু লাহোরেই উহা তীব্র আকার ধারণ করে। তথায় সাইমন কমিশনের উপস্থিতি উপলক্ষে ডঃ মোহাম্মদ আলম লালা লজপৎ রায়, ডাঃ সত্যপাল প্রমুখ নেতৃবর্গ এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণে বহির্গত হইলে পুলিশ তাঁহাদিগকে লাঠি চার্জ করে। নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই পুলিশের হাতে অল্প বিস্তর জখম হন। কিন্তু একমাত্র লালা লজপৎ রায়েরই আঘাত শেষ-পর্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। আঘাতের পর কিছু দিন শয্যাগত থাকিয়া অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর লজপৎ রায়ের মৃত্যুজনিত ক্ষত বক্ষে ধারণ করিয়া জনপ্রিয় কোন নেতাই আর সাইমন কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত জনসাধারণ অপেক্ষা সরকারেরই সম্বন্ধ ছিল বেশী।

কংগ্রেস শুধু সাইমন কমিশন বর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, উপরন্ত তাঁহারা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়া ভাবী শাসন সংস্কারের একটি কাঠামো দাঁড় করাইবার জন্য কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করেন। এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে মুসলমানদের কতিপয় দাবী

স্বীকৃত না হওয়ায়, মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ সাইমন কমিশনের ন্যায় নেহেরু কমিটিকেও বর্জন করে। ফলে সাইমন কমিশন যেমন হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গের, নেহেরু কমিটিও তেমনি নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত থাকেন। এককালে মহাত্মা গান্ধীর সাপ্তাহিক "ইয়ং ইণ্ডিয়ার" সম্পাদক এবং মওলানা মোহাম্মদ আলির জামাতা জনাব শোয়েব কোরাইশী এই কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

পুলিশের লাঠির আঘাতে প্রাক্তন বিপ্লবী লালা লজপৎ রায়ের অকাল-মৃত্যু, ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশন অনুসারে ব্যাপক ধরা-পাকড় ও বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটক প্রভৃতি ঘটনায় এই সময় বিপ্লবী দল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তাই তাহারা আবার সমস্ত শক্তি লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বহু স্থানে বোমা ইত্যাদি তৈরী, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ এবং ডাকাতি হইতে থাকে। লালা লজপৎ রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের ভার ন্যস্ত হয় পাঞ্জাবের ভগৎ সিং নামক জনৈক বিপ্লবী এবং তাঁহার দলের উপর। কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ভগৎ সিং-এর দল লাহোর কোর্ট স্ট্রীটে পুলিশের ডেপুটি সুপার মিঃ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়া হত্যা করে। ভগৎ সিং ছিলেন পাঞ্জাবের খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা অজিত সিং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য হইল, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বোমা নিক্ষেপ। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে যখন কেন্দ্রীয় পরিষদে জননিরাপত্তা আইনের উপর আলোচনা চলিতেছিল সে সময় দর্শকের গ্যালারীর অনতিদূরে দুই স্থানে দুইটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। সদস্যগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ভগৎ সিং শূন্যে দুইবার গুলীও ছোড়েন। গ্রেফ্‌তারের পর ভগৎ সিং এবং তাঁহার সঙ্গী বটুকেশ্বর দত্তের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদের নেতৃত্বে কয়েক সহস্র শ্রমিক এক প্রকার জোরক্রমে কংগ্রেস নেতৃবর্গের নিকট হইতে কংগ্রেস সভামণ্ডপে নিজেদের সভা করিবার দাবী আদায় করিয়া লইয়া সর্বপ্রথম দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইহার প্রায় আট বৎসর পূর্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। তখন হইতে ইহা মালিকদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টায় রত থাকে। ইহার ফলে সেই কয় বৎসরে সমগ্র ভারতে বহু শ্রমিক ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে। এ সকল শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের চাপে বহু কল-কারখানার মালিক শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবী-দাওয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনের পশ্চাতে এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ সমর্থন না থাকিলে উহা এতটা ব্যাপকতা লাভ করিতে পারিত না। কমিউনিস্ট কর্মীরা শ্রমিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসকে সাহায্য করিতেছে দেখিয়া বৃটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এই ঘটনার তিন মাস পূর্বে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জনৈক ইংরেজকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করেন।

তাঁহার রিপোর্ট অনুসারে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে পুলিশ প্রায় একই সময় ভারতের বহু স্থানে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীর সময় তাহারা বহু চিঠিপত্র ও দলিল হস্তগত এবং কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ, কমরেড ব্র্যাড্‌লী, ধরনীকান্ত, গোপাল বসাক, শ্রীপাদ ডাঙ্গে, জুগলেকর, ঘাটে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, শামসুল হুদা, অযোধ্যা প্রসাদ, কিশোরীলাল, পুরান চাঁদ, ফিলিপ স্প্রাট, রাধারমণ মিত্র, শওকত ওসমানী, গোপেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ ৩১ জনকে গ্রেফ্‌তার করে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনজন ইংরেজ ছিলেন। মীরাটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ইঁহারা যথারীতি অভিযুক্ত হন। প্রায় ছয় মাস শুনানীর পর মামলাটি স্থানান্তরিত হয় মীরাটের দায়রা জজের এজলাসে।

মামলা পরিচালনার জন্য সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিস্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্‌কে দৈনিক হাজার টাকার অধিক ফিসে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই মামলায় সরকার পক্ষের যত অধিক অর্থব্যয় হইয়াছিল ইতিপূর্বে অপর কোন মামলায় তত হয় নাই। তিনশতের অধিক লোক এই মামলায় সাক্ষ্য দান করিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি ডিফেন্স কমিটি গঠিত

হয়। নিম্ন আদালতে মামলার শুনানীর সময় জনৈক আসামীর মৃত্যু ঘটে। এসেসরগণ ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে জজকে তাঁহাদের অভিমত জানান। পর বৎসর ১৬ই জানুয়ারী বিচারক মামলার রায় দেন। তিনি তিনজনকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট ২৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত করেন। অভিযুক্ত তিনজন ইংরেজের মধ্যে একজনকে নিম্ন আদালত প্রাথমিক শুনানীর পর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান এবং সরকার কর্তৃক ষড়যন্ত্রের নায়ক নামে অভিহিত কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপর একজন বিচারপতির এজলাসে উহার শুনানী চলে। ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে বিচারপতিগণ তাঁহাদের রায় প্রকাশ করেন। তাঁহাদের বিচারে দায়রা আদালতে দণ্ডিত ২৭ জনের মধ্যে আরও ৯ জন মুক্তিলাভ করেন। পাঁচজনকে এই বিবেচনায় খালাস দেওয়া হয় যে, অপরাধের তুলনায় তাঁহাদের যথেষ্ট হাজতবাস হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলের দণ্ড হ্রাস পায়। বিচারপতিদ্বয় দায়রা জজের বিচারবুদ্ধির প্রতিও কটাক্ষ করিয়াছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর সন্তুষ্টির জন্য দায়রা জজ মিঃ ইয়র্ক পক্ষপাতিত্বমূলক রায় প্রদান করিয়া ইতিমধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন।

শোষণমুক্ত সমাজ গঠনই যে পার্টির আদর্শ, উহার আবেদন শ্রমিক সম্প্রদায়ের নিকট কখনও ব্যর্থ হয় না। এ জন্য নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দের দীর্ঘ কারাবাসকালীন অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর কমিউনিজমের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে কলকারখানায় কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক সংস্থার সংখ্যাও তদনুসারে বৃদ্ধি পায়। সরকার, শিল্প এবং পুঁজিপতি সাহায্যপুষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ কিছুতেই উহা রোধ করিতে পারিতেছিলেন না।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগে দণ্ডিত ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত শীঘ্রই অপর একটি মামলায় জড়িত হইয়া পড়েন।

পরিষদের ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া পুলিশ লাহোরের কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাশী চালাইয়াছিল। সে সময় তাহারা প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর পুলিশ বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিপ্লবীকে গ্রেফতার করিয়া বিচারার্থ লাহোরে চালান দেয়। পুলিশের প্রলোভনে বশীভূত হইয়া ধৃত বিপ্লবীদের সাতজন রাজসাক্ষী হয়। ইতিপূর্বে এবং পরে অপর কোন মামলায় পুলিশ একসঙ্গে এত জন বিপ্লবীকে রাজসাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থিত করিতে পারে নাই।

বিচারাধীন বন্দীদের প্রতি জেল-কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে উপরোক্ত সাতজন ব্যতীত অপর সকলে জেলে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু জেল-কর্তৃপক্ষ নানা কৌশল ও অপ-কৌশলের সাহায্যে বাংলার যতীন্দ্রনাথ দাস ব্যতীত অপর সকলের অনশনের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হন। দাবী-দাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণে দৃঢ় অসম্মতি জানাইতে থাকেন। অনশনের দেড় মাস অতীত হইলে, বিনাশর্তে যতীন্দ্রনাথের মুক্তির জন্য সকল রাজনৈতিক মতবাদের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ সরকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু সরকার কিছুতেই বিনাশর্তে তাঁহাকে মুক্তি দিতে রাজী হইলেন না। উপরন্তু ধর্ম-ঘটীদের দাবী-দাওয়াগুলিও পূরণের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না।

অনশনের ৬২তম দিবসে সকলে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারে, যতীন্দ্র-নাথের মৃত্যু অতি নিকটে। পর দিবস, ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ অনশনের ৬৩তম দিবসে ভারতের 'ম্যাকসুইনী" মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রই সমগ্র দেশের উপর শোকের কালো ছায়া নামিয়া আসে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৫ বৎসর। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া দুইবার অল্পদিনের মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের দুই বৎসর পর তিনি বিপ্লবী বিনয় রায়ের সংস্পর্শে আসেন। দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু ১৪ই সেপ্টেম্বর একখানি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া পর দিবস সকলকে হরতাল

পালন এবং যতীন্দ্রনাথের শবদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হাওড়া স্টেশনে সমবেত হইতে অনুরোধ জানান। কলিকাতার উদ্দেশ্যে লাহোরে যখন শবদেহটি ট্রেনে উঠানো হয়, তখন সহস্র সহস্র লোক তথায় উপস্থিত ছিল। লাহোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে দর্শনেচ্ছু বিরাট জনতার সমাবেশ ঘটিয়াছিল। শবদেহ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলে সহস্র সহস্র নরনারী উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ফেলে। কলিকাতায়, এমনকি ভারতবর্ষের কোথাও, ইতিপূর্বে এত বড় শব-শোভাযাত্রা কেহ দেখে নাই। যতীন্দ্র দাসের আত্মবিসর্জন বৃথা যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পর বিচারাধীন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিদেশী সরকার কতিপয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বাধ্য হন। বিনা বিচারে আটক এবং অন্তরীণাবদ্ধ বিপ্লবী যুবকগণ ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী অর্থে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পাইতে এবং পরীক্ষা দিতে থাকেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। দুইজন ইংরেজ এবং একজন মুসলমানকে লইয়া স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। বিচারক কোল্ডস্ট্রীম ছিলেন ইহার চেয়ারম্যান। একদিন শ্লোগানের ব্যাপার লইয়া আদালতের ভিতরেই পুলিশ নিরস্ত্র বন্দীদের খুব মারধর করে। ট্রাইবুন্যালের অন্যতম সদস্য জনাব আগা হায়দর পুলিশের এই জবরদস্তির তীব্র নিন্দা করিয়া ইহার প্রতিকার সাপেক্ষে মামলার বিচার করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। চেয়ারম্যান কোল্ডস্ট্রীমও তাঁহার অনুসরণ করেন। সরকার পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের পরিবর্তে ট্রাইবুন্যালের তৃতীয় সদস্য বিচারক হিল্টনকে চেয়ারম্যান করিয়া অপর দুইজন নূতন বিচারকের সমবায়ে নূতন ট্রাইবুন্যাল গঠন করেন। আসামিগণ নবগঠিত ট্রাইবুন্যালের সম্মুখে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করায়, তাহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার চলে। নূতন ট্রাইবুন্যাল ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মামলার রায় দেন। বিচারে ভগৎ সিং এবং অপর তিনজনের প্রতি ফাঁসির আদেশ প্রদত্ত হয় এবং তিনজন খালাস পান। অবশিষ্ট আসামিগণের মধ্যে সাতজনের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং দুইজনের হয় দীর্ঘ কারাদণ্ড। ছয় মাস পর ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গিগণের ফাঁসি হইয়া যায়।

গোলটেবিল বৈঠক

ভারতবর্ষের প্রায় সব কয়টি রাজনৈতিক সংস্থা কর্তৃক বর্জিত সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৩০ সালে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। কংগ্রেস ইহাতে যোগদান করে না। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আলি উহার রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তিনি কংগ্রেসের বন্ধ্যা নীতির সমালোচনা করিয়া বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। আমন্ত্রিত মুসলমানদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলি, জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জনাব এ. কে. ফজলুল হক, স্যার মোহাম্মদ ইসমাইল, মহামান্য আগা খান, স্যার আবদুল কাইয়ুম, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, স্যার ইয়াকুব, স্যার শাহ্ নওয়াজ ভুট্টো, স্যার আকবর হায়দারী, স্যার মোহাম্মদ শফি প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ সরকার তাঁহাদের খেয়াল-খুশী অনুসারে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন। এ কারণে বৈঠকে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব লইয়া বিবাদ বাধিবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। মুসলমান জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধি হিসাবে শুধু মওলানা মোহাম্মদ আলিই উক্ত সম্মানের দাবী করিতে পারিতেন। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকায় সরকার-ঘেঁষা সদস্যগণ তাঁহার নেতৃত্বের বিরোধিতা করিবেন, এরূপ একটি গুজবও রটান হইয়াছিল। স্যার মোহাম্মদ শফি ও জনাব জিন্নাহ্‌র মধ্যে যে কেহ প্রার্থী হইলে অপর পক্ষ যে তাঁহাকে সমর্থন করিবে না, ইহাও কাহারো অজানা ছিল না। তাহা ছাড়া, ইঁহাদের উভয়েই অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া থাকায় জনসাধারণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের নির্বাচন জনসাধারণের মনঃপূত না হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। মুসলিম সদস্যগণ লণ্ডনে পৌঁছিয়া সর্বসম্মতিক্রমে দল-নিরপেক্ষ মহামান্য আগা খানকে নেতা নির্বাচিত করিয়া সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হন। ইতিপূর্বে আর কখনও সকল দলের মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে এরূপ একতা দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে পর্যন্ত হিন্দু সদস্যগণ সকল

দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহাদের নেতা নির্বাচন করিতে অসমর্থ হন।

প্রায় দুই মাসকাল অধিবেশনের কাজ চলে। মওলানা মোহাম্মদ আলি ব্যতীত বৈঠকে অপর কোন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী নেতা উপস্থিত না থাকায়, বৈঠকে নরম নরম বক্তৃতার বান প্রবাহমান ছিল। খানাপিনারও যথেষ্ট আয়োজন ছিল। বৈঠকে মওলানা মোহাম্মদ আলিরই বক্তৃতা হইয়াছিল দীর্ঘতম। বক্তৃতার এক স্থানে তিনি বলেন, বৃটিশের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে স্বাধীনতা আদায়ের জন্যই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন। স্বাধীনতার সারাংশ লইয়া তিনি দেশে ফিরিবেন, উহা ছাড়া তিনি পরাধীন ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবেন না। সেখানেই তাঁহাকে কবর দিতে হইবে। কি কুক্ষণেই না তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন! তাঁহাকে আর তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই।

বৈঠকের কাজ চালু থাকাবস্থায় এই মহাপুরুষ বিশাল ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোকবাসী হন। অতিরিক্ত পরিশ্রম, দীর্ঘকাল অন্তরীণাবাস ও সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের দরুন তিনি কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বে তিনি এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, স্ট্রেচারের সাহায্যে তাঁহাকে বোম্বাই বন্দরে জাহাজে তোলা হইয়াছিল। ১৯৩০ সালের ৫ঠা জানুয়ারী শেষ রাত্রে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ সমগ্র বিশ্বে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়ে। পৃথিবীর সুধী সমাজ এ সংবাদে মর্মাহত হইয়া ভারতের এই বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া অসংখ্য তার-বার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম অভিপ্রায় অনুসারে লণ্ডন হইতে তাঁহার মৃতদেহ প্রথমে কায়রো এবং পরে তথা হইতে পৃথিবীর তিনটি ধর্মাবলম্বীদের নিকট সমান পবিত্র, জেরুজালেমে নীত হয়। তথায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত খলিফা ওমরের মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। বলা বাহুল্য, গোলটেবিল বৈঠক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে কার্যতঃ তেমন কোন সাহায্য করে নাই। সুতরাং মওলানা মোহাম্মদ আলিকে রিক্ত হস্তেই

ফিরিয়া আসিতে হইত। কিন্তু বিধাতার এমনি ইচ্ছা যে, তাঁহাকে পরাধীন ভারতবর্ষে আর ফিরিয়া আসিতেই হয় নাই।

দেশপ্রেমিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি ও বাগ্মী মওলানা মোহাম্মদ আলির মৃত্যু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিশেষ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহার আর পূরণ হয় নাই। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও অশেষ নির্যাতন ভোগ দ্বারা তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাদের একতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইহারই জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি ফর্মুলার কথা প্রকাশ পায়। আর কিছুদিন যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তবে উক্ত ফর্মুলাকেই হয়ত ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন রচিত হইত, যেমন কতিপয় ব্যতিক্রম সহ ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিকে ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লইয়া বৃটিশ সরকার মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার আইন রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্য সম্পর্কে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন এবং চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস উহাতে যোগদানে অসম্মতি প্রকাশ করায়, বৈঠকের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া ছাড়াও, উহার সাফল্যের সম্ভাবনাও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। আরও একটি কারণে কোন কোন মহল প্রথমাবধি ইহাকে একটি "অত্যন্ত ব্যয়বহুল ইঙ্গ-ভারতীয় প্রহসন" নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছিল। বস্তুতঃ বৈঠকে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতির দরুন ইহার অসাফল্যেরই দিকটা বড় হইয়া দেখা দিতে থাকে। নিজেদের স্বার্থে দেশীয় রাজন্যবর্গ বৃটিশ ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় খুব বড় রকমের কোন রদবদলের পক্ষপাতী ছিলেন না। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্খার সার্থক রূপায়নে সহায়তার জন্য নিশ্চয়ই বৃটিশ সরকারের বৃটিশ প্রতিনিধিগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্তির পূর্বেই মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় বৈঠকের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। ১৯২৯ সালে লাহোরে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের সহিত গৃহীত আর একটি প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করিয়াছিল। অপর একটি প্রস্তাবে প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসকে করবন্ধ বা আইন অমান্য আন্দোলন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সবরমতী আশ্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর অভিপ্রায় অনুসারে লবণ আইন অমান্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই এ ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেন।

লবণের উপর কর ধার্যের অন্যায় ব্যবস্থাকে ভারতবাসীরা অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত। বস্তুতঃ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে লবণের ন্যায় ধনী দরিদ্র-নির্বিশেষে প্রত্যেকের নিত্য-প্রয়োজনীয় একটি দ্রব্যের উপর এত উচ্চ হারে কর ধার্য হয় নাই। বৃটিশ সরকারই এদেশে এই ঘৃণ্য প্রথার প্রবর্তন করেন। অতীতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ইহার বিরুদ্ধে ভারতীয় সদস্যগণ বহুবার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন বিদেশীয় সরকারের অনমনীয় মনোভাবের দরুন শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। জনগণের অধিক সমর্থন লাভের নিশ্চিত আশায় মহাত্মা গান্ধীর সুপারিশক্রমে তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বাগ্রে এই ঘৃণ্য আইনটি অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহা ছিল কংগ্রেসের বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তগুলির একটি।

লবণ আইন অমান্য

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্রতীরে অবস্থিত ডাণ্ডি নামক স্থানে ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল সকাল ৮।। টার সময় লবণ আইন ভঙ্গ করিবার সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করিয়া ১২ই মার্চ প্রাতে সবরমতী আশ্রমেরই ৭৮ জন কর্মীসহ আশ্রম হইতে পদব্রজে ডাণ্ডি যাত্রা করেন। সবরমতী আশ্রম হইতে ডাণ্ডি প্রায় দুইশত মাইল দূরে অবস্থিত। আশ্রম ত্যাগের প্রাক্কালে

তিনি সমবেত সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে ঘোষণা করেন, লবণ আইন প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সবরমতীতে ফিরিয়া আসিবেন না। বলা নিষ্প্রয়োজন, তিনি আর সবরমতীতে ফিরিয়া যান নাই—দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও না। ওয়ার্ধার নিকট সেবাগ্রামে অতঃপর তাঁহার দফ্‌তর ও নূতন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে পদব্রজে দুইশত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ৬ই এপ্রিল বহু সহস্র দর্শক ও কংগ্রেস-কর্মীদের উপস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধী সমুদ্রের তীরে একটি লবণস্তূপ হইতে কিছু পরিমাণ লবণ স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া আইন ভঙ্গ করিলেন। এই সংবাদ বাতাসের আগে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক প্রদেশে লবণ আইন অমান্য আরম্ভ হইয়া যায়। বৃটিশ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও মিলিটারীর হাতে বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার লোক প্রহৃত হইয়া বিভিন্ন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। প্রথম সপ্তাহেই সঙ্গীনের খোঁচায় এবং বন্দুকের গুলীতে অজ্ঞাত সংখ্যক লোকের প্রাণ গেল। সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অতঃপর ধর্সনার সরকারী লবণের গোলা দখলের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া সরকার তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া যারবেদা জেলে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এক কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী ও বোম্বাই প্রদেশে সর্বজনমান্য জনাব ইমাম সাহেব। তিনিও গ্রেফতার হন। অতঃপর তাঁহার আরব্ধ কার্য সমাপনের জন্য প্রায় ২০ হাজার লোক ধর্সনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকায়, পুলিশ তাঁহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। ইতিমধ্যে একই অভিযোগে জনাব তায়েবজী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ঘটনাস্থলে ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত হন।

আরও দূরে, শোলাপুরে জনসাধারণ পুলিশের অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাহাদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লয়। জনসাধারণের দাবী মিটাইবার পরিবর্তে আইন ও শৃঙ্খলার নামে সরকার তথায় সামরিক আইন জারী করিলেন। উচ্ছৃঙ্খল আচরণের অজুহাতে মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যার কোন কোন এলাকায় পুলিশ নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে।

এরূপে ছয় মাসে সমগ্র ভারতবর্ষে ৬০ হাজারের অধিক লোক বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত এবং একশতের বেশী নিহত হয়। বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল। ফলে এই জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক আইন অমান্যকারী গ্রেফ্‌তার ও দণ্ডিত হয়। আন্দোলন চালু থাকাবস্থায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু এবং বোম্বাইর শ্রী এম. আর. জয়াকার সরকারের সহিত কংগ্রেসের একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন অমান্যের আহ্বানে খান আবদুল গফ্‌ফার খানের (সীমান্ত গান্ধী) নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশ যে ভাবে সাড়া দেয়, অন্য কোন প্রদেশ সেভাবে দেয় নাই। আবদুল গফ্‌ফার খান তাঁহার অনুচরগণ সহ আন্দোলনে যোগদান করা মাত্রই তথায় পুলিশের জুলুম সীমা অতিক্রম করে। সরকার ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আন্দোলনকারীদের দমনের জন্য সৈন্য নিয়োগ করেন। ১৯৩০ সালের ২৩শে এপ্রিল সৈন্যরা একটি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিয়া পেশোয়ারের প্রধান রাজপথটি রক্তে রঞ্জিত করিয়া দেয়। সেদিনই অপর একটি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিতে বলা হইলে হাবিলদার ঠাকুর চন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে একদল গাড়োয়ালী সৈন্য তাহাতে অসম্মতি জানায়। ফলে তাহাদের সকলের চাকুরী তো গেলই, উপরন্তু কোর্ট মার্শালে পর দিবস তাহাদের কেহ কেহ দীর্ঘ-মেয়াদী দণ্ডে দণ্ডিত হয়। অতঃপর আবদুল গফ্‌ফার খানকে গ্রেফ্‌তার করিয়া সরকার তাঁহার খোদা-ই-খিদ্‌মতগার প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া দেন। রিসালপুর নামক স্থানে একটি সেনানিবাসে ফ্রন্টিয়ার ক্রাইম রেগুলেশন আইন অনুসারে তাঁহার বিচার হয়। তাঁহার পাখ্‌তুন পত্রিকাখানির প্রকাশনাও এ সময় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

আবদুল গফ্‌ফার খানকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে পাঠাইয়া দিয়া সরকার সৈন্য এবং পুলিশকে তাঁহার খোদা-ই-খিদ্‌মতগারদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। সীমাহীন ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহারা শত শত লোকের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয়, নারীদের ইজ্জত নষ্ট করে এবং নিছক সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের ক্ষেত ও মওজুদ শস্যাদি নষ্ট

করিয়া ফেলে। এমনকি গৃহের ছাদ হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া বহু লোককে তাহারা বিকলাঙ্গ করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। জনৈক আমেরিকান এ সম্পর্কে বলেন: "ইহাদের গুলী করিয়া হত্যা করা বৃটিশ সৈন্যদের নিকট একটা তামাসার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।" এ সকল জঘন্য অত্যাচারের সহিত পরবর্তীকালে স্বাধীন পাকিস্তানের খুব উচ্চপদস্থ জনৈক নাগরিকের নাম যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এক পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদটি পর্যন্ত অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এত প্ররোচনা, উস্কানী এবং উত্তেজনামূলক অবস্থার মধ্যেও সীমান্ত-বাসীরা হিংসার পথে পা বাড়াইল না, অসীম ধৈর্য সহকারে পুলিশ ও সৈন্যদের সমস্ত জুলুম তাহারা নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে থাকে। রক্তঋণ পরিশোধ করা আজও একটি পবিত্র কর্তব্য বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা শত লাঞ্ছনা, নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও প্রায় দেড় বৎসর-কাল কিরূপে এই নূতন আদর্শ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট কর্মী গ্রেফ্‌তার ও কারারুদ্ধ হইয়া পড়েন। উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে সহস্র সহস্র পরিবারে রীতিমত অনশন আরম্ভ হইয়া যায়। খাদ্যাভাবে মায়ের স্তন শুষ্ক হইয়া পড়ায় দুগ্ধপোষ্য শিশুরা অচিরে কঙ্কালসার হইয়া পড়ে। বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহিরে যাওয়া অনেক নরনারীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

এমতাবস্থায় সীমান্তের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদেশের বাহিরের প্রভাবশালী মুসলমান নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ ও উপস্থিত বিপদে তাঁহারা সাহায্যের আশায় পাঞ্জাব এবং দিল্লী গমন করেন। তথায় তাঁহারা বহু মুসলমান নেতার সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে সমর্থ হইলেন না। সর্বশেষে তাঁহারা পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলি হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেন, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ কিম্বা অপর কোন

মুসলিম প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাঁহারা কোন সাহায্য আশা করিতে পারেন না। তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করিলে হয়ত কিছু সুফল লাভ হইতে পারে।

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি

খান আবদুল গফ্ফার খান সে সময় গুজরাট জেলে বন্দী জীবন যাপন করিতেছিলেন। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ আবশ্যক মনে করিয়া তাঁহারা বিষয়টি তাঁহাকে জানান। অতঃপর তাঁহারাই সম্মতিক্রমে উক্ত নেতৃবর্গ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সীমান্তের দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়া কংগ্রেস ইহার সাধ্যানুযায়ী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হয়। ইহার মাত্র কিছু দিন পর সীমান্তের খোদা-ই-খিতমতগারদের কংগ্রেসে যোগদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চরম বিপদের দিনে কংগ্রেসের সাহায্য সীমান্তবাসীদিগকে উহার প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, দেশ বিভাগ সম্পর্কিত ঘোষণার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব তথায় অক্ষুণ্ণ থাকে। এমনকি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে ইসলাম, ঐক্য ও সংহতির দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও সীমান্তবাসী-দিগকে কংগ্রেস হইতে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা যায় নাই।

খান আবদুল গফ্ফার খান ১৮৯০ সালে সীমান্ত প্রদেশের সোয়াত নদীর তীরে উৎমনজাই গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পেশোয়ারের চার্চ অব ইংলণ্ড মিশনারী স্কুলে পাঠ সমাপনের পর তিনি আলিগড় কলেজে ভর্তি হন। আলিগড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজের উদ্যোগে গ্রামদেশ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিয়া সরকারের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। প্রদেশের বাহিরে তিনি সীমান্ত গান্ধী এবং প্রদেশে বাদশাহ খান নামেই সুপরিচিত। অহিংস নীতিতে দৃঢ় আস্থাবান সর্বভারতীয় কোন নেতাই রাজনৈতিক মতবাদের জন্য এত দীর্ঘকাল কারাজীবন যাপন করেন নাই।

সামান্য রকমের ভৌগোলিক রদবদল সহ তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডুরাণ্ড লাইনের উভয় দিকে বসবাসকারী পশ্‌তু ভাষাভাষী পাঠানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতী। এই মতবাদ প্রচারের জন্য পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারাগারে আটক রাখেন। পাকিস্তানে রিপাবলিকান দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের সমর্থক ডঃ খান সাহেব ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

অত্যাচার ও নিপীড়নের একটি অমোঘ প্রতিষেধক হিসাবে অহিংস নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের শেষ মীমাংসার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাঠান সম্প্রদায় যে সময় নীরবে বৃটিশের গোলাগুলী বুক পাতিয়া লইতেছিল, ঠিক সে সময় একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব কোণে একদল তরুণ বিপ্লবী দুর্বার সঙ্কল্প লইয়া সরকারের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। অহিংসা এবং অসহযোগ, এই দুই নীতির কোনটিরই উপর তাহাদের আস্থা ছিল না। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে, চট্টগ্রামের এই ঘটনা তাহাদের অব্যবস্থিত চিত্তেরও একটি প্রধান পরিচয় বহন করিতেছে। শত্রুকে ছোট করিয়া দেখা এবং নিজেদের শক্তি সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করা কত বিপদজ্জনক, চট্টগ্রামের এই ঘটনা তাহার একটি প্রমাণ। উপরে একাধিকবার বলা হইয়াছে, আইনানুগ উপায়ে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতির ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলেই বিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিত। কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে একবার ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীরা বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিবার অটল সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইহাদের মধ্যে আবার প্রস্তুতির দিক দিয়া চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে বিপ্লবী নেতা শ্রী সূর্য সেনের আহ্বানে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের একটি সভা হয়। উক্ত সভায় স্থিরীকৃত হয়, কোন এক নির্দিষ্ট তারিখে তাহারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ট্রেজারী দখল, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ব্যবস্থা ব্যাহত, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন উৎপাদন

ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিবেন। আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে জানা গিয়াছে, ভারত ও রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট দিন অন্যান্য প্রদেশেও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ডাণ্ডি এবং ধর্সনা হইতেও তখন চাঞ্চল্যকর সংবাদ আসিতেছিল। এ সকল সংবাদ বিপ্লবীদের প্রাণে আশা এবং বাহুতে শক্তি যোগায়। উক্ত সভায় ইহাও স্থির হয়, সূর্য সেনই এ ব্যাপারে তাঁহাদের নেতৃত্ব করিবেন এবং তিনিই অভিযানের তারিখ ঠিক করিয়া দিবেন।

শ্রী সূর্য সেন ছিলেন চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া নামক গ্রামের শ্রী রাজমনি সেনের পুত্র। বহরমপুর কলেজ হইতে তিনি ১৯১৮ সালে বি. এ পাস করিয়া চট্টগ্রামের একটি হাইস্কুলে গণিতের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। স্কুলের মাহিনার টাকায় তিনি সংসারের খরচ মিটাইতে পারিতেন না। এজন্য অবসর সময় তিনি বাড়ীতেও ছাত্র পড়াইতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামের প্রবীণ নেতা জনাব কাজিম আলি মাস্টার ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের আহ্বানে শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু আন্দোলনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রামের যেই সকল ছাত্র-কর্মী পুনরায় স্কুল-কলেজে ফিরিয়া যাইতে পারিল না, সূর্য সেন তাহাদিগকে লইয়া একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন এবং পুনরায় শিক্ষকতা কার্যে যোগ দেন।

বিদেশীয় জাহাজের নাবিকদের নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় এবং সংগঠন কার্যের ব্যয় নির্বাহার্থ চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি ডাকাতি করেন। ঘটনার দিন রেলওয়ে হেড্ অফিস হইতে ১৭ হাজার টাকা লইয়া কয়েকজন কর্মচারী একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে পাহাড়তলী স্টেশনে যাইতেছিল। অকস্মাৎ বিপ্লবী দেবেন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য, অনন্ত সিংহ ও রাজেন্দ্র দাস অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান। গুলীর ভয়ে গাড়োয়ান ও আরোহীরা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়া মাত্রই ইহারা টাকার থলিটি লইয়া গাড়িটিসহ ঘটনা-স্থল ত্যাগ করেন। এই ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং অনন্ত সিংহকে গ্রেফতার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয়। ইঁহাদের

পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। প্রমাণাভাবে ইঁহারা তিনজনই বেকসুর খালাস পান। আদালতের বিচারে তাঁহাদের মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু পুলিশ তাঁহাদের এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের উপর কড়া নজর রাখে। পাহাড়তলী ডাকাতি ও অস্ত্রাগার লুঠের মধ্যবর্তী সময় পুলিশ চট্টগ্রামের অধিকাংশ বিপ্লবীর জীবন এইভাবে দুর্বহ করিয়া রাখিয়াছিল। জেলার কোথাও ডাকাতি বা রাহাজানি হইলেই তাহারা সর্বাগ্রে ইঁহাদের খোঁজ-খবর করিত, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ইহাদের ডাক পড়িত এবং বাড়ীতে তল্লাশী হইত। কিন্তু ইঁহারা এতই সতর্ক থাকিতেন যে, পুলিশ ইঁহাদের বাড়ীতে আপত্তিকর কিছু পায় না।

পরিকল্পনা

কি কারণে তাহা বলা যায় না, অস্ত্রাগার লুঠনের জন্য বিপ্লবীরা ১৮ই এপ্রিল দিনটি বাছিয়া লইয়াছিল। পরবর্তী দুই দিন চট্টগ্রামে মুসলমানদের কয়েকটি সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ছিল। তন্মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ স্যার শাফায়াৎ আহামদ খান। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। পুলিশকে অত্যাসন্ন অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ও অসতর্ক রাখার জন্য নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের কয়েকজন ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্নে পূর্বোক্ত সম্মেলনের সভামণ্ডপ পরিদর্শনে যাইয়া বহুক্ষণ তথায় অতিবাহিত করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহাদের কয়েকজন কলেজ হোস্টেলে গ্রন্থকারের প্রকোষ্ঠে বসিয়া অপরিপক্ক তরমুজ এবং লিচু ভক্ষণ করেন। গ্রন্থকারের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন কথা হয় না।

যতদূর জানা যায়, ৯৫ জন বিপ্লবীর সমবায়ে গঠিত দলের সকলের কাজ দলপতি সূর্য সেন সেই দিন সকালে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তখনই স্থির হয়, রাত্রি ঠিক দশটার সময় লোকনাথ বল এবং নির্মল সেনের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী অতর্কিত আক্রমণের সাহায্যে রেলওয়ে

অক্সিলিয়ারী ফোর্সের কেন্দ্র ও অস্ত্রাগার দখল করিবে। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে অপর একদল বিপ্লবী নিজাম পণ্টনস্থ অস্ত্রাগারটি দখল এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন আক্রমণ করিবে। রেল লাইনের ক্ষতি-সাধন করিয়া চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন উপেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং তাহার সহকর্মীবৃন্দ। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংসের ভার অর্পিত হইয়াছিল অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর।

পুলিশ আইন আক্রমণকারী দলকে দরকার হইলে সাহায্য করিবার জন্য অনধিক ৩০ জন বিপ্লবীর অপর একটি দলকে দামপাড়ার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সূর্য সেন তাঁহার রিজার্ভ বাহিনীসহ যথাসময়ে পুলিশ অস্ত্রাগারে তাঁহার সামরিক কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইবেন, ইহাও উপ-দলপতিগণকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আপন আপন কার্য সম্পাদনের পর সেস্থানেই সকলের সমবেত হওয়ার কথাও সকালের সভায় স্থির হইয়াছিল। রাত্রি ৮টার সময় ভারতের রিপাবলিকান আর্মির নামে ইহাদের পক্ষ হইতে প্রচারিত একখানি ঘোষণাপত্রে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভের সংকল্প ঘোষণা করিয়া ইঁহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়েন। ইতিপূর্বে আর কখনও ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির নাম কোথাও শোনা যায় নাই। ধৃত বিপ্লবীদের বিচারের সময় প্রকাশ পায় যে, ১৯২৭ সাল হইতে তাহারা এই নামে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নির্দিষ্ট সময় লোকনাথ বল, নির্মল সেন এবং কতিপয় বিপ্লবী সামরিক পোশাকে সজ্জিত হইয়া একখানি ট্যাক্সিযোগে পাহাড়তলী অভিমুখে রওয়ানা হন। কিয়দ্দূর গমনের পর একটি মাঠের নিকটে রিভলভারের ভয় দেখাইয়া তাঁহারা ট্যাক্সি চালককে গাড়ী হইতে অবতরণে বাধ্য করেন। অতঃপর তাহার হস্তপদ বন্ধনপূর্বক ক্লোরোফর্মযোগে অজ্ঞান করিয়া তাহাকে মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া ইঁহারা তাহার গাড়ীখানি লইয়া রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখে উপস্থিত হন। তথায় পূর্ব হইতে কয়েকজন বিপ্লবী গা ঢাকা দিয়া অবস্থান করিতেছিল। পাহারারত শান্ত্রী তাঁহাদের অগ্রগমনে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে, লোকনাথ বল তাহাকে গুলী করিবার

জন্য আদেশ দেন। আদেশটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। অতঃপর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করে। অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর ফেরেল গোলাগুলীর শব্দ শ্রবণ করিয়া আহার অসমাপ্ত রাখিয়া তাঁহার কোয়ার্টার্সের বাহিরে আসেন। বিপ্লবীরা তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করে। ভয়ে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই করেন। পরে মতের পরিবর্তন করিয়া তিনি স্বীয় রিভলভার সহ ঘরের বাহিরে আসিতেই বিপ্লবীদের গুলীর আঘাতে ধরাশায়ী হইয়া পড়েন।

অস্ত্রাগারের তালা ভাঙ্গার কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে অপর অফিসার ক্যাপ্টেন টেইট্ তিনজন সঙ্গীসহ হঠাৎ সেস্থানে উপস্থিত হন। তাঁহাদের উপর গুলী বর্ষিত হইলে তাঁহারাও তাড়াতাড়ি পলাইয়া যান। ইঁহার পর সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্ণ কয়েকজন সঙ্গীসহ অপর একখানি গাড়ীতে সেস্থানে পোঁছেন। বিপ্লবীরা তাঁহাদিগকে দেখা মাত্রই গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করেন। সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্ণ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করেন। সংবাদ পাইয়া ইহার পর আসেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইল্‌কিন্‌সন। বিপ্লবীদের গুলীর আঘাতে তাঁহার দেহরক্ষী কনস্টেবল নিহত এবং ড্রাইভার সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। গাড়ীর নীচে শুইয়া পড়িয়া ম্যাজিস্ট্রেট কোন রকমে স্বীয় প্রাণরক্ষা করেন। রেল-ওয়ের অস্ত্রাগারটি দখল হইলে পর, বিপ্লবীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ইত্যাদি লইয়া প্রস্তাবিত হেড কোয়ার্টার্সের দিকে রওয়ানা হইয়া যান। বিপ্লবীদের গুলীতে তখন পর্যন্ত মোট ৬ জন নিহত হইয়াছিল।

এদিকে অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষের দল একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়া ভাড়া ঠিক করিবার জন্য ড্রাইভারকে গণেশ ঘোষের গৃহের মধ্যে লইয়া যায়। তথায় রিভলভারের ভয় দেখাইয়া তাহার হাত পা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া তাঁহাকে একটি কামরায় আটক রাখা হয়। অতঃপর তাহার পাহারার জন্য একজন বিপ্লবীকে সেস্থানে বসাইয়া রাখিয়া সকলে পুলিশ লাইন আক্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়ে। অস্ত্রাগারটি ছিল একটি ক্ষুদ্র টিলার উপর। গাড়ীখানি নীচে রাখিয়া বিপ্লবীরা সিড়ি বাহিয়া একেবারে অস্ত্রাগারের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হয়। পাহারারত সিপাহী ব্যাপার কি তাহা চিন্তা করিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই গুলীর আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

গুলীগোলার শব্দে অস্ত্রাগারের অবশিষ্ট লোকজনের মধ্যে যে যে দিকে পারিল পলায়ন করায় অনায়াসে অস্ত্রাগারটি দখল হইয়া যায়। বিপ্লবীরা উহা হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বাহির করিয়া লইয়া সকলে সমস্বরে রিপাবলিকান আর্মির নামে জয়ধ্বনি তোলে। পরক্ষণে সূর্য সেন তাঁহার রিজার্ভ বাহিনী সহ তথায় উপস্থিত হইয়া অস্ত্রাগারে তাঁহার সদর কার্যালয় স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন।

অম্বিকা চক্রবর্তীর দল বিপ্লবীদের নিজস্ব একখানি গাড়ীতে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন অফিসে গমনপূর্বক এক প্রকার বিনাবাধায় উহার যন্ত্রপাতিগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া সূর্য সেনের হেড কোয়ার্টার্সে চলিয়া যায়। টেলিফোন অফিসে অপারেটর আহমদ উল্লাহ্‌কে ক্লোরোফর্ম করা ছাড়া তাহারা সেস্থানে আর কাহারও কোন ক্ষতি করে নাই।

এদিকে উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের দল চট্টগ্রাম লাইনের সর্বশেষ অর্থাৎ ধুম স্টেশনের নিকট রেল লাইনের ফিস্‌প্লেট অপসারিত করিয়া একখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত করে। কিন্তু ইহাতে লাইন এবং ট্রেনখানির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবুও ডঃ শাফায়াৎ আহমদ, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে আগত মেল ট্রেনখানি কয়েক ঘণ্টা দেরীতে পরদিবস চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছে। নিরাপত্তার জন্য জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ডাঃ শাফায়াৎ আহমদকে কমিশনারের বাংলোতে রাখা হইয়াছিল। কারণ, ঘটনাটি সম্মেলনের পূর্ব রাত্রে সংঘটিত হওয়ায়, পর দিবস প্রাতে স্বার্থসংশ্লিস্ট মহল হইতে প্রচার করা হইয়াছিল, মুসলমানদের সম্মেলন পণ্ড করার জন্যই বিপ্লবীরা এই সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে। মওলানা ইসলামাবাদী সঙ্গে সঙ্গে এই মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এদিকে অস্ত্রাগার দখলের সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পড়া মাত্রই কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় প্রাণভয়ে কর্ণফুলী নদীর বক্ষে অবস্থিত একখানি সমুদ্রগামী জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল মিঃ র‍্যামস্‌বোথাম কলেজ হোস্টেলে গ্রন্থকারের কামরায় অনেকক্ষণ অবস্থানের পর রাত্রির অবশিষ্টাংশ বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুল মোমেনের বাংলোতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

পাল্টা আক্রমণ

সন্ত-প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে গভীর রাত্রে সূর্য সেনের নেতৃত্বে যখন বিশিষ্ট বিপ্লবীরা পরবর্তী কর্মপন্থা নিরূপণে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় পুলিশ-বাহিনীর লোকজনেরা নিকটবর্তী ওয়াটার ওয়ার্কসের পাহাড় হইতে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে গুলী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড় হইতে গুলী বর্ষণ হইতে থাকায় বিপ্লবীরা বেকায়দায় পড়িয়া যায়। অস্ত্রাগারে অধিকক্ষণ অবস্থান আর নিরাপদ নয় মনে করিয়া বিপ্লবীরা উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। হিমাংশু সেন নামক একজন দুঃসাহসী বিপ্লবীর উপর এই কার্যের ভার ছিল। তিনি আগুন ধরাইতে গিয়া শরীরের বহুস্থান অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলেন। তাঁহার আশু চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল, অনন্ত গুপ্ত এবং গণেশ ঘোষ তাঁহাকে লইয়া একখানি মোটরে শহরের দিকে ধাবিত হন। কথা ছিল, হিমাংশু সেনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন। বলা বাহুল্য, নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য ইঁহারা আর তাঁহাদের সঙ্গে একত্রিত হইতে পারেন নাই। বহুক্ষণ তাঁহাদের জন্য অপেক্ষার পর বিপ্লবীরা সেই রাত্রে চট্টগ্রাম শহর আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়া পাহাড়ের পথে অস্ত্রাগার ত্যাগ করে।

এই নূতন পথ কাহারও ভাল জানা ছিল না। কাজেই অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই রাত্রি ভোর হইয়া যায়। বাধ্য হইয়া তখন সকলকে নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহারা সংখ্যায় তখন ৫৭ জন ছিলেন। সারারাত্রি পরিশ্রম ও অনাহারে ইঁহাদের সকলে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতির জন্যও তাঁহাদের উদ্বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তদুপরি শহরের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রাতে যাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল, তিনিও ফিরিয়া না আসায় সূর্য সেন বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। তাই অপরাহ্ন প্রায় তিনটার সময় দীপ্তিমেধা চৌধুরী ও অমরেন্দ্র নন্দীকে শহরে প্রেরণ করা হয়। ইঁহারা শহরের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পাহাড়ের পথ গ্রহণ করেন। কিন্তু সারারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে হাঁটিয়াও নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যেকবারই তাঁহারা পথ

ভুল করিতেছিলেন। পূর্বাকাশে সূর্য দেখা দেওয়ার সময় হইলে, অগত্যা ইঁহারা নিরাপত্তার জন্য দীপ্তিমেধার গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যান।

১৯শে এপ্রিল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সংবাদ সংগ্রহকারী যুবক তিনজনের কেহই ফিরিয়া না আসায়, বিপ্লবীরা শ্রান্তদেহ লইয়া আবার যাত্রা শুরু করেন। ফাতেহাবাদ পাহাড়ের নিকট পেঁছিলে রাত্রি অবসান-প্রায় দেখিয়া সূর্য সেন সকলকে তাড়াতাড়ি উক্ত পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন। এই পাহাড়েই তাঁহারা বৃক্ষের ফলমূল খাইয়া দুই দিন অতিবাহিত করেন। তথা হইতে ২১শে এপ্রিল গভীর রাত্রে তাঁহারা চট্টগ্রাম শহর দখলের জন্য যাত্রা করিয়া ২২শে এপ্রিল প্রাতে জালালাবাদ পাহাড়ে উপনীত হন। স্থির হয়, সন্ধ্যার একটু পরে শহর আক্রমণের জন্য তাঁহারা জালালাবাদ পাহাড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন।

জালালাবাদের সংঘর্ষ

কিন্তু ইঁহাদের অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত ছদ্মবেশী দুইজন কাঠুরিয়ার মুখে জালালাবাদ পাহাড়ে ইঁহাদের অবস্থানের কথা কর্তৃপক্ষের নিকট পেঁছা মাত্রই ক্যাপ্টেন টেইটের পরিচালনাধীনে ট্রেনযোগে একদল সৈন্য চট্টগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার একটু পূর্বে তথায় পেঁছে। ইঁহারা পাহাড়-টিকে ঘিরিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণের চেষ্টা করিতে থাকিলে বিপ্লবীরা ভীষণভাবে বাধা দেয়। বিপ্লবীদের গুলীতে কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণ পর আবার তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন দিক হইতে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে গুলী ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ চলে।

কিছুক্ষণ পর কর্ণেল স্মীথের অধীনে অপর একটি সুসজ্জিত সৈন্যদল আসিয়া পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চূড়া হইতে লুইস্‌গানের সাহায্যে গুলী বর্ষণ করিতে থাকে। এই লুইস্‌গানটি ছিল বন্দর এলাকায়। এবার বিপ্লবীদের অবস্থা সত্যই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। একে একে ত্রিপুরা সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, বিধু ভট্টাচার্য, নরেশ রায়, অর্ধেন্দু দস্তিদার, প্রভাষ বল, নির্মল লালা, শশাঙ্ক সেন, মধু দত্ত, জিতেন্দ্র দাসগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, মতি কানুনগো

প্রমুখ বিপ্লবী গুলীবিদ্ধ অথবা অন্যভাবে আহত হইয়া পড়েন। সৈন্যদের পক্ষেও বহুলোক হতাহত হয়। রাত্রির অন্ধকার ইতিমধ্যে ঘনীভূত হইয়া পড়ায় সৈন্যরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় তাহারা কিন্তু কিছু সংখ্যক সৈন্যকে গোপনে ইঁহাদের পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিল। সর্বমোট অর্ধশত বিপ্লবী জালালাবাদের এই অসম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

যুদ্ধ বিরতির জন্য নয়, বরঞ্চ এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ে উল্লসিত হইয়া অতঃপর বিপ্লবীরা' জয়ধ্বনি করিতে করিতে মৃত সঙ্গীদের দেহগুলি একত্রিত করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জ্ঞাপন করে। নিহতদের সর্বনিম্ন ও সর্ব ঊর্ধ বয়স ছিল যথাক্রমে ১৩ এবং ২৭ বৎসর মাত্র। জালালাবাদ পাহাড়ে বিপর্যয়ের পর চট্টগ্রাম শহর আক্রমণের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা পরিত্যক্ত এবং পরবর্তী কার্যক্রম রচনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। জালালাবাদ পাহাড়ের সংঘর্ষে ইংরেজ পক্ষে ৬০ জনের বেশী নিহত এবং প্রায় দুইশত আহত হইয়াছিল। এই সংখ্যা বহু পরে একটি বেসরকারী সূত্র হইতে প্রকাশ পায়।

বিপ্লবী সমর-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সে রাত্রেই বিপ্লবীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করে। ভোর বেলা সূর্য সেন দেখিতে পান, উচুনীচু পথ বাহিয়া মাত্র তাঁহারা এক মাইলেরও কম পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। অগত্যা সে পাহাড়েই দলবল সহ তিনি দিন অতিবাহিত করিবেন স্থির হয়। জালালাবাদ পাহাড় হইতে লোকনাথ বল যেই ক্ষুদ্র দলটি লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, অন্ধকারে তাঁহারা আর সূর্য সেনের দলের সন্ধান করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহারাও মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিলেন।

এদিকে জালালাবাদ পাহাড়ে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে। অম্বিকা চক্রবর্তীকে মৃত মনে করিয়া মৃতদের সঙ্গে সকলে তাঁহাকেও তথায় ফেলিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পর তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তিনি ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ফাতেহাবাদ গ্রামে তাঁহার পরিচিত এক বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পর দিবস প্রাতে ক্যাপ্টেন টেইট ও কর্ণেল স্মিথ আরও অধিক পুলিশ এবং সৈন্যসহ আবার জালালাবাদ

পাহাড় আক্রমণ করেন। কিছুক্ষণ গুলী বর্ষণের পরও উহার কোন উত্তর না পাইয়া তাঁহারা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দেখেন, এগার জন বিপ্লবীর মৃতদেহ সারিবদ্ধভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। একাধিক গুলীবিদ্ধ অর্ধেন্দু দস্তিদার তখনও জীবিত আছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালেই কয়েকদিন পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অনাহারে সারাদিন পাহাড়ের গুহায় কাটাইয়া সন্ধ্যার পর সূর্য সেন তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া নোয়াপাড়া তাঁহার নিজ বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তাঁহাদিগকে কয়েকবার পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বাড়ীতে পেঁছিয়া তাঁহারা জানিতে পারেন, ইতিমধ্যে পুলিশ দুইবার তাঁহার বাড়ী তল্লাশী করিয়াছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাঁহারা কোয়েপাড়া রওয়ানা হইয়া যান। এই গ্রামে বিপ্লবীদের একটি ছোটখাটো আড্ডা ছিল। বিনয় সেন ছিলেন উহার পরিচালক। সূর্য সেন ও অপরাপর সকলে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং বিরাট ঝুঁকি লইয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পর হঠাৎ লোকনাথ বল কতিপয় বিপ্লবীসহ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে পাইয়া সূর্য সেন অত্যন্ত আনন্দিত হন। লোকনাথের উপস্থিতিতে দলের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। দলের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনিই সর্বাধিক দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

অস্ত্রাগারে আগুন ধরাইতে গিয়া হিমাংশু সাংঘাতিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হইয়া পড়ায় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ বিপ্লবীগণ তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য শহরে লইয়া গিয়াছিলেন। হিমাংশু পরে ধরা পড়িয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশিষ্ট বিপ্লবীরা আর ফিরিয়া যাইবার সুযোগ না পাইয়া শহরেই অবস্থান করিতে থাকেন। ২২শে এপ্রিল রাত্রে তাঁহারা ভাটিয়ারী স্টেশন হইতে ট্রেনযোগে কুমিল্লা যাত্রা করেন। ভাটিয়ারী স্টেশন মাস্টারের সন্দেহ হওয়ায় তিনি ফেনী, লাকসাম, কুমিল্লা প্রভৃতি স্টেশনে তার করিয়া তাঁহার সন্দেহের বিষয় জানান। ট্রেনখানি ফেনী পেঁছিলে একদল সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া তাঁহাদিগকে গাড়ী হইতে নামিতে বাধ্য করে। পুলিশ তাঁহাদের দেহ তল্লাশী করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারা রিভলভার লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন।

পুলিশেরা প্রস্তুত হইবার মোটেই সুযোগ না পাইয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করে। তাহাদের দেখাদেখি স্টেশনের অন্যান্য লোকজনও উর্ধ্বশ্বাসে গ্রামের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করে। এই সুযোগে চারিজন বিপ্লবী গা ঢাকা দিয়া পড়েন।

ফেনী হইতে তাঁহারা যথাসময় কলিকাতায় পৌঁছেন। খ্যাতনামা বিপ্লবীনেতা ভূপেন্দ্র দত্ত তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিছুদিন পর লোকনাথ বলও তাঁহাদের সঙ্গে একত্রিত হন। শশধর আচার্য নামক জনৈক বিপ্লবীকে নকল গৃহস্বামী এবং সুহাসিনী দেবীকে তাঁহার নকল স্ত্রী সাজাইয়া তাঁহাদের উপর ইঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়।

অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণ

এদিকে সূর্য সেন, লোকনাথ বল প্রমুখ বিপ্লবীর নিকট হইতে যে সকল অল্প বয়স্ক বিপ্লবী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ ইতিমধ্যে ধরা পড়িবার পর মারপিট সহ্য করিতে না পারিয়া পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করিতেছিল। এ সকল স্বীকারোক্তির ফলে আরও কয়েকজন বিপ্লবী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়ে। এ সংবাদ পাইয়া অনন্ত সিংহ সঙ্গীদের সহিত পরামর্শক্রমে স্বেচ্ছায় কলিকাতায় পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাকে পাইয়া বন্দী বিপ্লবীদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী নির্যাতনের ভয়ও তাঁহাদের অন্তর হইতে দূর হইয়া যায়। পলাতক লালমোহন সেন সেই সময় গোপনে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। পুরস্কারের লোভে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়।

ইহার কিঞ্চিদধিক দুই মাস পর পুলিশ চন্দননগরে কয়েকজন বিপ্লবীর অবস্থানের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের গ্রেফতারের জন্য বিরাট প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট দিন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট একদল সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ সমভিব্যাহারে রাত্রি অনুমান ৪টার সময় উক্ত বাড়ীটি ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যান। বিপ্লবীরা পুলিশের পদশব্দে

জাগরিত হইয়া দেখেন, পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা বহির্বাটীর প্রাচীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হন এবং অতিকষ্টে প্রাচীর লঙ্ঘন করেন। কিন্তু এক প:-ও অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই পুলিশ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় আরম্ভ হইয়া যায়। জীবন ঘোষাল পুলিশের গুলীতে সে স্থানেই নিহত হইলেন। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্ত তাহাদের হাতে বন্দী হন। নকল গৃহস্বামী ও তাহার নকল স্ত্রীকে পুলিশ ভীষণ মারপিট করিয়া কলিকাতায় লইয়া যায়। পুলিশের গুলীতে অপর এক বাড়ীর একটি নিরীহ ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়। যথাসময়ে ধৃত বিপ্লবিগণ চট্টগ্রামে প্রেরিত হন। ইতিপূর্বেই তথায় চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ ইউনি, রায়বাহাদুর, ডি পি. ঘোষ পরে রায়বাহাদুর নরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী ও খান বাহাদুর আবদুল হাইকে লইয়া গঠিত একটি ট্রাইব্যুনালে অনন্ত সিংহ এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের বিচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ইঁহাদের গ্রেফতারের পর আবার নূতন করিয়া সকলের বিচার আরম্ভ করিতে হয়।

ফেনী স্টেশনে গোলমালের পর পুলিশ বুঝিতে পারে, বিপ্লবীদের অনেকে চট্টগ্রামের কোন না কোন এলাকায় আত্মগোপন করিয়া আছে। চট্টগ্রাম হইতে বাহিরে যাইবার পথগুলি তাই তাহারা আরও কড়া পাহারাধীন রাখিবার ব্যবস্থা করে। এদিকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি-দের বাড়ীতেও ঘন ঘন তল্লাশী চলিতে থাকে। বিপ্লবীদের মধ্যে যাহারা তখনও কারাগারের বাহিরে ছিল, তাহাদের পক্ষে আর অধিক দিন পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইল না। সাংঘাতিক রকমের আর কিছু না করিবার পূর্বে পুলিশের হাতে ধরা পড়া কাপুরুষতার পরিচায়ক মনে করিয়া লইয়া পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার্স ও ক্লাব আক্র-মণের অনুমতি দানের জন্য বিপ্লবীরা সূর্য সেনকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক হয় রজত সেন, স্বদেশ রায়, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, ফনীন্দ্র নন্দী প্রমুখ আরও কয়েকজন বিপ্লবী নির্দিষ্ট দিন উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য পাহাড়তলী গমন করিবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যথোপযুক্ত আয়োজনও হইল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন বিপ্লবীরা তথায়

পৌঁছিয়া দেখিতে পায় ইহা এত বেশী সুরক্ষিত যে, কোন ক্রমেই ইহার নিকট পৌঁছা সম্ভবপর নয়। হতাশ হইয়া ফিরিবার পথে তাহারা কোয়েপাড়ার রজত সেনের বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করে। সেস্থানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর পুলিশের আগমন সংবাদ পাইয়া তাহারা কর্ণফুলী নদীর দিকে দ্রুত পলাইয়া যায়। পুলিশের লোকজনেরাও তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে। কালারপুলের নিকট উপস্থিত হইলে, পুলিশ সুবোধ চৌধুরীকে ধরিয়া ফেলে। অল্পক্ষণ পরে ফনীন্দ্র নন্দীও কর্ণেল ফার্মারের সৈন্যদলের হাতে ধরা পড়েন। অবশিষ্ট চারিজন স্থানীয় জনৈক মুসলমান চাষীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুলিশ ও সৈন্যরা সেদিকে আসিতেছে দেখিয়া আশ্রয়দাতা তাঁহাদিগকে একটি শণক্ষেতে লুকাইয়া রাখেন। কিন্তু এ সময় ভোর হওয়ায় সৈন্যরা তাঁহাদিগকে সহজে আবিষ্কার করিয়া ফেলে। ইহার পর উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ সংগ্রাম চলে। সংগ্রামের শেষে দেখা যায়, চারিজনের একজনও আর জীবিত নাই। ইতিমধ্যে বিনয় সেনও ধরা পড়িয়া যান। মুসলমানরা যেই অল্প কয়টি ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদিগকে সক্রিয় সাহায্য দান করিয়াছিল, উপরোক্ত ঘটনা তন্মধ্যে একটি।

কালারপুলের ঘটনা এবং কোয়েপাড়াস্থ বিপ্লব-আড্ডার পরিচালক বিনয় সেনের গ্রেফ্‌তারের পর, সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে থাকিলেও যোগাযোগের সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বিপ্লবী দল তাহাদের গুপ্তচরদের মুখে জানিতে পারে, তাহাদের অন্যতম প্রধান শত্রু বাংলার তদানীন্তন পুলিশের আই. জি. মিঃ ক্রেগ ১লা ডিসেম্বর কলিকাতার পথে চাঁদপুরে ট্রেন হইতে নামিয়া গোয়ালন্দ-গামী জাহাজে আরোহণ করিবেন। কালীপদ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁহার হত্যার জন্য তখনই চাঁদপুর রওয়ানা হইয়া যান। ট্রেনখানি চাঁদপুর স্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহারা দেখিতে পান প্রথম শ্রেণীর একখানি কামরায় কোট-প্যাণ্ট পরিহিত জনৈক সুদর্শন ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাকেই মিঃ ক্রেগ্ মনে করিয়া তাঁহারা উভয়ে একসঙ্গে তাঁহার উপর রিভলভারের গুলী বর্ষণপূর্বক বিদ্যুৎবেগে সেস্থান হইতে সরিয়া পড়েন। আক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন পুলিশ ইন্‌সপেক্টার মিঃ তারিণী মুখার্জী।

চাঁদপুরের পুলিশ তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন স্থানে জরুরী তার করিয়া এই সংবাদটি ছড়াইয়া দেয়। আততায়িগণ প্রাণপণ দৌড়াইয়া মেহের কালীবাড়ী স্টেশনে পৌঁছিয়া বিশ্রামের মানসে তথায় বসিয়া পড়েন।

ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ দাসগুপ্ত সে সময় তাঁহার দলবলসহ মোটরে করিয়া সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহারা আততায়ীদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে উভয়ে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলেন। আলিপুরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে রামকৃষ্ণের ফাঁসি এবং অল্প বয়স্ক বলিয়া কালীপদ চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মিঃ গার্লিক ট্রাইব্যুনালের চেয়ার-ম্যান ছিলেন। ইহার কিছু দিন পর তারকেশ্বর দস্তিদার নামক জনৈক বিপ্লবীর গুলীতে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য নিহত হন। তিনি তারকেশ্বর ও বীরেন্দ্র দে নামক দুইজন বিপ্লবীকে ধরিবার চেষ্টায় ছিলেন।

উপরে এক স্থানে বলা হইয়াছে, ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে স্বল্প-সংখ্যক বিপ্লবীকে লইয়া স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ধৃত বিপ্লবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হন ব্যারিস্টার শ্রী শরৎচন্দ্র বসু, ব্যারিস্টার শ্রী বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, শ্রী সন্তোষ কুমার বসু, শ্রী অখিল দত্ত, শ্রী কামিনী কুমার দত্ত এবং স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট আইনজীবী। মামলার বিচার দেখা অপেক্ষা অসীম সাহসী বিপ্লবী যুবকদিগকে দর্শনের জন্য প্রত্যহ আদালতে এবং আদালতের বাহিরে সহস্র সহস্র লোকের ভিড় হইতে থাকে। গ্রেফতারের পর পুলিশ যাহাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছিল, বিচারের সময় তাহারা সকলে তাহা প্রত্যাহার করে।

বিচারের সময় আসামী ও সরকার পক্ষের মধ্যে প্রায়ই তুমুল বাদানুবাদ চলিত। পুলিশ সবক্ষেত্রে আসামীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করিত। আদালতের নিকট হইতে ইহার প্রতিকার না পাইলে আসামীরা নানা স্লোগান তুলিয়া আদালতের কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। একবার এজলাসে পুলিশের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষ বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছিল। পাবলিক প্রসিকিউটর বিপ্লববাদীদের উদ্দেশ্যে একটি অশোভন মন্তব্য করায় লোকনাথ বল তাঁহাকে উহা

প্রত্যাহার করিতে বলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর সম্মত না হইলে, লোকনাথ তাঁহার উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। অসহায় জজ মিঃ ইউনি অতঃপর পুলিশ সুপার মিঃ সুটারকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ দান করেন। তিনি দলবল সহ আসামী-দের কাঠগড়ায় প্রবেশ করেন। পুলিশের লোকজন লোকনাথের দিকে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ করা মাত্রই অন্যান্য বিপ্লবীরা তাহাদিগকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। লোকনাথ তখনও সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন। ব্যাপার গুরুতর মনে করিয়া মিঃ ইউনি তখন পুলিশ সুপারকে দলবল সহ বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া কোন রকমে শান্তি ফিরাইয়া আনেন। এই ঘটনার পর আদালত-গৃহে পুলিশ কিম্বা সরকার পক্ষের অন্য কেহ তাঁহাদের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করিতে আর সাহস পান না।

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র

নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের যাঁহারা তখনও মুক্ত ছিলেন, তাঁহারা আটক বিপ্লবীদিগকে মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন গোড়া হইতেই। এই উদ্দেশ্যে দুইটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। একটি পরিকল্পনায় আদালত-গৃহে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া সমস্ত রক্ষীদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া কাঠগড়া হইতে বিচারাধীন বিপ্লবীদিগকে মুক্ত করিবার প্রস্তাব ছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে আদালত-গৃহের প্রবেশ পথের এক পার্শ্বে ডিনামাইট স্থাপিত হয়। কিন্তু অন্যান্য আনুষঙ্গিক আয়োজন শেষ করিবার পূর্বেই একদিন প্রত্যুষে বিস্ফোরক পদার্থ সহ একটি বালক হঠাৎ আদালত-গৃহের অতি নিকটে ধরা পড়ে। তাহার নিকট হইতে পুলিশ বল-প্রয়োগে বহু তথ্য উদ্ধার করে। ইহার ফলে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ, ইলেকট্রিক তার, বাল্‌ব প্রভৃতি পুলিশের হস্তগত হয়।

এই সম্পর্কে তাহারা বিপ্লবী অর্ধেন্দু শেখর গুহ, অনিল রক্ষিত, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব সেন, রবীন্দ্র সেন, নিবারণ ঘোষ, সুনীল সেন প্রমুখ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা আনয়ন করে। বিচারে

সকলেরই দুই হইতে তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অপূর্ব সেনকে পুলিশ গ্রেফতার করিতে পারিল না বলিয়া তাহাকে আর তখন জেলে প্রেরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। দণ্ডিত যুবকদের কেহ কেহ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। এ কারণে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ধৃত ও পলাতক বিপ্লবীদের সাহায্যার্থ তাহারা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

আদালত-গৃহে বিস্ফোরণ ঘটাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লবীরা জেলখানার একাংশ উড়াইয়া দিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। এ ব্যাপারে তাহারা যে কঠোর অধ্যবসায়, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহা ভাবিলে সত্যই আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। জেলখানার মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাওয়া অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। সূর্য সেন এ কার্যের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। বিপ্লবীরা উহার সাহায্যে কর্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া জেলখানার মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি এবং আগ্নেয়াস্ত্র পাঠাইতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ একদিন ব্যাপারটি জানাজানি হইয়া পড়ে। বন্দীদের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন স্থানে কয়েকটি সংস্কার ও সম্প্রসারণের কার্যে নিযুক্ত লোকজন মাটির নীচে ছোরা, বালব, তরবারি, রিভলভার, ইলেক্‌ট্রিক তার ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। অতঃপর কর্তৃপক্ষ এত সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, জেলের মধ্যে আর কিছু করা বা পাঠানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তবুও বিপ্লবীদের চেষ্টার বিরতি ঘটে না। তাহারা নূতন নূতন ফন্দি আঁটিতে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সফলকাম হইতে পারেন নাই।

আহসান উল্লাহর হত্যা

গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম কৃতী অফিসার খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটনার তদন্ত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই উপস্থিতিতে, ইঙ্গিতে, অথবা জ্ঞাতসারে পুলিশ যে কত নিরীহ পরিবারের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায়, তিনি চট্টগ্রামে বেশ কিছু দিন বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার হত্যার ভার অর্পিত হয় হরিপদ ভট্টাচার্য নামক স্থানীয় একটি সংস্কৃত টোলের জনৈক ছাত্রের উপর। হরিপদ ভট্টাচার্যকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় না। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামের সর্বপ্রধান ফুটবল খেলার ফাইন্যাল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে খান বাহাদুর মাঠের ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গে কথাবার্তায় রত ছিলেন। এমন সময় হরিপদ তাঁহাকে পরপর চারিবার গুলী করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দেন। ঘটনাস্থলেই হরিপদ ধরা পড়েন। উৎসাহী পুলিশ হরিপদের বিচারের ভার স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক সে স্থানেই শত শত দর্শকের সম্মুখে ভীষণ মারপিট করিয়া তাঁহাকে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় থানায় লইয়া যায়।

পর দিবস পূর্বাহ্ণে ফিরিঙ্গিবাজারে খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্র জানাজায় সমবেত লোকজনকে পুলিশ নানাভাবে উত্তেজিত করিতে থাকে। তাহারা মুসলমানদিগকে বুঝাইতে থাকে, আহসান উল্লাহ্ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন বলিয়াই ঈর্ষাবশতঃ হিন্দুরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। পুলিশের উস্কানীতে উত্তেজিত জনতা আহসান উল্লাহ্কে কবরস্থ করিয়াই হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ করিতে আরম্ভ করে। প্রায় চারি ঘণ্টা লুঠতরাজ চলিয়াছিল। বলা অনাবশ্যক, লুণ্ঠন কার্যে পুলিশের কিছু সংখ্যক লোক সাধারণ লোকের চেয়ে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করে। চট্টগ্রামের এই ঘটনা তদন্তের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুলিশকে ইহার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী করিয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন।

পর দিবস হরিপদকে দর্শনের জন্য কয়েকশত লোক কোতোয়ালী থানার সম্মুখে ভিড় করিলে, পুলিশ তাঁহাকে হাজত-গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া আসে। তাঁহার চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ হইতে তখনও রক্তক্ষরণ হইতেছিল। সেই অবস্থায়ও পুলিশ তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে রাস্তায় হাটাইয়া দর্শকদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিয়াছিল।

যথাসময়ে শ্রী সুকুমার সেন, আই. সি. এস., একটি স্পেশাল জুরীর সাহায্যে হরিপদর বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। হাইকোর্টে আপীলের ফলে মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে

পরিণত হয়। পুলিশের লোকজনেরা অন্যায়ভাবে হরিপদর বাড়ীঘরও একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। ধৃত বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে পুলিশকে এই জাতীয় অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রায়শঃ দেখা যাইত।

ইহার মাত্র কিছু দিন পূর্বে পুলিশ কোন এক সূত্রে সন্ধান পাইয়া পটিয়ার একটি গ্রাম হইতে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা এবং মৃতভ্রমে জালালাবাদ পাহাড়ে পরিত্যক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে। ইহার প্রায় পর পরই হেমেন্দ্র দস্তিদার এবং সরোজ গুহ ধরা পড়েন। তাঁহাদের বিচারের জন্য চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ উইলিয়াম্‌সের সভাপতিত্বে একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। অম্বিকা চক্রবর্তীর দণ্ড লইয়া বিচারকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। জনাব এ. এফ. এম. রহমান তাঁহার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারক মিঃ উলিয়াম্‌স ও শ্রী নৃসিংহ মুখার্জী চরম দণ্ডদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করায়, তদনুসারে তাঁহায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। সরোজ গুহের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। হেমেন্দ্র খালাস পান। হাইকোর্টে আপীল করা হইলে অম্বিকা চক্রবর্তীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রদ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সরোজ গুহের দণ্ড বহাল থাকে। ইনিই ধরা পড়িবার পূর্বে রমেন ভৌমিকের সহিত এক-যোগে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নে'র উপর গুলী চালাইয়াছিলেন।

মিঃ ইউনিকে চেয়ারম্যান করিয়া যেই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল, ইত্যবসরে তাঁহারা মামলার বিচার শেষ করিয়া ফেলেন। বিচারে তাঁহারা গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অনন্তলাল সিংহ, আনন্দ গুপ্ত, লাল মোহন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ রায়, সুখেন্দু দস্তিদার, ফকীর সেন, সহায়রাম ও দাস রণবীর দাসগুপ্তের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেন। নন্দলালের হয় দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। অল্প বয়সের বলিয়া অনিলবন্ধু দাসকে তিন বৎসরের জন্য বোরস্টাল স্কুলে পাঠাইবার আদেশ হয়। এ সময় তাহার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর। অবশিষ্ট ১৩ জন খালাস পান।

কুমিল্লার সহকারী পুলিশ মিঃ এলিসন বিপ্লব আন্দোলন দমনের ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিয়া বিপ্লবীদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়িয়া-

ছিলেন। তাঁহার হত্যার ব্যবস্থার জন্য চট্টগ্রাম হইতে বিনোদ দত্ত কুমিল্লায় প্রেরিত হন। তিনি কুমিল্লায় পৌঁছিয়া শৈলেশ রায় নামক জনৈক বিপ্লবীকে এ কার্যের জন্য মনোনীত করেন। একদিন মিঃ এলিসন যখন সাইকেলে কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন, তখন শৈলেশ রায় উপর্যুপরি তাঁহার উপর কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করিয়া পলায়ন করেন। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও হত্যাকারীর সন্ধান করিতে অসমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৩১ সালে মার্চ মাসে চট্টগ্রাম জেলার বরামা নামক একটি গ্রামে গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক দারোগা বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারকে গ্রেফতার করিতে যাইয়া গুলীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন।

ধলঘাটের সংঘর্ষ

কোয়েপাড়ার বিপ্লব-আড্ডা ত্যাগ করিয়া সূর্য সেন ও নির্মল সেন ধলঘাট গ্রাম নিবাসী মৃত নবীন চক্রবর্তীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবী বিপ্লববাদ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন। এই স্থানে বসিয়া কাজের সুবিধার জন্য সূর্য সেন মহিলা কর্মী সংগ্রহের পরিকল্পনা রচনা ও উহা কার্যকর করিতে উদ্যোগী হন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁহার আশ্রয়দাত্রী সাবিত্রী দেবীর নিকট হইতে আশাতীত সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু সূর্য সেন ও নির্মল সেনের এই বাড়ীতে অবস্থানের কথা শীঘ্রই পুলিশের কর্ণগোচর হয়। ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন অর্থাৎ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পর ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ এবং পুলিশ সাবইন্‌সপেক্টর মনোরঞ্জন সেন একদল সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ লইয়া উক্ত বাড়ীতে হানা দেয়। সূর্য সেন এবং তাঁহার সঙ্গীরা বাড়ীর উপরের তলায় থাকেন, ইহা ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সূর্য সেন ও নির্মল সেন তাঁহার উপর গুলী চালান। ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ গুলীবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া তখনই প্রাণ হারান। ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের দুর্দশা দেখিয়া সৈন্যরা বিপ্লবীদের প্রতি অবিশ্রান্ত গুলী ছুঁড়িতে থাকে।

উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ গুলী বিনিময়ের পর নির্মল সেন গুলীবিদ্ধ হইয়া ক্যামেরণের ন্যায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নির্মল সেনের মৃত্যুর পর সূর্য সেন যেন তাঁহার বল-বিক্রম সবই হারাইয়া ফেলিলেন; কোন রকমে অপূর্ব সেনকে সঙ্গে লইয়া নীচের তলায় নামিয়া আসিয়া তিনি সকলকে জানাইলেন, তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া মহিলা-কর্মী প্রীতিলতাও তাঁহাদের সঙ্গে রওয়ানা হন। কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই সৈন্যদের গুলীবিদ্ধ হইয়া অপূর্ব সেন মাটিতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা প্রায় চারি মাইল কর্দমাক্ত রাস্তা অতিক্রমপূর্বক অতিকষ্টে জ্যৈষ্ঠপুরা নামক একটি গ্রামে আসিয়া বিপ্লবীদের একটি ছোট আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পর দিবস প্রাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও সৈন্যবাহিনীর মেজর গর্ডন এক বিরাট দল সহ সাবিত্রী দেবীর বাড়ী ঘেরাও করিয়া সকলকে আত্মসমর্পণ করিতে বলেন। তদনুসারে সাবিত্রী দেবী তাঁহার পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া আত্মসমর্পণ করিলে লুইস-গানের সাহায্যে বাড়ীর এক অংশ উড়াইয়া দেওয়া হয়। বাড়ীতে প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতে তাঁহারা জানিতে পারেন, সূর্য সেন এবং প্রীতিলতা এই বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রেফ্‌তারের জন্য চারিদিকে অনেক অনুসন্ধান চলিল। কিন্তু পুলিশ বাহিনী তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিল না। প্রীতিলতা ছিলেন চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তাঁহার পিতা জগবন্ধু ওয়াদেদার স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করিতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অব্যবহিত পূর্বে প্রীতিলতা বিপ্লব-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তবে তাঁহার সহিত সূর্য সেনের কোথায় প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ পায় নাই।

সৈন্য ও পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিপ্লবীরা কঠিন সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার একমাত্র উপযুক্ত স্থান হিসাবে বাছিয়া লওয়া হয় পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব। ভারতবাসীর প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর চট্টগ্রামের সরকারী উচ্চ পদগুলির প্রায় সব কয়টিতে ইউরোপীয় অফিসার আমদানী করা

হইয়াছিল। তাহা ছাড়া নূতন আমদানী করা সৈন্য বাহিনীতেও বহু ইউরোপীয় অফিসার ছিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহারা সকলে মিলিয়া পাহাড়তলী ক্লাবে নাচগান, হৈ-হল্লা করিতেন। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রে প্রীতিলতার পরিচালনাধীনে কাটুলী গ্রামস্থ বিপ্লবীদের আড্ড হইতে কয়েকজন বিপ্লবী মুসলমান শ্রমিক-মজুরের বেশে রাত্রি দশটার সময় ক্লাবের বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হয়। ক্লাবের পাহারাদারেরা ইহাদিগকে ড্রাইভার, গাড়োয়ান ইত্যাদি মনে করিয়া তথায় গমনে বাধা দেয় না। পঞ্চাশ হইতে ষাটজন ইউরোপীয় নরনারী তখন ক্লাব হলে নাচগানে মশ্‌গুল ছিলেন। বিপ্লবীরা ক্লাবের দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরে বোমা নিক্ষেপ এবং গুলী চালাইতে থাকে। ভয়ার্ত নরনারীরা বিকট চিৎকার করিয়া গৃহের মধ্যেই ছুটাছুটি এবং চায়ের পেয়ালা, গ্লাস, ছুরি, কাঁটা চামচ ইত্যাদি বিপ্লবীদের দিকে ছুঁড়িয়া মারিতে থাকেন। কার্যশেষে প্রীতিলতা সকলকে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া নিজে পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষপানে সেই স্থানেই আত্মহত্যা করেন। তাঁহার এই আত্মহত্যার কারণ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। তবে কেহ কেহ বলেন, আহত অবস্থায় ধরা পড়ার আশঙ্কায় তিনি আত্মহত্যা করেন। ইউরোপীয় ক্লাবে হতাহতদের সংখ্যা সরকার প্রকাশ করেন নাই। বাজারে গুজব রটে সর্বসমেত তেরজন নিহত এবং আঠারো জন আহত হইয়াছিলেন।

সূর্য সেনের গ্রেফ্‌তার

ধলঘাট হইতে পলায়নের পর সূর্য সেন জ্যেষ্ঠপুরায় অবস্থিত বিপ্লবীদের একটি আস্তানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি গৈরলা গ্রামে বিশ্বাসদের বাড়ীতে চলিয়া যান। শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সরকারের ধারণা ছিল, সূর্য সেন চট্টগ্রামের বাহিরে কোন স্থানে আত্মগোপন করিয়া আছেন। কিন্তু ধলঘাট গ্রামের ঘটনার পর এই সর্বপ্রথম তাঁহারা জানিতে পারেন, তিনি চট্টগ্রামেই আছেন। তাঁহাকে ধরাইয়া দিতে পারিলে কিম্বা তাঁহার অবস্থানের সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে যে পুরস্কারের

পরিমাণ ছিল পূর্বে পাঁচ হাজার টাকা, কর্তৃপক্ষ পরে তাহা দশ হাজারে বৃদ্ধি করেন। ইচ্ছা থাকিলে এবং চেষ্টা করিলে আরও বহু বিপ্লবীর ন্যায় সূর্য সেনও চট্টগ্রামের বাহিরে দীর্ঘকাল আত্মগোপনে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

সূর্য সেনের অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর ব্রজেন্দ্র সেনের ভ্রাতা নেত্র সেন পুরস্কারের লোভ সামলাইতে না পারিয়া গোপনে কর্তৃপক্ষকে খবর পৌঁছায়। ১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে ক্যাপ্টেন ওয়াম্‌সলী কতিপয় অফিসার এবং একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়া বিশ্বাসদের বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলেন। নেত্র সেন দূরে থাকিয়া ইঙ্গিত করা মাত্রই সৈন্যরা বাড়ীর উপর চড়াও হয়। অসুস্থ সূর্য সেন তাড়াতাড়ি বুদ্ধি স্থির করিয়া ফেলিলেন। বাড়ীর যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া তাঁহারা পলায়ন করিবেন বলিয়া ঠিক হইল, তাহার বিপরীত দিকে সকলকে তিনি গুলী ছুঁড়িতে আদেশ দিলেন। ইহার ফলে সৈন্যরা সেদিকেই অধিক মনোযোগ দেয়। অতঃপর বিপ্লবীরা গোপন পথে অগ্রসর হইয়া বাঁশের একটি উঁচু বেড়ার নিকট পৌঁছেন। সুশীল দাসগুপ্ত একে একে সকলকে কোলে করিয়া বাঁশের বেড়া পার করিয়া দিতে লাগিলেন। সূর্য সেনকে পার করিবার সময় একটি গুলী আসিয়া তঁাহার হাত বিদ্ধ করায় তিনি আর তাঁহাকে বেড়া পার করিয়া দিতে পারিলেন না। সূর্য সেন নিজেই কোন রকমে বেড়া পার হইলেন। কিন্তু বেড়া পার হইয়া পুকুরের জলে আত্মগোপনের জন্য যেখানে পা ফেলিলেন, সেখানে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মনবিহারী ক্ষেত্রী নামক একটি গুর্খা সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। সূর্য সেন একেবারে তাহার হাতের মুঠার মধ্যেই পড়িয়া গেলেন। চীৎকার করিয়া মনবিহারী তাহার সঙ্গীদিগকে ডাকিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া কয়েকজন অফিসারও সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। আলো জ্বালাইয়া তাঁহারা দেখিলেন ধৃত ব্যক্তি স্বয়ং সূর্য সেন। ব্রজেন সেনও কয়েক গজ দূরে ধরা পড়িয়া গেলেন। সূর্য সেনের দেহ তল্লাশী করিয়া একটি রিভলভার ও কিছু কার্তুজ পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রেফতারের সংবাদ সেদিনই চট্টগ্রামের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে এবং আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা বিশেষ বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অন্যান্য বিপ্লবীরা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নেত্র সেনকে হত্যা করে। গ্রামবাসীরা নেত্র সেনের হত্যাকারীর নামধাম জানিত। কিন্তু পুরস্কারের লোভ এবং নির্যাতনের ভয় প্রদর্শন করিয়াও পুলিশ তাহাদের নিকট হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কিছু দিন পরে পটিয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর মাখনলাল দীক্ষিতকেও বিপ্লবীরা গুলী করিয়া হত্যা করে। পলাতক বিপ্লবীদিগকে গ্রেফতারের জন্য তাহার উৎসাহের অবধি ছিল না। এইরূপে সরকার পক্ষেরও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সূর্য সেনের বিচার

চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে ফাঁসির আসামীদের জন্য নির্দিষ্ট একটি কামরায় সূর্য সেনকে কড়া পাহারাধীন রাখা হয়। রামায়ণ ছাড়া তাঁহাকে আর কিছুই পড়িতে দেওয়া হইত না। সূর্য সেনের গ্রেফ্‌তারের পর হইতে কল্পনা দত্ত, তারকের দস্তিদার প্রমুখ বিপ্লবীগণ গহিরা গ্রামনিবাসী পূর্ণ তালুকদারের গৃহে বাস করিতেছিলেন। মে মাসের মাঝামাঝি পুলিশ ও সৈন্যরা হঠাৎ এক গভীর রাত্রে বাড়ীটি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে এবং মুহূর্তের মধ্যে উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় শুরু হইয়া যায়। সেদিন বিপ্লবীদের নিকট বেশী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না বলিয়া তাহারা প্রতিপক্ষের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। সৈন্যদের গুলীতে পূর্ণ তালুকদার, তাঁহার এক ভ্রাতা, শচীন্দ্র দাস ও মনোরঞ্জন দাস নিহত হওয়ার পর কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর প্রমুখ বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ করেন।

জেলখানার সংলগ্ন গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়ের একটি কামরায় সূর্য সেন, তারকেশ্বর এবং কল্পনার বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। মিঃ ম্যাকশার্প, জনাব খোন্দকার আলি তৈয়ব এবং শ্রী রজনী ঘোষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য নিযুক্ত হন। সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনার জন্য আলিপুর কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর নগেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করেন চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার শ্রী জে. ঘোষাল, শ্রী বিনোদ সেন ও শ্রী রজনী বিশ্বাস। বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের হয় মৃত্যুদণ্ড এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

দা দত্ত বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠণের পর। তাহাদের জন্য তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ছয় বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। জেলে অবস্থানকালে তিনি কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্টা হন। মুক্তির কিছুদিন পর স্বনামধন্য কমিউনিস্ট নেতা কমরেড যোশীর সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন। ইনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার কথা শ্রবণ মাত্রই বিপ্লবীরা ইউরোপীয়দের উপর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন ইউরোপীয়দের ক্রিকেট খেলার মাঠে দর্শকগণের আসনের নীচে ডিনামাইট স্থাপনপূর্বক একসঙ্গে বহু ইউরোপীয়কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। নির্দিষ্ট তারিখে হিমাংশু ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, নিত্য গোপাল ভট্টাচার্য এবং হরেন্দ্র চক্রবর্তী দ্বিপ্রহরে ডিনামাইট স্থাপনের জন্য মাঠে গমন করেন। তাঁহাদিগকে সন্দেহজনকভাবে খেলার মাঠে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পাহারারত পুলিশের সন্দেহ হয়। অতঃপর তাহারা আরও কয়েকজন পুলিশকে সংবাদ দিয়া আনিয়া সকলে একযোগে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেই বিপ্লবীরা গুলী ছুঁড়িতে আরম্ভ করেন। হিমাংশু ও নিত্য গোপাল পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারান। কৃষ্ণ চৌধুরী ও নরেন্দ্র চক্রবর্তী আত্মহত্যা করিবার সুযোগ পর্যন্ত পাইলেন না। বিচারে তাঁহাদের উভয়েরই ফাঁসির আদেশ হয়।

সূর্য সেনের ফাঁসি

সরকার কর্তৃক সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসির দিন গোপন রাখা সত্ত্বেও বন্দী বিপ্লবীরা কোন এক সূত্রে জানিতে পারে, ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী তাঁহাদের উভয়ের ফাঁসি হইবে। এ সংবাদ সূর্য সেনকে জানানো হইলে তিনি অন্যান্য বন্দীদিগকে বলিয়া পাঠান, ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলিবেন। তদনুযায়ী সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথমে উচ্চস্বরে 'বন্দে মাতরম্,' ধ্বনি করেন। সূর্য সেনের কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্রই জেলের শত শত বন্দী সমস্বরে 'বন্দে মাতরম্,' ধ্বনি করিয়া উঠে। কয়েক মিনিট পর্যন্ত

কেবল শ্লোগানই চলে। সমগ্র এলাকার অধিবাসীরা উৎকর্ণ হইয়া ইহা শ্রবণ করিতে থাকে। কিন্তু কারফিউ ছাড়াও চারিপার্শ্বের রাস্তায় পুলিশের কড়া পাহারা ছিল বলিয়া বিপদের আশঙ্কায় কেহ সে সময় ঘর হইতে বাহিরে আসে না। সকলে ধারণা করিল, বিপ্লবী দল জেলের মধ্যে কোন হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে। অপর কোন বিপ্লবীর ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে বা পরে কোথাও জেলখানার চতুর্দিকে কারফিউ জারী করিতে দেখা যায় নাই।

কিছুক্ষণ বাহির হইতে আর কোন শব্দ শোনা গেল না। বাহিরের লোকজনেরা ভাবিল, গোলমাল থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সময় যে সূর্য সেন বন্দীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাহা তাহাদের মনে আদৌ স্থান পায় নাই। বক্তৃতাশেষে সূর্য সেনের সঙ্গে আবার সকলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠে। বন্দীরা যখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতেছিল, সে সময় সৈন্যরা প্রত্যেকটি কামরায় প্রবেশপূর্বক তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে মারপিট করে। কিন্তু অত্যাচার যতই বাড়িতে থাকে, বন্দীরা ততই উচ্চস্বরে শ্লোগান দিতে থাকায় অগত্যা সৈন্যরা নিরস্ত হয়। মারপিট হইতে নিরস্ত হইলেও তাহারা আর একটি অন্যায় কার্যে জেল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিল। প্রত্যুষে ফাঁসির সময় আবার সকলে গোলমাল করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া সশস্ত্র সৈন্যরা প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমে সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে যাহাতে তাঁহারা কোন শ্লোগান দিতে বা বক্তৃতা দিতে না পারেন।

সূর্য সেন পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, খাঁটি বিপ্লবীর ন্যায় তিনি সংগ্রামরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিবেন। প্রহরীরা তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাহাদের মুখে ও নাকে প্রচণ্ড ঘুষি মারিয়া তিনি একজনকে ধরাশায়ীও করিয়া দিলেন। তারকেশ্বরও তাঁহার অনুকরণে প্রহরীদের কিল-ঘুষি মারিতে লাগিলেন। অন্যান্য প্রহরীরা আসিয়া তখন তাঁহাদের উভয়কে ভীষণভাবে প্রহার করিতে করিতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ফাঁসিমঞ্চের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রহারের চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পূর্বে সূর্য সেন আর একবার উচ্চস্বরে 'বন্দে মাতারম' ধ্বনি করেন। সঙ্গে সঙ্গে

অন্যান্য বন্দীরাও তাহাদের কামরা হইতে ইহার উত্তর দেয়। শেষবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়াই সূর্য সেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে ফাঁসিমঞ্চে চড়ান হয়। উভয়কে একই সময়ে দুইটি পাশাপাশি ফাঁসিমঞ্চে তোলা হইয়াছিল। ইহাদের দুইজনের প্রাণ রক্ষার জন্য ইতিপূর্বে এবং শেষ দিন পর্যন্ত শত শত সভাসমিতি এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ফাঁসির আদেশই বহাল থাকে। ফাঁসির পর ১৬ই জানুয়ারী বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক উপবাস করিয়া এই বীরদ্বয়ের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল।

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা যুব-বিপ্লবীদের সাহস ও সংগঠনশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। ইতিপূর্বে বা পরে ভারতের কোথাও এত অল্প বয়সের এত অধিক সংখ্যক বিপ্লবী এতটা মনোবলের পরিচয় দিতে পারে নাই। পরবর্তীকালের আগস্ট বিপ্লবের ন্যায় চট্টগ্রামের ঘটনা ততটা ব্যাপক না হইলেও, ইহার জের চলিয়াছিল তিন বৎসরেরও ঊর্ধ্বকাল।

কংগ্রেসের 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া আগস্ট-বিপ্লব সংঘটিত হয়। কংগ্রেস-নেতৃবর্গের গ্রেফ্তার সেই সময় সর্বশ্রেণীর লোকজনের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল। ইহার ফলে আগস্ট-বিপ্লব একটি সার্বজনীন আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু চট্টগ্রামের ঘটনাবলীর নায়ক ছিলেন শুধু তাঁহারাই যাঁহারা ছিলেন বিপ্লববাদে আস্থাবান। জনসাধারণের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল না। কত কম বয়সের বিপ্লবী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এই একটি মাত্র উদাহরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে যে, বিচারের পরও অল্প বয়স্ক বিবেচিত হওয়ায় জনৈক বিপ্লবীকে বোরস্টাল স্কুলে পাঠাইতে হইয়াছিল।

আগস্টবিপ্লবের সময় মেদিনীপুর এবং অন্যান্য স্থানে পুলিশ ও সৈন্যরা জনসাধারণের উপর বর্ণনাতীত অত্যাচার করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অপরপক্ষে চট্টগ্রামে দীর্ঘ তিন বৎসর পুলিশ এবং সৈন্যদের জুলুম অব্যাহত থাকে। ফেরার আসামী ধরি-

বার নামে তাহারা কত যে নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়ী তল্লাশী করিয়াছে, সামান্ত সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কতজনের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছে, সর্বোপরি কত কুলবধূর সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কিত অভিযোগে ধৃত কোন কোন বিপ্লবীর স্বীকারোক্তি এবং বিচারের সময় উপস্থাপিত অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে প্রকাশ পায় যে, একই দিন ও একই সময় চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং ময়মনসিংহের অস্ত্রাগার আক্রমণের একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল ১৯২৯ সালের শেষের দিকে কলিকাতায়। ইহার পর সুযোগ অনুসারে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কার্যসূচী সম্পর্কেও তখন বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল। এই পরিকল্পনা রচয়িতাগণের মধ্যে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ দাস, নিরঞ্জন সেন, প্রভাত চক্রবর্তী, সতীশ পাকড়াশী, বিনয় রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা ছিলেন বাঙ্গালী বিপ্লববাদীদের রিভোল্ট গ্রুপের নেতা। এই রিভোল্ট গ্রুপটি গঠিত হইয়াছিল যুগান্তর এবং অনুশীলন দলের এমন সব বিপ্লবীকে লইয়া যাঁহারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। পরিকল্পনা রচনার পূর্বে প্রাথমিক আলোচনার জন্য ইহারা সহ আরও বহু বিপ্লবী ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে রংপুরে একত্রিত হইয়াছিলেন।

কারামুক্তি

চট্টগ্রামের এই বীর সন্তানদের সম্পর্কে বাহিরের অনেকে এই সকল ঘটনার পূর্বে বিশেষ কোন খোঁজ-খবরই রাখিত না। বিচারের সময় ইহাদের দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে পর, সমগ্র দেশ তাই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মুক্তির জন্য কার্যতঃ তখন হইতে আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু নীতিগত কারণে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে এ ব্যাপারে কংগ্রেস মহলের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিতে পারে না। ১৯৪৬ সালে অর্থাৎ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ১৬ বৎসর পর জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার

প্রধান মন্ত্রী হন। বিদেশীয় শাসকশ্রেণীর তীব্র বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ইহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার এই কার্যের জন্য সেদিন তিনি সমগ্র দেশের অযাচিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

দেশবিভাগের পর ইহাদের অনেকেই পূর্ব বাংলা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মুক্তি লাভের কয়েক মাস পর ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে সন্দীপে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে দৃঢ় আস্থাবান বিপ্লবী লালমোহন সেন কতিপয় দুষ্কৃতিপরায়ণ ও অবিবেচক মুসলমানের হাতে নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া প্রকাশ। লালমোহন সেন সন্দীপের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান ছিলেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অভিযোগে ধৃত, বিচারের পূর্বে পুলিশী অত্যাচারে জর্জরিত এবং বিচারে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত, চট্টগ্রামের এই বীর সন্তানদের স্মৃতিরক্ষার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে পুনঃপুনঃ দাবী উত্থাপিত হইতে থাকিলে, অবশেষে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে জালালাবাদ পাহাড়ের যে স্থানে ইঁহারা আত্মাহুতি দান করেন, সেস্থানেই একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কথা বলা হয়। কিন্তু তৎপূর্বেই পাহাড়টি সামরিক বিভাগের এলাকাভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পরে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত লাল দীঘিরপাড় মনোনীত হয়। এক্ষেত্রেও কার্যতঃ কোন অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পূর্বেই দেশে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা লোপ পায়। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারমূলক শাসন-আমলে এই ব্যাপারটি এমনভাবে চাপা পড়িয়া যায় যে, প্রস্তাবিত স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের কথা আজ কেহ স্মরণ পর্যন্ত করেন না। অথচ ভারতবর্ষের দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি-সংগ্রামে চট্টগ্রামের এমন বীর যুবকদের চেয়ে অধিক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল।

স্মৃতিসৌধ দূরে থাক্, পূর্ব বাংলার এই বীর সন্তানদের নামে কোন শহরে এবং বন্দরে একটি সড়কেরও নামকরণ করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ জাতীয় জীবন ও মর্যাদার পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি কলঙ্কজনক ব্যাপার। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাহস ও শৌর্যবীর্যের জন্য বৃটিশ সরকার উনবিংশ শতাব্দীতে ভিক্টোরিয়া ক্রস এবং

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় জর্জ ক্রস মেডেলের প্রবর্তন করেন। সেনাবাহিনীর লোকজনের জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্মরণীয় যে, যাহাদের জন্য ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহারা নিয়মিত বেতন ছাড়াও জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর আরও নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশোদ্ধারের জন্য চট্টগ্রামে যাঁহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বেতনভুক ছিলেন না। তাঁহাদের পুরস্কার ছিল গুলী অথবা ফাঁসি। উল্লেখ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের গোড়ার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নাম সূর্য সেন হল রাখা হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের ন্যায় মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলগুলিও মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন অমান্যের সময় সাহস ও বিশেষ তৎপরতার পরিচয় প্রদান করে। ১৯৩০ সালের জুন মাসে দাসপুর থানার দারোগা ভোলানাথ দাস বিলাতী পণ্য বর্জন আন্দোলন দমনকল্পে কংগ্রেসের কয়েকজন স্বেচ্ছা-সেবককে গ্রেফতার করিয়া থানার পথে মারধর করে। ক্রোধান্ধ জনতা ইহার উত্তরে তাহাকে এবং তাহার জনৈক সহকারী পুলিশকে হত্যা করে।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য কয়েক দিন পর মহকুমা হাকিম কংসাবতী নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া স্থানীয় কিছু সংখ্যক লোক পুলিশের জোর-জুলুমের প্রতিবাদে তাঁহাকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মহকুমা হাকিম ইহাতে কুপিত হইয়া তাঁহার সঙ্গের সশস্ত্র পুলিশ দলটিকে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী বর্ষণের আদেশ দান করেন। আদেশ পাইয়া পুলিশ দল চৌদ্দ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে। অতঃপর পুলিশ বহু ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া নির্বিচারে লোকজনকে গ্রেফতারপূর্বক বিচারার্থ চালান দেয়। ইহার পরও গ্রামবাসীদের উপর পুলিশের অত্যাচার চলিতে থাকে। ধৃত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য ২৪ পরগণা জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ লেথব্রিজকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। বিচারে আসামীদের বারজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাহা ছাড়া আরও বেশ কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

মিঃ জেম্‌স পেডি, আই. সি. এস. ছিলেন তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। জনসাধারণের নিকট তিনি দয়ালু পেডি নামেই খ্যাত ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। তিনি দুর্বলচেতা ছিলেন বলিয়া পুলিশ তাঁহার সময় জনসাধারণ এবং জেলে আটক বিপ্লবীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাইতেছিল। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে জনৈক বিপ্লবী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। মিঃ পেডি তখন মেদিনীপুর শিল্প প্রদর্শনী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। গুলী বর্ষণের অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নিছক সন্দেহবশতঃ পুলিশ বিমল দাসগুপ্ত নামক জনৈক বিপ্লবীকে গ্রেফ্‌তার করে। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে বিমল দাসগুপ্ত খালাস পান।

মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত হিজলী বন্দীনিবাসে প্রহরীরা অতি সামান্য কারণে গুলী চালাইয়া একবার দুইজন আটক বন্দীকে হত্যা এবং প্রায় একশত জনকে আহত করে। এই ঘটনায় বিপ্লবী মাত্রই ব্যথিত হইয়া পড়ে। জেলা কর্তৃপক্ষ প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ হন। তাই তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, মেদিনীপুর হইতে কোন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটকেই তাহারা অক্ষত দেহে ফিরিয়া যাইতে দিবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু পাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাসের হত্যার ভার গ্রহণ করেন। মিঃ জেম্‌স পেডির হত্যার পর মিঃ ডগ্‌লাস মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'মাতাল ডগ্‌লাস' বলিত। পর বৎসর এপ্রিল মাসে মিঃ ডগ্‌লাস যখন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে সভার কার্য পরিচালনায় রত ছিলেন, সে সময় প্রদ্যোৎ কুমার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণের জন্য রিভলভারের ট্রিগার টানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহার মুখ দিয়া একটি গুলীও নির্গত হইল না।

ইহা দেখিয়া প্রভাংশু পাল তাড়াতাড়ি তাঁহার রিভলভার হইতে গুলী বর্ষণপূর্বক ত্রস্তপদে উভয়ে সেস্থান ত্যাগ করেন। কয়েকজন লোক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। প্রভাংশুকে বাঁচাইবার জন্য প্রদ্যোৎ তাঁহার বিকল রিভলভারটি দেখাইয়া অনুসরণকারীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে

থাকেন। ইত্যবসরে প্রভাংশু নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রদ্যোৎ কুমার স্বয়ং ধরা পড়িয়া যান। ট্রাইব্যুনালের বিচারে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীলের বিচার করিলেন বিচারপতি জ্যাক এবং বিচারপতি ঘোষ। সেখানেও মৃত্যুদণ্ডই বহাল থাকে। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী তাঁহার ফাঁসি হয়। সহকর্মীর প্রাণরক্ষার জন্য প্রদ্যোৎ কুমারের আত্মত্যাগ সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

নবজীবনের মৃত্যু

মিঃ ডগ্‌লাসের পর মিঃ বার্জ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি বিরাট ঝুঁকি লইয়া মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। কারণ, মিঃ ডগ্‌লাসের হত্যার পর ইহা জানাজানি হইয়া পড়িয়াছিল যে বিপ্লবীরা কোন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটকেই মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া যাইতে দিবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। মিঃ বার্জ মোটামুটিভাবে ভাল লোক ছিলেন। তিনি সকলের সাথে মেলামেশা করিতেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে 'প্রিয় বার্জ' বলিত। ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁহার সুনাম ছিল এবং টাউন ক্লাবের পক্ষ হইয়া তিনি কয়েকবার খেলায়ও নামিয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর টাউন ক্লাবের সহিত মোহামেডান ক্লাবের খেলার দিন তিনি যখন মোটর হইতে অবতরণপূর্বক মাঠের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় কয়েকজন বিপ্লবী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করে। মিঃ বার্জ ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। মিঃ বার্জের সঙ্গে যে চারিজন সশস্ত্র পুলিশ ছিল, তাহাদের গুলীতে অনাথবন্ধু পাঞ্জা এবং মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত নামক দুইজন আততায়ী কিছুক্ষণের ব্যবধানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঘটনাস্থলে পুলিশের লোকজনেরা সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আরও কতিপয় যুবককে গ্রেফ্‌তার করে। তন্মধ্যে নবজীবন নামক একটি বালককে জেলের মধ্যে পুলিশ এমন মারধর করে যে, সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

মিঃ বার্জের হত্যার পর পুলিশ কয়েকদিন মেদিনীপুরে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করিয়া রাখিয়াছিল। হত্যার ব্যাপারে অংশ গ্রহণকারী

অবশিষ্ট বিপ্লবীগণকে কেহ চিনিয়া থাকিলেও ভয়ে তাহা কেহ কোন দিন প্রকাশ করে নাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও পুলিশ তাঁহাদের নাম জানিতে পারে নাই। তবু ইতিমধ্যে সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া যেই কয়েক শত লোককে পুলিশ আটক ও ভীষণ মারপিট করে, পরে তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া তাহারা বিচারার্থ চালান দেয়। অভিযুক্ত যুবকগণের পক্ষ সমর্থনের জন্ত শ্রী বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, শ্রী নিশীথ সেন, শ্রী জে. সি. গুপ্ত, শ্রী সন্তোষ বসু প্রমুখ খ্যাতনামা আইনজীবিগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ট্রাইব্যুনালে বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কেহ কেহ রাজসাক্ষী হয়। বলা বাহুল্য, বিপ্লববাদ আন্দোলনের সহিত এ সকল রাজসাক্ষীর কোন সংশ্রবই ছিল না। সরকারের বিঘোষিত পুরস্কারের লোভে ইহারা ভূয়া রাজসাক্ষী হইয়া পুলিশের শেখানো বুলিই আওড়াইয়াছিল। ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাধারণ সাক্ষী হিসাবে সরকার যাহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের উক্তির মধ্যেও কোন সঙ্গতি ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও বিচারকগণ রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং নির্মল ঘোষের মৃত্যুদণ্ড এবং পাঁচজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন।

পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যার পর ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের ভাষায় ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার "ইস্পাত কাঠামো" স্বরূপ আই. সি. এস. বিশেষ করিয়া শ্বেতাঙ্গগণের কেহ মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণের জন্য সহজে সম্মত হইতেন না। ইহার পর যাঁহারা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া মেদিনীপুর গিয়াছিলেন তাঁহারা সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতেন। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হইয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভাগ্যে সুনিদ্রা জুটে নাই। মেদিনীপুর জেলার জন্ত যখন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া রীতিমত দুষ্কর হইয়া উঠে, তখন পদোন্নতির লোভ দেখাইয়া ভারতীয় সিভিলিয়নগণকে তথায় পাঠান হইতে থাকে। দেশবিভক্তির সময় পর্যন্ত সাধারণতঃ এই ব্যবস্থাই চালু ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পটভূমি

পুনরায় সন্ত্রাসবাদ এবং পার্লামেণ্টারী ফ্রণ্টে প্রবেশের পূর্বে মোটামুটি-ভাবে মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। উপরে বলা হইয়াছে, মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা জাফর আলি খান, স্যার ওয়াজির হাসান, জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ প্রমুখ প্রগতিবাদী ব্যক্তিগণের যোগদানের ফলে মুসলিম লীগ কতকটা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও আকার লাভ করে। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ ও ইহার প্রভাব অনুভূত হওয়ার পূর্বেই প্রথম মহাসমরের প্রারম্ভে অগ্নিপুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আলি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ অন্তরীণাবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর সমান শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এবং আরও যেই কয়েকজন মুসলিম নেতা কারাগারের বাহিরে রহিলেন, মুসলিম লীগ পরিচালনার দায়িত্ব এ সময় স্বভাবতঃই তাঁহাদের উপর বর্তায়। তাঁহারা এই দায়িত্ব পালনের জন্য সাগ্রহে আগাইয়া যান।

বৃটিশ সরকারের তখন ঘোর দুর্দিন। যুদ্ধে তাঁহারা জার্মানদের সঙ্গে কোথাও আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া ধন ও জন দ্বারা সাহায্যের জন্য ভারতবাসীর নিকট পুনঃপুনঃ আবেদন জানাইয়া আসিতে-ছিলেন। এই সুযোগে মহাসমর অবসানে ভারতবাসীর জন্য অধিক ক্ষমতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি আদায়ের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ন্যায় মুসলিম লীগও সচেষ্ট হইয়া উঠে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে, সেই সময় যে কোন মুসলমান উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে এবং থাকিতে পারিতেন। জনাব জিন্নাহ্ সহ নেতৃস্থানীয় আরও বহু মুসলমান উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যই শুধু ছিলেন না, উভয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাবও বিস্তার

করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানে একই সময় এই সত্যটি উপলব্ধি হইতে থাকে যে, ভারতবাসীদের দাবী-দাওয়া মিটাইবার প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির পূর্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধগুলিরও মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত।

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠানের কতিপয় বিশিষ্ট নেতার মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হইয়া যায়। আলোচনার শেষ পর্যায়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বারজন সদস্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী দলের নেতা শ্রী অম্বিকা মজুমদার এবং মুসলিম লীগের উদারপন্থী দলের নেতা জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্, ইঁহাদের পুরোভাগে ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন আহুত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথারীতি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আলোচনাকারিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ইহাই ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার স্বীকৃতি লাভ করিল বটে, কিন্তু আসন বণ্টন ব্যবস্থায় কোন রদবদল সাধিত না হওয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের আইন সভায়ও সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা সংখ্যালঘুই থাকিয়া যায়।

এই সময় হইতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একযোগে কাজ করে। এমন কি উভয়ের বার্ষিক অধিবেশন একই শহরে এবং ক্ষেত্রবিশেষে একই সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহাও ঠিক যে, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের চাপে ১৯২১ সালের একেবারে শেষের দিকে মুসলিম লীগ উহার অস্তিত্ব সাময়িকভাবে হারাইয়া ফেলিলে খিলাফত কমিটি সেই সময়

উহার নিজের বিশেষ দায়িত্ব ছাড়া, লীগের দায়িত্বও পালন করিয়াছিল। ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের সর্বশেষ সুলতানকে নির্বাসনে প্রেরণ করিয়া খলিফার পদটিও উঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়। এইরূপে খিলাফত কমিটির অপমৃত্যু ঘটায় ভারতবর্ষের মুসলিম রাজনীতিতে আবার শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সময় হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির যথা হিন্দু মহাসভা, আর্য সভা, লোকমান্য তিলক কর্তৃক ইহার এক যুগেরও ঊর্ধ্বকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত, গো-রক্ষা সমিতি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি এবং ডঃ মুঞ্জের হিন্দু সংগঠন সংস্থার উত্তেজনামূলক তৎপরতার দরুন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হইতে না থাকিলে, ১৯২৬ সালে মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন লাভ হইত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু পুনরুজ্জীবন লাভের পরও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গের মধ্যে দলীয় কোন্দলের ফলে মুসলিম লীগ ১৯৩৬ সালের পূর্বে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। জিন্নাহ্ লীগ ও শফি লীগ এই দুই অপ্রীতিকর নামে বিভক্ত হইয়া মুসলিম লীগ জাতির প্রতি উহার মহান দায়িত্ব পালন অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের এবং দলীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ সাধনে ব্যস্ত থাকে। এদিকে বাংলা, সীমান্ত, আসাম ও মাদ্রাজ ব্যতীত বৃটিশ-শাসিত অন্যান্য প্রদেশে দাঙ্গাকারী হিন্দুদের হাতে শত শত মুসলমান তাহাদের জানমাল খোয়াইতে থাকে। অবশেষে সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ মহানগরী কলিকাতাকেও স্পর্শ করে।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম মুসলমান ডেপুটি মেয়র থাকাকালে কলিকাতার অভিজাত শ্রেণীর সর্বপ্রধান বিপণি-কেন্দ্র, নিউ মার্কেটের বহির্ভাগে রাস্তার উপর এক যুগের ঊর্ধ্বকাল তাঁহার অবস্থানস্থলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান এক কথায় সকল সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণের সমান শ্রদ্ধার পাত্র, জনৈক নির্বাক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। স্থানীয় মুসলমানদের পীড়াপীড়িতে এবং সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য ডেপুটি মেয়র হিসাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী উক্ত স্থানেই তাঁহার দাফনের অনুমতি প্রদান করেন। ইহা লইয়া হিন্দুরা

তুমুল আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। অথচ তাহাদেরই একটা অংশ উক্ত ব্যাক্তিক মাদ্রাজী হিন্দু সন্ন্যাসী আখ্যা দিয়া দাহের জন্য তাঁহার শবদেহ প্রাপ্তির দাবী জানাইয়াছিল। আন্দোলন প্রশমণের জন্য অতঃপর করপোরেশন কর্তৃপক্ষ কবরটিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া দেন, কেহ বলিয়া না দিলে বাহিরের কাহারও পক্ষে ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না যে, সেস্থানে কোন কবর আছে। কিন্তু ইহাতেও হিন্দুরা সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াই চলিতে থাকে। এই উত্তেজনা ১৯২৬ সালে কলিকাতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ভয়াবহ দাঙ্গা হাঙ্গামা রূপে প্রকাশ পায়। সাম্প্রদায়িক কলহ-বিবাদ হইতে এতকাল অনেকটা মুক্ত, বাংলা প্রদেশও তখন হইতে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুদের কবলিত হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য আর ফিরিয়া আসে নাই।

হসরত মোহানীর প্রস্তাব

উভয় সম্প্রদায়ের বহু নেতার আবেদন সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হ্রাসের পরিবর্তে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং অধিকতর ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া ১৯২৭ সালে কানপুরের মওলানা হসরত মোহানী ভারতবর্ষের মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের স্বাতন্ত্রের দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব সংবাদপত্রে বিবৃতি আকারে প্রকাশ করেন। ইহাই পাকিস্তানের প্রথম রূপরেখা। মওলানা হসরত মোহানীর এই প্রস্তাবের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন এমন এক ব্যক্তি যাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু একটা হয়ত মওলানা স্বয়ং পূর্বে কখনও আশা করিতে পারেন নাই এবং যিনি প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র এলাকারই অধিবাসী হইতেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি লালা লজপৎ রায় তাঁহার সাপ্তাহিক "পিপল্স" পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মওলানার প্রস্তাবের প্রতি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। মওলানা ছিলেন লীগপন্থী জাতীয়তাবাদী মুসলমান। পক্ষান্তরে লালা লজপৎ রায় ছিলেন হিন্দু মহাসভার সমর্থক, বিপ্লবপন্থী এবং সর্বশেষে কংগ্রেসী। এতদসত্ত্বেও ইহা লইয়া কোন মহল হইতে তখন কোন বাদ-প্রতিবাদ হয় নাই। মওলানা হসরত মোহানীও অতঃপর চুপ হইয়া যান।

এদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আলি, শ্রী রাজা গোপালাচারিয়া, জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌, মিসেস সরোজিনী নাইডু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডঃ আনসারী, হেকিম আজমল খান এবং আরও অনেকে তখনও নানাভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দাঙ্গা প্রতিরোধের কোন সহজ উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অবশেষে ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে সর্বদল সম্মেলন আহূত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেসেরই উদ্যোগে ইহা আহূত ও অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া কংগ্রেসের বিদায়ী প্রেসিডেণ্ট ডঃ আনসারী ইহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের আইন পরিষদগুলিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য আসন সংখ্যা হইতে কিছু সংখ্যক আসন অমুসলমানদের জন্য ছাড়িয়া দিতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দু এবং শিখ নেতৃবর্গের বেশীর ভাগ উহার অসম বিনিময়ে মুসলমানদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা কেন্দ্রীয় আইন সভায় মাত্র শতকরা তিনটি অতিরিক্ত আসন ছাড়িয়া দিতে দৃঢ়তার সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে থাকায়, সর্বদল সম্মেলন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকেই ভাঙ্গিয়া যায়। মুসলমানদের পক্ষ হইতে বৃহত্তর উদারতার বিনিময়ে এই সামান্য উদারতা প্রদর্শনের জন্য হিন্দু এবং শিখদের নিকট জনাব জিন্নাহ্‌র ব্যর্থ করুণ আবেদন সর্বদল সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইয়া রহিয়াছে। সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকাও সকলের প্রশংসা অর্জন করে। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদিগকে শতকরা মাত্র তিনটি আসন ছাড়িয়া দিলেও তথায় অমুসলমান সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াইত শতকরা ৭০ জন। এই অনুদারতাই দেশবিভক্তির একটি প্রধান কারণ।

চৌদ্দ দফা

১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ কংগ্রেসের সহিত দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করিয়া থাকিলেও, সর্বদল সম্মেলন অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইহার

তেমন কোন বিরোধিতা করেন নাই এবং সেই সুযোগও তিনি পান নাই। এক্ষণে হিন্দু ও শিখদের মনোভাবে বিশেষভাবে মর্মাহত হইয়া তিনি সর্বদল সম্মেলনের পর পরই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রচিত চৌদ্দ দফা দাবী উত্থাপন করিলেন। এই দফাগুলির মধ্যে সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে পৃথকীকরণ, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের শাসনসংস্কার প্রবর্তন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির আইন সভার আসনগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টন, দেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিনিধি নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার প্রবর্তন ইত্যাদি প্রধান। এই চৌদ্দ দফা জনাব জিন্নাহর নিজস্ব কোন ফর্মুলা না হওয়া সত্ত্বেও ইহা তাঁহাকে হিন্দুদের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় করিয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় হইতে জনাব জিন্নাহ মৌন বিরোধিতার পরিবর্তে কংগ্রেসের সরব বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন। পরবর্তীকালে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে চৌদ্দ দফার অধিকাংশ দফা স্বীকৃতি লাভ করে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই চৌদ্দ দফার বাহিরে একই সময় হিন্দু-প্রধান উড়িষ্যা এবং আসাম পূর্ণাঙ্গ প্রদেশের মর্যাদা লাভ করিয়া গভর্ণর শাসিত প্রদেশে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেহ যোগদান না করায় উহা কার্যতঃ একটি প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা একটি ব্যয়বহুল ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয় উপলব্ধি করিয়া, তাই ইত্যবসরে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্য একটি সূত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, লবণ-আইন অমান্যকারীদিগকে সরকার ইতিমধ্যে কঠোর হস্তে দমন করিলেও আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতায় তাঁহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভূপালের নওয়াব হামিদুল্লাহ

খান, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং শ্রী জয়াকর মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপোষের একটি ক্ষেত্র তৈরী করেন। তদনুসারে বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর প্রথমে পত্রালাপ এবং পরে সরাসরি আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শক্রমে কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত হয়। প্রসঙ্গের পূর্ণাঙ্গতার জন্য বলা প্রয়োজন যে, গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে এযাবৎ ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত বার্মা আলাদা হইয়া পড়ে।

১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য পাটনার স্যার আলি ইমাম মনোনীত হন। কিন্তু বৈঠকে যোগদান করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা হস্তান্তরে একান্ত অনিচ্ছুক এবং তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের ন্যায় তফশিলী সম্প্রদায়কেও একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে গণনা করিতে বদ্ধপরিকর। অথচ অস্পৃশ্য হইলেও কংগ্রেস তফশিলী সম্প্রদায়কে হিন্দুদেরই একটি অঙ্গ হিসাবে গণনা করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় বৈঠক উপলক্ষে ইংলণ্ডে সময় কাটান অর্থহীন মনে করিয়া কিছুদিন পর তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী ভারত পৌঁছেন। তৎপূর্বেই সরকার আবার প্রচণ্ডভাবে দমননীতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। গান্ধী ও বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান সম্পর্কে ইতিপূর্বে যেই চুক্তি হইয়াছিল, গোলটেবিল বৈঠক হইতে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি প্রত্যাহৃত হওয়ায় সরকার উহার শর্তাবলী লঙ্ঘনপূর্বক এ সময় আবার ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় শুরু করিয়া দেন। অল্পদিনের মধ্যেই মহাত্মাজী সহ বহু কংগ্রেস নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর ইংলণ্ড ত্যাগের পর আরও প্রায় দুইমাস লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন চলে। এই অধিবেশনে অনেকগুলি সাব-কমিটি গঠিত হয়। এ সকল সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য পরবর্তী বৎসরের আগস্ট মাসে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন

আহুত হয়। বিভিন্ন আইন সভায় মুসলমানদের আসন সংখ্যা এবং নির্বাচন প্রথার প্রশ্নে হিন্দু নেতৃবর্গ ১৯০৮ সালে কলিকাতা সর্বদল সম্মেলনে যেরূপ আপোষহীন অনুদার ও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও আগাগোড়া তাহারই পুনরাভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আগা খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুসলমান নেতৃবৃন্দ এমন যোগ্যতার সহিত বৈঠকে তাঁহাদের দাবী-দাওয়াগুলি পেশ করিতে পারিতেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত উহাদের অধিকাংশ বৃটিশ সরকারের মৌন স্বীকৃতি লাভ করে। এ সম্পর্কে আগা খান, জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, স্যার মোহাম্মদ শফি, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, স্যার আকবর হায়দরী, স্যার ইসমাইল প্রমুখ ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুক্তিতর্কে মুসলমানদের নিকট হার মানিয়া পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, ডঃ মুঞ্জে, শ্রী জয়াকর প্রমুখ নেতার পরামর্শে বৈঠকে যোগদানকারী অন্যান্য হিন্দু প্রতিনিধিরা উপরোক্ত প্রশ্ন দুইটির চূড়ান্ত মীমাংসার ভার অর্পণ করেন ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের উপর।

মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের উপর হিন্দু নেতৃবর্গের গভীর আস্থা ছিল। অতীতে তিনি বহুবার প্রকাশ্যে হিন্দুপ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁহার এই মনোভাবের জন্য মুসলমান নেতৃবর্গ প্রথমে তাঁহাকে একক সালিশ হিসাবে মানিয়া লইবেন না, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে একটা যুক্তিও ছিল। হিন্দু নেতৃবর্গ শুধু যে তাঁহাকে সালিশ মানিয়াছিলেন এমন নয়, তাঁহার রোয়েদাদও যে তাঁহারা নতশিরে মানিয়া লইবেন এই প্রতিশ্রুতিও গোপনে দিয়া রাখিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সালিশ মানিয়া লইবেন কিনা সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য মুসলমান নেতৃবর্গ যখন একটা ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন, তখন দেখা যায়, আগা খান এবং চারিজন সদস্য ব্যতীত উপস্থিত বেশীর ভাগ সদস্যই উহার বিরোধী। কিন্তু আগা খান যখন মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে সালিশ না মানার অসুবিধার কথা বুঝাইয়া দেন, তখন সংশয় ও দ্বিধার সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সকলে সম্মতি দান করেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এইরূপে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড একমাত্র সালিস নিযুক্ত হইয়া কয়েকদিন পর তাঁহার রোয়েদাদ জানাইয়া দেন। ইহাই

সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বাঁটোয়ারায় বিভিন্ন আইন সভায় মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য আসনসংখ্যা সামান্য রদবদল সহ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারে মুসলমানদের জন্য যেই পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করা হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি এবং মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারেও যাহা স্বীকৃতি লাভ করে, মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডও তাঁহার রোয়েদাদে তাহা স্বীকার করিয়া লন। এবার শুধু আসন সংখ্যায় কিছু রদবদল করিয়া উহাকে উভয়ের গ্রহণযোগ্য করিবার চেষ্টা করা হয়।

মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নিকট হইতে হিন্দু নেতৃবর্গ এরূপ সিদ্ধান্ত একেবারেই আশা করিতে পারেন নাই। তবু স্বেচ্ছায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে বৈঠকে যোগদানকারী হিন্দু নেতৃবর্গ মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বিষের বাটি মুখে তুলিয়া লইতে ন্যায়তঃ বাধ্য হন। ইহার পর তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবেও তাঁহারা সম্মতি দান করেন। মহাত্মা গান্ধী এই সময় যারবেদা জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। আজীবন এই মনীষী তফশিলী সম্প্রদায়কে হিন্দুদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া দাবী এবং প্রচার করিয়াছেন। অ-কংগ্রেসী হিন্দুদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং তফশিলীদের নির্বুদ্ধিতা সর্বোপরি, মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ তাঁহার সেই সাধনাকে রাতারাতি ধূলিস্মাৎ করিয়া দিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বর্ণহিন্দু ও তফশিলীদের পৃথক পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করিয়া তিনি উহার প্রতিবাদে যারবেদা জেলেই আমরণ অনশন আরম্ভের কথা ঘোষণা করিয়া দেন।

পুনা চুক্তি

এ সংবাদে স্বভাবতঃই সমগ্র ভারতবর্ষে ভীষণ উত্তেজনা, আলোড়ন, উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধীকে অনশনব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য হিন্দু নেতৃবর্গ একের পর এক পুনা অভিমুখে ধাবিত হন। এদিকে তফশিলীদের উপর বর্ণহিন্দুরা নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে। বৃটিশ সরকার পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিলেন, বর্ণহিন্দু এবং

তফশিলীদের সম্মতি ব্যতিরেকে বাঁটোয়ারার সংশ্লিষ্ট অংশের কোন রদবদল সাধিত হইবে না। বর্ণহিন্দুদের অ-কংগ্রেসী নেতৃবর্গ তো অনিচ্ছা সত্ত্বেই ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেসী মাত্রই ইহার বিরোধী ছিলেন। কাজেই বাঁটোয়ারায় রদবদল নির্ভর করিতেছিল একক ভাবে তফশিলীদের সম্মতির উপর। অনশনের গোড়ার দিকে তফশিলী সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা ডঃ আম্বেদকর বেশ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণহিন্দুদের চাপে শেষ পর্যন্ত তিনিও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের এক সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয়, বিভিন্ন আইন সভায় তফশিলীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে বটে, তবে মিশ্র নির্বাচন-প্রথার সাহায্যে তাহাদিগকে নির্বাচিত হইতে হইবে। এই চুক্তিটি ইতিহাসে পুনা চুক্তি নামে খ্যাত।

লক্ষ্মৌ চুক্তি যেমন কার্যতঃ না হোক, আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমানকে রাজনীতিক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল, তেমনি পুনা চুক্তিও বর্ণহিন্দু এবং তফশিলীদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাহ্যতঃ একই রজ্জুবদ্ধ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে লক্ষ্মৌ চুক্তিরই ন্যায় পুনা চুক্তিও অভীপ্সিত ফলদানে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায়, ডঃ আম্বেদকর ইহা বাতিলের জন্য তুমুল আন্দোলন এমনকি একবার ইসলাম, আর একবার সদলবলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের হুমকি পর্যন্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় নেহেরু মন্ত্রিসভায় আইন সচিবের পদ গ্রহণপূর্বক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। ভারত ইউনিয়নের সংবিধান তাঁহারই মন্ত্রিত্বের আমলে রচিত ও গৃহীত হয়। তবে ইহাতে তাঁহার অবদান খুবই অকিঞ্চিৎকর।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকারের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস মহলে সেই সময় তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলন দেশে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সহায়ক হইবে আশঙ্কা করিয়া মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁহারই পরামর্শে কংগ্রেস এ ক্ষেত্রে না-গ্রহণ, না-বর্জন নীতি গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে একটি রক্তস্নান হইতে দূরে রাখেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও পুনা চুক্তিকে ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে

আইন পরিষদগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা সুনির্দিষ্ট, সংরক্ষিত এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা সন্নিবেশিত হয়।

ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে যে সময় এরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হইতেছিল এবং যে সময় একান্ত স্বাভাবিকভাবে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফলের উপর, সে সময় বিপ্লবীরা নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। তাহারা বৃটিশ সরকার প্রস্তাবিত ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে মোটেই রাজী ছিল না। কারণ, তাহাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল অগৌণ এবং শর্তহীন পূর্ণ স্বাধীনতা।

এজন্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং পর পর মেদিনীপুরের তিনজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা ছাড়াও, তাহারা ১৯৩০ সালের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি হত্যা এবং হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ইহাদের কোন কোনটিতে চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের বিপ্লবীদল সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে একশতেরও কম বিপ্লবী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সৈন্য ও পুলিশের সহিত সংঘর্ষে নিহত, বেশীর ভাগ ধৃত এবং সামান্য সংখ্যক আত্মগোপন করিয়াছিল। আত্মগোপনকারীরা কিছু না কিছু একটা করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিত। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইহারা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল পাছে পুলিশ তাহাদেরও নাম জানিয়া লইয়া তাহাদিগকে গ্রেফতার করে। ইহারাই পরবর্তী কালে চট্টগ্রামের বাহিরে কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করে।

গোপীনাথ সাহার মৃত্যুদণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে দীনেশ মজুমদার, অনুজ সেনগুপ্ত এবং অপর একজন বিপ্লবী ডালহৌসী স্কোয়ারে দ্বিপ্রহরের সময় বিপ্লবীদের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। কিন্তু পলায়নের সময় দীনেশ মজুমদার ধরা পড়িয়া গেলেন এবং অনুজ সেনগুপ্ত আত্মহত্যা করিয়া পুলিশ-জুলুম হইতে রক্ষা পাইলেন। তৃতীয় যুবকটি কে তাহা তখন আর জানা যায় নাই। বিচারে দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

ডালহৌসি স্কোয়ারের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুলিশ ডঃ নারায়ণ রায়, ভূপাল বসু, সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, যতীশ চন্দ্র ভৌমিক, অম্বিকা রায় এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয়। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে ইঁহাদের অনেকেই দীর্ঘ কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হন।

দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত দীনেশ মজুমদার ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করিয়া হিজলী বন্দী-নিবাস হইতে পলাতক আটক বন্দী নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর সঙ্গে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের একটি বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিতে গেলে উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় হয়। গুলী নিঃশেষিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনজনই ধরা পড়েন। বিচারে দীনেশের হয় ফাঁসি এবং অপর দুইজনের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বাংলার ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ মিঃ লোম্যানের উপর বিপ্লবী দলের বিশেষ নজর ছিল। বিক্রমপুর নিবাসী শ্রী রেবতী মোহন বসুর পুত্র বিনয় বসু তাঁহার হত্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের এক সকালে মিঃ লোম্যান ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ হড্‌সনকে লইয়া মিটফোর্ড হাসপাতালে জনৈক শ্বেতাঙ্গকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সময় মিটফোর্ডেরই ছাত্র বিনয় বসু একাই তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়েন। উভয়েই আহত হইলেন বটে, কিন্তু তিন দিন পর শুধু মিঃ লোম্যানেরই প্রাণবিয়োগ ঘটে। আততায়ী ধরা না পড়ায় পুলিশ পাইকারীভাবে ঢাকায় গ্রেফতার এবং অত্যাচার চালাইতে থাকে।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গোলাগুলী

কর্ণেল সিম্পসন ছিলেন বাংলার জেল বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল। বিপ্লবী দলের প্রতি তিনি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য ১৯৩০ সালে ৮ই ডিসেম্বর মিঃ লোম্যানের হত্যাকারী বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত হইয়া বেলা অনুমান সাড়ে এগারটায় সময় রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় গমন করেন। কর্ণেল সিম্পসন তখন আপন কক্ষে কাজে ব্যস্ত

ছিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিপ্লবীরা একসঙ্গে তাঁহাকে গুলী করিয়া বারান্দায় আসিয়া চারিদিকে নির্বিচারে গুলী বর্ষণ করিতে থাকেন। গুলীর শব্দ শুনিয়া পুলিশ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ক্রেগ, মিঃ ফোর্ড ও মিঃ জোন্স প্রমুখ ইংরেজ কর্মচারিগণ নিজ নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাহাদিগকে কাবু করিতে পারিলেন না।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর সংঘর্ষের সংবাদ লালবাজার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে পৌঁছামাত্রই পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন, মিঃ বার্ট প্রমুখ উচ্চপদস্থ অফিসারগণ একটি সশস্ত্র বাহিনী লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহারাও বিপ্লবীদের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না। বিপ্লবীরা তাঁহাদের উপস্থিতিতেই পাসপোর্ট অফিস আক্রমণ ও লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া নিকটবর্তী একটি কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁহদের আক্রমণের দরুন সেদিন বিচার বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ নেলসন, মিঃ টোয়েনহাম্ প্রভৃতি কয়েক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ আহত হইয়াছিলেন। গুলী নিঃশেষিত হওয়ায় বিপ্লবীরা আত্মহত্যার জন্যই উপরোক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পরে তাহা বুঝা যায়। সুধীর গুপ্ত পটাসিয়াম সাইনাড্ ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করেন। বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত নিজেদের গুলীতে আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন বটে, কাহারও কিন্তু মৃত্যু হইল না। গ্রেফ্‌তারের পর পুলিশ তাঁহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যায়। বিনয় বসু হাসপাতালে বেশীর ভাগ সময় অচৈতন্য থাকিতেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলেই তিনি ক্ষতস্থান নানাভাবে বিষাক্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া চিকিৎসকগণের সর্ব প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও হাসপাতালে প্রবেশের মাত্র পাঁচ দিন পর তিনি দেহত্যাগ করেন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে দীনেশ গুপ্তের বিচার হয়। ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই অর্থাৎ ঘটনার আট মাস পর তাঁহার ফাঁসি হয়। কলিকাতার একটি সংবাদপত্র তাঁহার মৃত্যুসংবাদটি নিম্নোক্ত-রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন: "Dauntless Dinesh Dies at Dawn"

হরকিষণ নামক জনৈক বিপ্লববাদী পেশোয়ারের একজন আফ্রিদীর নিকট হইতে একটি আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করিয়া লইয়া পাঞ্জাব-গভর্ণর স্যার

মণ্টোমারেন্সীকে হত্যা করিবার জন্য লাহোর গমন করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি গভর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার গুলী ছোড়েন। তাঁহার গুলীতে একজন ভারতীয় পুলিশ নিহত হয় এবং একজন ইংরেজ আহত হন। গভর্ণর সামান্য আঘাত পাইয়াছিলেন। হরকিষণ ঘটনাস্থলেই ধৃত হন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। তা' ছাড়া এই হত্যা সম্পর্কে ধৃত 'মিলাপ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের দুর্গাদাস চমন লাল এবং রণবীর সিং-এর ফাঁসির আদেশ হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর স্যার আর্নেস্ট হার্টসন পুনার ফার্গুসন কলেজ পরিদর্শনে গমন করিলে, বাসুদেব বলবন্ত নামক একটি অল্প বয়স্ক বালক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করে। কিন্তু ইহাতে গভর্ণরের কোন ক্ষতি হয় না। বিচারে বাসুদেব দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলী জ্যাক্সন পৌরহিত্য করিতেছিলেন। এমন সময় কুমারী বীণা দাস, বি. এ. তাঁহাকে গুলী করিতে গিয়া ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দীর হাতে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁহার নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সাহসিকতার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। এ-কারণে হিন্দুদের একাংশের নিকট তিনি পুলিশী স্যার নামে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন।

বাংলার পরবর্তী গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন বিপ্লবীদের বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে দার্জিলিং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান। এই ঘটনা সম্পর্কে ধৃত যুবকগণের মধ্যে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি এবং সুকুমার ঘোষ, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বলা মজুমদার প্রমুখ কয়েকজনের দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় স্যার মাইকেল ও-ডায়ার পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক জেনারেল ডায়ারের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁহার এই অপরাধের জন্য বিপ্লবীরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের

দীর্ঘকাল পর উধম সিং আজাদ নামক জনৈক বিপ্লবী ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ইংলণ্ডেই উধম সিং-এর ফাঁসি হইয়া যায়। ইহা ছাড়া ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ সালে যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের গভর্ণরকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

মিঃ গার্লিক, আই. সি. এস. আলিপুরের দায়রা জজ ছিলেন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই অর্থাৎ দীনেশের ফাঁসির মাত্র কুড়ি দিন পর বিমল গুপ্ত নামক জনৈক বিপ্লবী তাঁহার এজলাসে প্রবেশ-পূর্বক তাঁহাকে গুলী করেন। হাসপাতালেই মিঃ গার্লিকের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন আততায়ীকে ধরিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়া সেস্থানেই আত্মহত্যা করেন। ২৪ পরগণা জেলার এই যুবকটির নাম ছিল কানাইলাল ভট্টাচার্য। তাঁহার পকেটে একখণ্ড কাগজে লিখিত ছিল, 'যে আদালতের বিচারে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইয়াছে, তাহা নিপাত যাক্।' পুলিশ বহু অনুসন্ধানের পর এই যুবকের নাম ধাম জানিতে পারে।

শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী নাম্নী কুমিল্লার কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রী। ১৯৩১ সালে ১৫ই ডিসেম্বর ত্রিপুরার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স, আই. সি. এস.-কে হত্যা করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। তাহারা একখানি আবেদনপত্র লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গমন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট যখন উহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছিলেন, তখন একজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁহারা ধৃত হন। ইতিপূর্বে এত অল্প বয়সের কোন যুবতী এত দীর্ঘমেয়াদী দণ্ড লাভ করে নাই।

মুন্সীগঞ্জে আইন অমান্য আন্দোলন দমনে মহকুমা হাকিমকে সাহায্য করিবার জন্য সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা প্রসাদ সেন স্পেশাল অফিসার হিসাবে তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। কামাখ্যা সেন আন্দোলনকারী-দিগকে নানাভাবে নির্যাতিত করিয়া শীঘ্রই বিপ্লবীদের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। এইজন্য তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে ছুটি লইয়া অন্যত্র গমনের পরামর্শ দান করায় প্রাণভয়ে তিনি তাহাই করেন।

ছুটির বেতন লইবার জন্য ১৯৩২ সালের ২৩শে জুন কামাখ্যা সেন ঢাকায় গমনপূর্বক সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী শচীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইহার তিন দিন পর নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। পুলিশ হয়ত এই হত্যার কোন কুলকিনারাই করিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু পরদিন এক অত্যাশ্চর্য রকমে আততায়ী ধরা পড়িয়া যায়। উক্ত দিবস দ্বিপ্রহরে একটি লোক কলিকাতার অদূরে ইসাপুরের সারদা মেডিক্যাল হল-এর ঠিকানায় সুরেশ গাঙ্গুলীর নিকট একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম অফিসে উপস্থিত হয়। টেলিগ্রামে লিখিত কথা কয়টি পাঠ করিয়া অফিসের লোকের সন্দেহ জন্মে। টেলিগ্রামে লেখা হইয়াছিল, 'Operation successful but patient died.' তাহারা গোপনে থানায় সংবাদ দিলে পুলিশ আসিয়া টেলিগ্রাম-বাহককে গ্রেফতার করে। তাহার নিকট হইতে প্রেরকের নাম জানিয়া লইয়া পুলিশ কালীপদ চক্রবর্তী নামক ১৯ বৎসর বয়স্ক একজন বিপ্লবীকে গ্রেফ্‌তার করে। কালীপদ নিজের দোষ স্বীকার করে। বিচারে তাহার প্রতি ফাঁসির আদেশ হয়। তদনুসারে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে তাহার ফাঁসি হইয়া যায়।

শ্বেতাঙ্গদের অন্যতম মুখপত্র কলিকাতার "স্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকায় বিপ্লব-বাদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন ১৯৩২ সালের ৫ই আগস্ট অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন স্বীয় মোটরে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় জনৈক বিপ্লবী ফুটবোর্ডে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়েন। কিন্তু উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দ্বিতীয়বার গুলী করিবার পূর্বেই অফিসের দারোয়ান তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলে। এ সময় একজন কনস্টবলও তথায় উপস্থিত হয়। তাহাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় আততায়ী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এই যুবকের নাম ও পরিচয় অজানা থাকিয়া যায়। কারণ, পুলিশের হয়রানির ভয়ে মৃতদেহ সনাক্ত বা দাহের জন্য কেহ আগাইয়া আসে নাই।

মিঃ ওয়াট্‌সনের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয় সে বৎসরই ২৮শে সেপ্টেম্বর। উক্ত দিবস তাঁহার গাড়ীখানি স্ট্র্যাণ্ড রোডে উপস্থিত হইলে,

পশ্চাদ্দিক হইতে অপর একখানি গাড়ী হইতে তাঁহার উপর গুলী বর্ষিত হয়। ইহার ফলে তিনি স্বয়ং, তাঁহার মহিলা স্টেনোগ্রাফার এবং মোটর-চালক সামান্য আহত হন। ঘটনাস্থলের অদূরে তখন পাহারারত জনৈক সার্জেণ্ট দৌড়াইয়া আসিয়া বিপ্লবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে থাকিলে, তাঁহারা মোটরসহ পলায়ন করেন। সেদিনই পরিত্যক্ত অবস্থায় মাঝেরহাটে এই গাড়ীখানিতে ননী লাহিড়ী ও গোপাল চৌধুরীর লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে জোর অনুসন্ধান চালাইয়া পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয়। তন্মধ্যে একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং একজনের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হাইকোর্টে আপীলেও বহাল থাকে।

এদিকে আরোগ্য লাভের পর মিঃ ওয়াট্‌সন এদেশে আর অবস্থান নিরাপদ মনে না করিয়া স্যার টেগার্টের ন্যায় ইংলণ্ড প্রস্থান করেন। এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণের পর স্যার টেগার্ট আরব সন্ত্রাসবাদীদিগকে শায়েস্তা করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লইয়া প্যালেস্টাইনে গিয়াছিলেন। সেস্থানেও চণ্ডনীতি চালাইয়া যখন বুঝিতে পারেন, তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইংলণ্ডে চলিয়া যান। মিঃ ওয়াট্‌সনের পদত্যাগের পর বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়।

ইহা ছাড়া বিপ্লববাদীরা ছোট-খাটো আরও কয়টি হত্যা এবং ডাকাতি করে। ফরিদপুর জেলার মদনপুর গ্রামের কালীপদ ভট্টাচার্য নামক গোয়েন্দা পুলিশের একজন লোককে হত্যার অপরাধে অমূল্য চৌধুরী ও ভরদ্বাজের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। গুপ্তচর সন্দেহে ঢাকায় হীরালাল চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে বিপ্লবী অমূল্য রায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত হন।

আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ, বিচারাধীন বিপ্লবীদের মামলার ব্যয় এবং আত্মগোপনকারীদের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার বিপ্লববাদীরা ১৯৩০ সালে চল্লিশটির উপর ডাকাতি করে। লুণ্ঠন ও ডাকাতির সাহায্যে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬০ হাজার টাকা। লবণ আইনঅমান্য, সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকলাপ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আত্মহত্যা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে

এ বৎসর একশতের অধিক বিপ্লবী প্রাণ হারান। তা'ছাড়া প্রায় ৫০ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং প্রায় পাঁচ শত জন বিনাবিচারে আটক হইয়া পড়েন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র

এ সময়কার আর একটি প্রধান ঘটনা আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র। কিছু সংখ্যক বিপ্লবী একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন জানিতে পারিয়া পুলিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একই সময় ব্যাপক খানাতল্লাশী চালায় এবং সন্দেহক্রমে বহু যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃত যুবকগণের মধ্যে আলিপুরের ট্রাইব্যুনালে ৬৮ জনের বিচার চলে। বিচারে ছয় জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিন জনের দশ বৎসর, নয় জনের সাত বৎসর, চারি জনের ছয় বৎসর, এক জনের পাঁচ বৎসর, সাত জনের তিন বৎসর এবং দুই জনের এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অবশিষ্ট ছয় জনের মধ্যে দুইজন রাজসাক্ষী হয় এবং চারিজন বেকসুর খালাস পায়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার পরেই টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। এই মামলার সঙ্গে প্রায় ৩০ জন যুবককে পুলিশ জড়িত করিয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে বিপ্লববাদ আন্দোলনের কোন সংস্রবই ছিল না। রাজসাক্ষী হিসাবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপরাধ অথচ তাহাদেরই হাতে উপরোক্ত গর্হিত কার্যের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত, কতিপয় যুবককে গ্রেফতার করিয়া বিচারাধীন বিপ্লবীদের সঙ্গে জেলখানায় আবদ্ধ করিয়া রাখিত। ইহারা সেখানে বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিত এবং গোপনে পুলিশকে তাহা জানাইয়া দিয়া মোটা পুরস্কার এবং চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া লইত। সময় সময় সকল বিপ্লবীকে শাস্তি দিয়া অন্য জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। মিথ্যা অজুহাতে অতঃপর সরকার তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। টিটাগড় ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামীদের ১৫ জনের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি হয়।

মিঃ বোর্ণ ছিলেন ঢাকার একজন সার্জেণ্ট। এক দিন তিনি যখন রাস্তায় টহল দিতেছিলেন, সে সময় দুইজন বিপ্লবী তাঁহার মাথায়

লোহার রড্ দিয়া ভীষণ আঘাত করে। মিঃ বোর্ণ আঘাতের চোটে মাটিতে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। বিপ্লবীরা এই সুযোগে তাঁহার রিভলভারটি খুলিয়া লইয়া চম্পট দেয়। ইহার এক বৎসর পর বিপ্লবীরা ঢাকায় মিঃ ক্লাভেল নামক জনৈক সৈন্যের মাথায় লোহার ডাণ্ডা দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার রিভলভারটি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে।

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে পনর জন বিপ্লবীর একটি দল রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিনাজপুর জেলার হিলি স্টেশন আক্রমণ পূর্বক বহু অর্থ হস্তগত করে। সেই সময় তাহাদের গুলিতে একজন ডাক পিয়ন নিহত ও পাঁচ জন আহত হয়।

১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে অশোক কুমার বসু কানপুরের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর টিকারাম এবং একজন দারোগাকে হত্যার চেষ্টা করিতে যাইয়া ধৃত এবং দণ্ডিত হন। ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সহিত বিপ্লবীদের এক আকস্মিক ও প্রচণ্ড সংঘর্ষে তাহাদের প্রধান নায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ নিহত হন। সেই বৎসরেরই আগস্ট মাসে বিপ্লবী রাজারামকে পুলিশের সহযোগিতাকারী সন্দেহে হত্যা করা হয়।

যশপালের গ্রেফ্‌তার

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদের বিপ্লবীদের প্রধান সেনাপতি যশপাল পুলিশের সহিত একটি ভীষণ সংঘর্ষে আহত হইয়া দুইটি রিভলভার সহ ধরা পড়েন। ১৯৩০ সালের মে মাসে বিহারের একদল বিপ্লবী অর্থ সংগ্রহের জন্য ঝাঁঝড়া এবং খেলুজা নামক স্থানে দুইটি ডাকাতি করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে পাটনায় একটি স্কুল গৃহে বোমা তৈরীর সময় হঠাৎ দুইটি বোমা ফাটিয়া যায়। পুলিশ খানাতল্লাশী করিয়া বোমা ও কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করে। কিন্তু বিপ্লবীদের সন্ধান পায়না। জুন মাসে সম্ভবতঃ এই বিপ্লবীরা বোমার সাহায্যে একজন দারোগাকে

হত্যা করে। পুলিশ খানাতল্লাশী করিয়া একাধিক স্থান হইতে বোমা রিভলভার, প্রচুর গুলী এবং পিস্তল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে খালশা কলেজের ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতারত কলেজ অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার ফলে একজন ছাত্র নিহত এবং দশজন আহত হয়। পুলিশের সহায়তাকারী সন্দেহে অধ্যক্ষকে হত্যার চেষ্টা হইয়াছিল। শিয়ালকোটে মে মাসে বোমা তৈরীর সময় একটি বোমা ফাটিয়া যায় এবং একজন বিপ্লবী নিহত হয়।

ডিসেম্বর মাসে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব শেষে হরিকিষণ নামক জনৈক বিপ্লবী সিড়িতে পাঞ্জাবের গভর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করেন। হাতে এবং কোমরে গুলী খাইয়া গভর্ণর সিড়িতে পড়িয়া যান। গুলীবর্ষণের ফলে আরও তিনজন আহত হয়। কিন্তু সকলেই প্রাণে বাঁচিয়া যায়। বিচারে হরিকিষণের প্রাণদণ্ড হয়।

সংগঠন ও সংখ্যার দিক দিয়া দিল্লীর বিপ্লবীরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। দলের অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে তাহারা দিল্লীর চাঁদনীচকস্থ গাড়োরিয়া স্টোরে দুঃসাহসিক ডাকাতি করিয়া প্রায় পনর হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ইহার কিছু দিন পর প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী কৈলাসপতি গ্রেফতার হন। পুলিশ তাঁহার গোপন বাসস্থান হইতে কয়েকটি বোমা, একটি পিস্তল এবং বোমা তৈরীর উপকরণ ইত্যাদি হস্তগত করে। এসময় দিল্লীতে আরও কয়েক স্থানে যুগপৎ তল্লাশী চলে। ইহার ফলে একটি বাড়ীতে বোমার একটি বিরাট কারখানা আবিষ্কৃত হয়। কারখানায় ছয় হাজার বোমা তৈরীর উপযোগী যাবতীয় মসলা ও সরঞ্জাম পুলিশের হস্তগত হয়। বিপ্লবী দলের বিশ্বাস, ধরা পড়িবার পর যে কোন কারণে অথবা লোভের বশেই হোক, কৈলাসপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পুলিশকে এই কারখানার সন্ধান দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের শাসন সংস্কার সম্পর্কিত ব্যাপারে বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত লোথিয়ান কমিটির ইংরেজ সদস্যগণের স্পেশাল ট্রেনখানি ধ্বংসের জন্য দিল্লীর কয়েকজন বিপ্লবী ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হার্ডিঞ্জ

ব্রিজের নিকট রেল লাইনের উপর একটি মারাত্মক ধরনের বোমা রাখিয়া দেয়। বোমাটি যথাসময়ে বিস্ফোরিত হয় বটে, কিন্তু ট্রেনের কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। এইরূপে লোথিয়ান কমিটির সদস্যগণ রক্ষা পান। সেই বৎসরই জুলাই মাসে দুইজন বিপ্লবী ঢাকায় একজন পুলিশের নিকট হইতে একটি রিভলভার ছিনাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে তাহার মাথায় এক ভীষণ আঘাত করে। কিন্তু রিভলভারটি কাড়িয়া লইবার পূর্বেই লোকজন সেস্থানে আসিয়া পড়ায় বিপ্লবীরা পলায়ন করিয়া গ্রেফতার এড়াইতে সক্ষম হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলেই বিপ্লবীদল ডাকাতির সাহায্য প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিত। তবে ইহা সত্য যে উপায়ান্তর না থাকিতেই তাহারা এরূপ গর্হিত কার্যে অগ্রসর হইত। তাহারা জানিত, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, জনসাধারণ ডাকাতিকে ভাল চোখে দেখে নাই। তাছাড়া ডাকাতি করিয়া সবক্ষেত্রে খুব যে বেশী রকমের টাকা পাওয়া যাইত, এমনও নয়। বাধাপ্রাপ্ত না হইলে অথবা বিপন্ন বোধ না করিলে ডাকাতির সময় বিপ্লবীরা কাহাকেও হত্যা করিত না। একটি ব্যতীত কোন ডাকাতিতে দশের অধিক বিপ্লবী অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

মামলা-মোকদ্দমায়ও বিপ্লবীদলকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইত। ইহা অবশ্য ঠিক, বহু উকিল-ব্যারিস্টার বিনা ফিসে তাহাদের পক্ষ হইয়া মামলা পরিচালনা করিয়া তাহাদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। তা'ছাড়া জনসাধারণও পলাতক বিপ্লবীদিগকে শুধু নিঃস্বার্থভাবেই নয়, বরং পুলিশী জুলুমের তোয়াক্কা না করিয়া, আর্থিক সাহায্য এবং আশ্রয়দান পূর্বক দেশ-প্রেম ও মনোবলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে।

বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ

বিপ্লববাদের ইতিহাস যেমন ঘটনাবহুল এবং বৈচিত্র্যময়, তেমনি বিপ্লব-বাদীদের সংখ্যাও শেষ পর্যন্ত কয়েক সহস্রে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের প্রায় প্রত্যেককে কোন না কোন প্রকার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়া-

ছিল। তন্মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবীকে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইয়াছে, কিছু সংখ্যককে দ্বীপান্তরে, কিছু সংখ্যককে নানা মেয়াদের দণ্ডে কারাভ্যন্তরে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। যাহাদিগকে সৌভাগ্যক্রমে উহার কোনটি ভোগ করিতে হয় নাই, তাহাদিগকে বনে-জঙ্গলে, গুহায়-গহ্বরে, অনাহারে অনিদ্রায় কত দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু ইহার চেয়েও বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে, বিপ্লববাদের অভিযোগে যাহারা ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিয়াও ইহা অবশ্যই বলিতে হয়, যাহারা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন অথবা দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন কিম্বা বিনা বিচারে আটক ছিলেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বলিতে বিদেশী সরকার কিছুই রাখিতেন না। রাজানুকম্পায় বা অন্য কোন বিশেষ কারণে মুক্তিলাভের পরও ইহাদের হয়রানির অবসান ঘটিত না। চাকুরী এমন কি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পুলিশ ইহাদের জন্য নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়া রাখিত। থানায় হাজিরা দান এবং বাড়ীতে ঘন ঘন পুলিশের আনাগোনা তো মামুলী ব্যাপার ছিল। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের পরিজনবর্গকে নানাভাবে সর্বস্বান্ত না করিবার পূর্বে সরকার ক্ষান্ত হইতেন না। কত সম্ভ্রান্ত এবং বর্ধিষ্ণু পরিবার যে এইরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহা অনুমানের অনেক উর্ধে। বিপ্লবীদের আত্মীয়-স্বজন অথবা সহায়তাকারীরূপে একবার চিহ্নিত হইলে তাহাদের উপর পুলিশের অত্যাচার চলিত বহুদিন। এই কারণেও বহু বিপ্লবী রাজসাক্ষী হইত।

ভারতীয় বিপ্লববাদের জন্ম হইয়াছিল মহারাষ্ট্রে। কিন্তু উহা লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয় বাংলাদেশে। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় হইতে ১৯৩৪ সালে বিপ্লব-আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়িবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, সমগ্র ভারতে যত বিপ্লবাত্মক কার্য এবং ঘটনা সংঘটিত হয় উহার দুই তৃতীয়াংশের জন্য মূলতঃ ও কার্যতঃ দায়ী বাঙ্গালী হিন্দু যুবকরা। কী বিপ্লবাত্মক কার্যে, কী ধৃত হওয়ার পর পুলিশের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখে, কী বন্দীশালায়, কী দ্বীপান্তরে, কী ফাঁসিকাষ্ঠে বাঙ্গালী যুবকেরা যে বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনা ভারতের অন্যত্র

সত্য সত্যই দুর্লভ। নির্বিবাদে শাসন ও শোষণের জন্য বিদেশীয়রা অধিকার সচেতন বাঙ্গালীকে ভীরু ও কাপুরুষ আখ্যা দিয়া সামরিক-বিভাগের চাকুরী হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। বাঙ্গালী মুসলমানরা সীমান্তের জেহাদে এবং বাঙ্গালী হিন্দুরা সারা ভারতব্যাপী বিপ্লবাত্মক কার্যাবলী দ্বারা সেই অপবাদ শুধু খণ্ডনই করে নাই, উপরন্তু স্বাধীনতার পিচ্ছিল পথও অন্যদের জন্য সুগম করিয়া দিয়াছিল।

নিরুপদ্রব গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও বাংলার দান ছিল সর্বাধিক। সর্ব-ভারতীয় ব্যাপারে ক্ষেত্রবিশেষে বাঙ্গালী হিন্দুরা এবং বাঙ্গালী মুসলমানরা কোনও সময় নেতৃত্ব হয়ত দান করিতে পারে নাই। কিন্তু দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগী কর্মীর অভাব এই প্রদেশে কোন সময় ঘটে নাই। একারণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বাংলা এবং বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান দেশপ্রেমিকদের কার্যা-বলী অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। সেই জন্য ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, বিপ্লব ফ্রণ্টেই হোক, কিম্বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রণ্টেই হোক, অন্যান্য প্রদেশের কৃতিত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহা মোটেই নয়। অন্যান্য প্রদেশেরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী যথাস্থানে যথাযোগ্য ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

শ্রমিক আন্দোলন

একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য, পরাধীন দেশের তো কথাই নাই, এমন কি স্বাধীন দেশেও গণতান্ত্রিক যে কোন আন্দোলনের শক্তির প্রধান জোগানদার হইয়া থাকে শ্রমিক ও ছাত্র সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের সব কয়টি জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক ও ছাত্ররা শুধু অংশই গ্রহণ করে নাই উপরন্তু একাধিক ক্ষেত্রে উহাদের সাফল্যের জন্য কৃতিত্বও একমাত্র ইহাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্থার তুলনায় শ্রমিক ও ছাত্র সংস্থা এদেশে গড়িয়া উঠিতে থাকে বেশ বিলম্বে। মোটামুটিভাবে বলা চলে, প্রথমটি প্রথম মহাসমরের একেবারে শেষের দিকে এবং দ্বিতীয়টি অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর জন্ম লাভ করে। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য যে, ইহারও প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে কল-কারখানা-

প্রধান শহরগুলিতে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের নিজেদের না-ছিল তেমন কোন শক্তি, না ছিল কল-কারখানার মালিক ও সরকারের নিকট কোন মর্যাদা। আবেদন-নিবেদন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কাজ হইতে বিরত থাকিয়া এ সকল সংস্থার সদস্য-শ্রমিকরা মালিকদের নিকট হইতে কিছু কিছু সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের কোনটিরই সত্যিকারের শ্রমিক সংস্থার রূপ, আকার ও বৈশিষ্ট্য না থাকায় ইহাদিগকে আলোচনার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

নিছক অর্থনৈতিক কারণে প্রথম মহাসমরের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর এদেশে কল-কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সেই সময় যুদ্ধায়োজনে কল-কারখানাগুলি নিযুক্ত থাকায় শ্রমিকদের কাজের সময় যে-পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, মাহিনা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে উর্ধ-গামী হইতে থাকায়, শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ জাগিয়া উঠে এবং তাহারা অধিক মাহিনার দাবী তোলে। সরকার ছিলেন মালিকদের পক্ষে। শ্রমিকরা তাই উপলব্ধি করে যে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া তাহাদের দাবী দাওয়া আদায়ের বিকল্প কোন পথ নাই। তাহারা তখন ইহাও শুনিয়াছিল, রাশিয়ায় শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে শ্রমিকদের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির অন্য বহু আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। স্বভাবতঃই এ সংবাদ ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতে এদেশের শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। ইহারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মরণীয় যে, ইহার এক বৎসর পূর্বে, ভার্সাই সন্ধির পর লীগ অব নেশান্স এর উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (আই. এল. ও.) গঠিত হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যথা সময় ইহার স্বীকৃতি লাভ করে।

ইহার উদ্যোক্তাগণের মধ্যে স্বনামধন্য ব্যারিস্টার দেওয়ান চমনলাল ছিলেন অন্যতম। মিঃ জোসেফ ব্যাপটিস্টা ও পাঞ্জাবের অন্যতম বিপ্লবী

এবং কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট লালা লজপৎ রায় ছিলেন যথাক্রমে ইহার অভ্যর্থনা সমিতি ও মূল অধিবেশনের সভাপতি। ইহার অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে একাধিক শ্রমিক সংস্থা গড়িয়া উঠে এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতে থাকে। ১৯২৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশ-নের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলেন, তিনি চান শতকরা ৯৮ জনের স্বরাজ। শ্রমিকরা ইহাতে উৎসাহ এবং সাহস পায়।

ইতিমধ্যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার সদস্যগণ কল-কারখানার শ্রমিকদের সামনে রাশিয়ার নূতন সমাজ ব্যবস্থা তুলিয়া ধরিতে থাকিলে, শ্রমিকদের এক বৃহদংশ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শ্রমিকদের উপর কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধনশীল প্রভাবে ভীত হইয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা শ্রমিক সংস্থায় অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ব্রতী এইং মালিকদের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রে কৃতকার্য হন। এই অনুপ্রবেশের দরুন কোন কোন শ্রমিক সংস্থায় দলাদলি এবং কোন কোন কল-কারখানায় একাধিক সংস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু তত্রাচ শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি রাজনৈতিক অধিকার প্রয়াসী শ্রমিক সংস্থার সংখ্যা বাড়িয়াই চলে। শুধু তাহাই নয়, ১৯২৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে এ-মর্মে একটি প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় যে. ইহা "লীগ এগেইনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম্" অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্ঘ নামক রাজনৈতিক সংস্থার সহিত একযোগে কাজ করিবে। প্রকৃত পক্ষে এ সময় হইতে ইংরেজ সরকার শ্রমিক সংস্থাগুলির উপর তাহাদের কড়া নজর রাখেন।

কমিউনিজমের প্রভাব

কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণের বহু পূর্ব হইতেও শ্রমিকরা প্রায় প্রত্যেক জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। তবে তাহা ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। উদাহরণস্থলে ১৯০৫—১০ সালের স্বদেশী আন্দোলনে, ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে এবং সেই বৎসরই ইংলণ্ডের যুবরাজের

ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি বয়কটের ব্যাপারে, শ্রমিকরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন, শ্রমিক-সংস্থাগুলির উপর কমিউনিস্টদের প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শ্রমিকদের মধ্যে ততই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিতে থাকে। ১৯২২ সাল হইতে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি অধিবেশনে কমিউনিজম সমর্থক এবং উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীরা একযোগে ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিতে থাকেন। কিন্তু নরমপন্থী দলের প্রভাবাধীন কংগ্রেসকে দিয়া উহা গ্রহণ করাইতে পারেন না। অবশেষে ১৯২৭ সালে ডঃ এম. এ আনসারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ অধিবেশনে তাহাদের চেষ্টায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯২৮ সালে জাকজমকপূর্ণ কলিকাতা অধিবেশনে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি নরমপন্থীদের ভোটের জোরে নাকচ হইয়া যায়। পর বৎসর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেসকে কলিকাতার প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া নূতন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হইতে হয়। কারণ, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সমগ্র দেশের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল যে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ছাড়া অন্য কোন আপোষমূলক প্রস্তাবে প্রতিনিধিগণের সমর্থন আদায় করা যাইত না।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা পৃথিবীর দীর্ঘতম মামলাগুলির মধ্যে একটি। বিচারে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় পৃথিবীর বহুদেশে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল। বৃটিশ সরকারের ধারণা ছিল, ইহাদের শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের নাম-নিশানা এদেশ হইতে মুছিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ গুরুতর শাস্তির ঝুঁকি লইয়া আদালতে যে সকল বিবৃতি দান করেন, তাহা হইতে তাহাদের কর্মসূচী ও মতবাদ সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায় এবং তাহারা ইহার প্রতি অধিকতর সংখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বলিতে হইবে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা কমিউনিজমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের শ্রমিক সম্প্রদায়কে শান্ত করার জন্যই লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে

হইয়াছিল। পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু ছিলেন লাহোর অধিবেশনের সভাপতি। আর ১৯২৮ সালে কলিকাতার যে অধিবেশনে ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া তদস্থলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়, উহার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। পিতা পুত্রের এই দ্বন্দ্বের মূলে ছিল আদর্শগত কোন পার্থক্য নয়—ছিল শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভীষণ চাপ। লাহোর প্রস্তাবকেই চরম ও পরম লক্ষ্য হিসাবে ধরিয়া লইয়া অতঃপর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং বহু সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ আঠার বৎসর পর উহা অর্জন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক্ষেত্রেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগ এবং দানই ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে শ্রমিক সংস্থাগুলির দান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কৃষক-প্রজা আন্দোলন

ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলার, কৃষক আন্দোলন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমান কৃষক, রায়ত, প্রজারা বহু আন্দোলন এমন কি বিদ্রোহ এবং ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশ্রয় পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য এসব আন্দোলন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোন সময় প্রদেশ ভিত্তিক হয় নাই। কোন বিশেষ জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহার রায়ত-প্রজারা আন্দোলন করিত। জমিদারও ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত হইত। ফলে উভয় পক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হইতে দেখা যাইত। যেহেতু সরকার তাঁহাদেরই সৃষ্ট জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করিতেন, সেজন্য শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদেরই পরাজয় ঘটিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সব সময় কোন না কোন স্থানে অত্যাচারী জমিদার এবং তাহার নিরীহ রায়ত-প্রজার মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকিত। বাংলার জমিদার-বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী তিতুমীর (নিসার আলি) ২৪ পরগণার একাধিক অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বৃটিশের বিরাগভাজন হন এবং তাঁহাদেরই সৈন্যদের

হাতে প্রাণ হারান। নীলকরদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলনও অনেকটা এরূপ ছিল। ১৮৩২ সালের পাবনার কৃষক-বিদ্রোহ ছিল নিছক অর্থনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক। বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগই ছিল মুসলমান। কিন্তু নেতা ছিলেন একজন হিন্দু কৃষককর্মী—ঈশান চন্দ্র রায়। ইনি বিদ্রোহী-রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। আন্দোলন দমনের নামে ইংরেজরা সেই সময় বহু কৃষককে হত্যা করেন।

যোগ্য নেতৃত্ব এবং সংগঠনের অভাবে কৃষক, রায়ত, প্রজারা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পূর্বে প্রদেশ দূরে থাক্, জেলা পর্যায়েও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। প্রথম মহাসমরের সময় কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আসে এবং জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতঃই ইহার প্রতিকারের জন্য তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক উদ্যোগী হয়। স্থানীয় কর্মীদের চেষ্টায় প্রথমে অত্যন্ত ছোট এলাকায়, পরে থানা এবং আরও পরে জেলা ভিত্তিক সংস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে কল-কারখানার শ্রমিকদের সংস্থা গড়িয়া তোলা সহজ। কিন্তু কৃষক প্রজাদের কোন সংস্থা গড়িয়া তোলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, যেহেতু কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তাহাদের বাস নয়—সমগ্র দেশে তাহারা ছড়াইয়া থাকে। ইচ্ছা থাকিলেও ইহারা শ্রমিকদের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না। তা'ছাড়া শহর হইতে দূরে থাকে বলিয়া শ্রমিকদের চেয়ে ইহারা ঢের বেশী রক্ষণশীল এবং নিয়তির উপর বিশ্বাসী। ইহা সত্ত্বেও যাঁহারা ইহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে একান্ত স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যতদূর জানা যায়, প্রদেশ-ভিত্তিক সংস্থা গড়িয়া তোলার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল ১৯১৫ সালে। এই উদ্যোগের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু, যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং দেশের ভাগ্য সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার দরুন ইহা সফল হয় নাই।

ইহার পর অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে বহু কৃষক-প্রজা কর্মী যোগদান করায় তাহাদের নিজস্ব আন্দোলনটি মন্দীভূত হইয়া পড়ে। তিন বৎসর পর যখন ইহার পুনর্জীবন লাভ হয়, তখন দেশের অবস্থা

অনেক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। অবস্থার চাপে পড়িয়া বৃটিশ সরকার ইতিমধ্যে এদেশবাসীর হাতে কিছু কিছু শাসনক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মারফৎ আইনসভায় তাহাদের অভাব-অভিযোগ উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে দেখিয়া পুরাতন কর্মীরা নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া আবার কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এবার তাঁহাদের তৎপরতা অনেকটা আইনসভামুখী হইয়া পড়ে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তীকালে আইনসভা এবং পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিল।

সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের গতি ও ধারা পরিবর্তন সত্ত্বেও অতঃপর কৃষক প্রজা আন্দোলন কোন কোন জেলায় দুর্বার হইয়া উঠে। সন্ত্রস্ত জমিদার ও মহাজনরা ইহাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দানের জন্য নানা কলা-কৌশল অবলম্বন করেন। পুলিশের সহিত যোগসাজসে তাহারা মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত করিয়া এসময় বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীর শাস্তি ও অর্থদণ্ডের ব্যবস্থাও করিয়া লইতে প্রয়াস পান। কিন্তু তাহাতে আন্দোলনের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না বরঞ্চ উহার তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধের জন্য সরকার অবশেষে জমিদার এবং মহাজন প্রভাবিত আইন পরিষদকে দিয়া ঋণ শালিসী আইন পাস এবং প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করিয়া লইতে বাধ্য হন। এই দুইটি আইনে কৃষক শ্রেণীর কয়েকটি দাবী দাওয়া স্বীকৃতি লাভ করায় আন্দোলনের উত্তাপ আবার হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রদেশের সাধারণ নির্বাচনে কৃষক-প্রজা সংস্থার টিকেটে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য পরিষদের আসন লাভ করেন। পরিষদের হাতে আইন প্রণয়নের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকায় এবং পরিষদে যথেষ্ট সংখ্যক কৃষক-প্রতিনিধির উপস্থিতির দরুন, বাহিরে আন্দোলন আস্তে আস্তে আরও নিষ্প্রাণ হইয়া উঠে। দেশ বিভাগের পর উভয় বাংলায় জমিদারী প্রথা রহিত হওয়ায় এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের দরুন কৃষক-প্রজা আন্দোলনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

লাইন প্রথা

অবিভক্ত বাংলার অল্প কয়েকটি জেলায়, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং ফরিদপুর জেলায় কৃষক-আন্দোলন কোন কোন পর্যায়ে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। জমিদারদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হইয়া সে সময় ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলার হাজার হাজার পরিবার ব্রহ্মপুত্রের চর, আসাম উপত্যকার বন-জঙ্গলে এবং বিরল-বসতি এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাদের বলিষ্ঠ হাতের লৌহকাঠির পুনঃপুনঃ স্পর্শে নিম্ন আসাম উপত্যকার শত শত বৎসরের প্রাচীন অনাবাদী এলাকায় অচিরে সুন্দর সুন্দর গ্রাম গড়িয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আসামে বহিরাগত মুসলমানদের অবস্থান যতই কল্যাণকর বিবেচিত হোক্ না কেন, ইহা স্থানীয় হিন্দুদের বরদাশ্‌ত হয় নাই। পাছে আসামও একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশে পরিণত হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা লাইন প্রথার প্রবর্তন এবং 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন চালু করে। সরকারী ও বেসরকারী চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া হাজার হাজার প্রবাসী বাঙ্গালী মুসলমান পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতে থাকে। ইহাদের রক্ষা এবং লাইন প্রথা প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে দেশ বিভাগের কয়েক বৎসর পূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এমন এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন যাহা আসামের জন্য সত্যই অচিন্তনীয় ছিল।

ইহা সত্ত্বেও আসাম সরকারের মনোভাবে কোন পরিবর্তন হয় না। লাইন প্রথা প্রত্যাহার করিয়া আসাম উপত্যকার হাজার হাজার বর্গ মাইল পরিমিত অনাবাদী এলাকা চাষাবাদ ও বসতি স্থাপনের জন্য মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অবশেষে মওলানা ভাসানী যখন আইন অমান্য আন্দোলন চালু করিবার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, সে সময় বৃটিশ সরকার দেশ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। দেশ বিভাগের পর মওলানা ভাসানী নিজেও আসাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের সহজ শিকার হইয়া হাজার হাজার প্রবাসী মুসলমান পরিবারকে সর্বস্ব ফেলিয়া রাখিয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিতে হয়।

বাংলার কৃষক-প্রজা আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক এবং অসাম্প্রদায়িক। এজন্য ইহার প্রায় কুড়ি বৎসর স্থায়ী অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে মওলানা শামসুল হুদা, শাহ আবদুল হামিদ, জনাব আবদুল ওয়াহেদ বোকাই-নগরী, শ্রীবিরাট চন্দ্র মণ্ডল, শ্রী নির্মল কুমার সেন, জনাব রজীব উদ্দীন তরফদার, শ্রীবাণী কণ্ঠ সেন, জনাব আবু হোসেন সরকার, জনাব ওয়াসিম উদ্দীন, শ্রীদ্বিজেন ঠিকাদার, জনাব আবদুল মালেক, শ্রীললিত কুমার বল, জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস, জনাব মোখলেস্থর রহমান, জনাব সুন্দর আলি গান্ধী, জনাব খোন্দকার নাজির উদ্দীন, জনাব শাহেদ আলি, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল প্রমুখ বহু হিন্দু-মুসলমান কর্মীকে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিতে দেখা গিয়াছে।

তাহা ছাড়া এই আন্দোলনে যাঁহারা বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব দান এবং নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে জনাব এ, কে, ফজলুল হক, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, শ্রী জে, এল, ব্যানার্জী, খান বাহাদুর হাশেম আলি খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে মওলানা আকরম খাঁ ও ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত ব্যতীত অন্যান্য নেতা ছিলেন অল্প বিস্তর পেশাদার রাজনীতিক। এজন্য তাঁহাদের রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে কৃষক-প্রজা আন্দোলনেরও উত্থান পতন ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনও ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভূমিহীন হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজ উপকৃত হইত। তা সত্ত্বেও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এমন কি আসাম প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদেরও সমর্থন লাভ করেন নাই। শুধু তাহাই নয়, বাংলা ও আসামের কংগ্রেসী হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিছক রাজনৈতিক কারণে তাঁহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন।

দেশ বিভাগের মাত্র চারি বৎসর আগে উত্তর বঙ্গের কোন কোন জেলায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। কমিউনিজম-সমর্থক কৃষক-প্রজা কর্মীরাই ছিলেন ইহার পুরোভাগে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহা বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু এক্ষেত্রেও জমিদার, তালুকদার, জোতদারগণ সরকারের সমর্থন লাভ করিতে থাকেন। আন্দোলনটি তীব্র ও ব্যাপক

হইয়া পড়িবার পূর্বেই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হইয়া যায়। ইহার ফলে যে পরিবেশে আন্দোলনটি গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা নষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনটি চাপা পড়ে এবং হিন্দু কর্মীদের বেশীর ভাগ পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিশাপমুক্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রধানতঃ কমিউনিষ্ট কর্মীদের চেষ্টায় ১৯৩০ সাল হইতে একাধিক জনপ্রিয় নামে কিষাণ আন্দোলন ও সংস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে। কংগ্রেসের 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে কিষাণ কর্মীদের আত্মত্যাগ ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামকে করিয়াছিল অজেয় ও মহীয়ান।

ছাত্র ও যুব আন্দোলন

শ্রমিক সম্প্রদায়ের ন্যায় এদেশে প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনে ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের দানও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহারা শুধু যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হোমরুল প্রবক্তাগণের বাণী ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শহর, বন্দর ও পাড়াগাঁয়ের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহা নয় উপরন্তু ওয়াহাবী আন্দোলন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জেহাদ, বিদেশী বর্জন এবং বিপ্লব আন্দোলনের ইহারাই ছিল নিঃস্বার্থ কর্মী ও সৈনিক। ওয়াহাবী ও জেহাদ পরিচালকগণের রিক্রুটিং গ্রাউণ্ড ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাগার, যথা মক্তব ও মাদ্রাসা। ধর্মীয় শিক্ষার্থীরা সর্বস্ব ত্যাগ ও পণ করিয়া পদব্রজে শত শত মাইল অতিক্রম পূর্বক সীতানা ও মুল্কার শিবিরগুলি পূর্ণ করিয়াছে। কখন অনাহারে, কখন অর্ধাহারে থাকিয়া তরবারি হাতে বন্দুক-কামানধারী বৃটিশ, শিখ, গুর্খা এমন কি স্বধর্মাবলম্বী কোন কোন উপজাতীয় লোকলস্করদের সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম এবং ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রামেও যে গাজী বাহিনী সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া বিদেশী লেখক ও ঐতিহাসিকগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, তাহাতেও ছিল মুসলমান ছাত্র এবং যুবকদের সংখ্যাধিক্য।

বিপ্লববাদ আন্দোলনে হিন্দু ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের দান আরও বেশী এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের মানসে অগ্নিমন্ত্রে

যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, হিসাব করিলে দেখা যাইবে তাহাদেরও শতকরা প্রায় ৯০ জন আসিয়াছিল স্কুল-কলেজ হইতে। অসহযোগ, খিলাফৎ, লবণ আইন অমান্য এবং কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনেও সম্প্রদায়, ধর্মও বর্ণ নির্বিশেষে এই ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছিল গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনকভূমিকা। ইঁহাদের সহযোগিতা না পাইলে কোন আন্দোলনই সফল হইত না। এজন্যই অত্যাচারী বিদেশী শাসকশ্রেণী সব সময় দেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে ভয় এবং সন্দেহের চোখে দেখিত, কথায় কথায় তাহাদের উপর নির্যাতন চালাইত, জাতীয় আন্দোলন এবং দেশের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখার ফন্দি-ফিকিরে থাকিত এবং অযাচিতভাবে উপদেশ খয়রাত করিত। অত্যাচারী শাসকশ্রেণী জানিত, তাহাদের অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে একমাত্র ইহারাই। তাহাদের এই ধারণা অমূলক ছিলনা। বস্তুতঃ ইহারা দেশের ও দশের প্রতি তাহাদের কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছে।

পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে যদি ছাত্র এবং যুবক সম্প্রদায়ের সমর্থন না থাকিত, তাহা হইলে লাহোর প্রস্তাবটি মুসলিম লীগের আরও হাজার প্রস্তাবের ন্যায় কাগজের পৃষ্ঠায় থাকিয়া যাইত। এই আন্দোলনের ইতিহাস যাহাদের জানা আছে, তাহাদের নিকট ইহা মোটেই অতিরঞ্জন নয়. পাকিস্তান আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন জেলায় সর্ব-জনাব আবদুল ওয়াসেক, সৈয়দ শামসুর রহমান, বি. এম. ইলিয়াস, সৈয়দ সাদেকুর রহমান, মাহমুদ আলি, আসাদুজ্জামান এফেন্দী, মোস্তাফিজুর রহমান খান, জহুর আহমদ চৌধুরী, এম. এ. আজিজ, মাহমুদ নুরুল হুদা, শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, জহুর হোসেন চৌধুরী, শামসুল হক, নুরুদ্দীন আহমদ, আনোয়ার হোসেন, শামসুদ্দীন আহমদ, জহিরুদ্দীন প্রমুখ ছাত্র-নেতাদের দান অত্যন্ত বেশী। সত্য বটে, মুসলমান ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে হিন্দু ছাত্র এবং যুবকদের ন্যায় তেমন কোন অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কিন্তু তাহা তাহাদের সাহস কিম্বা দেশপ্রেমের অভাবের জন্য মোটেই নয়। দুর্বল নেতৃত্বের জন্যই তাহা হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মুসলমান ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের হাতে, সে সকল ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট দৃঢ়তা ও

মনোবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। উদাহরণস্বলে বন্দেমাতরম এবং শ্রী-পদ্ম-বিরোধী আন্দোলন, হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন, রশিদ আলি দিবস পালন ইত্যাদি নাম করা যাইতে পারে। দুর্গত মানবতার সেবাকার্যেও মুসলমান ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায় দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিতে পারিয়াছে। বিহারের দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় দুঃস্থ মুসলমানদের সেবা কার্যে এবং সিলেটের গণভোটের সময় তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম বহুদিন তাহাদের গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা স্মরণ করিবে। তবে ইহা তাহাদের নির্ভীকতা কিম্বা আত্মোৎসর্গের প্রমাণ বহন করেনা।

লেখক ও সংবাদপত্র

ভারতবর্ষের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস লেখকশ্রেণী ও সংবাদপত্রসমূহের দানে যতটা সমৃদ্ধ, সম্ভবতঃ পৃথিবীর অপর কোন পরাধীন জাতির ইতিহাস ততটা নয়। এদেশের প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল ইঁহাদের বলিষ্ঠ লেখনী ও দৃঢ় সমর্থন। ইঁহারাই ছিলেন জাতির দিশারী, ইঁহারাই সঞ্চারিত করিয়াছেন দেশ-প্রেমিকদের প্রাণে নব নব আশা ও প্রেরণা, বক্ষে দুর্জয় সাহস এবং বাহুতে অমিত শক্তি। বিদেশীয় শাসকশ্রেণীর ভ্রূকুটি, নির্যাতন, কারাদণ্ড এবং আরও বহুবিধ অত্যাচার অবিচার অগ্রাহ্য করিয়া ইঁহারাই যুগে যুগে দিয়াছেন জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান, তুলিয়া ধরিয়াছেন জাতির সামনে দেশ-প্রেমের মহান আদর্শ এবং ইঁহারাই দিয়াছেন জাতির মুখে ভাষা।

নানা কারণে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে এদেশবাসীর জাতীয় চেতনা কোন সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর বিজয়ী পক্ষ এদেশের শাসনব্যবস্থা নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া গঠন করিতে উদ্যোগী হন। ভবিষ্যতে ভারতবাসীরা যাহাতে তাঁহাদের শাসনব্যবস্থার উপর অনুরূপ কোন আঘাত হানিতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহারা এমন কতিপয় বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যাহা ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। অথচ ইঁহারাই সিপাহী বিদ্রোহে সামগ্রিকভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহে সাহায্য দান হইতে বিরত থাকার অনুতাপের জন্য যতটা না হোক্, স্বেচ্ছাচারী

বিদেশী সরকারের নূতন উৎপীড়নের বিরোধিতার জন্ম ইঁহারা একত্রে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। আগ্রায় সহীস কাত্‌বারুর হত্যা, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, সর্বোপরি নিরীহ দরিদ্র চাষীদের উপর নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ইঁহাদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। সংবাদপত্র ও প্রচার পুস্তক-পুস্তিকার সাহায্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজদের অত্যাচার-অবিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেশবাসীদের সামনে তুলিয়া ধরিতে থাকেন। ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, স্বেচ্ছাচারী সরকারের টনক নড়িয়া যায়।

তাই তাঁহারা সর্বাগ্রে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধের জন্ম ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট নামক একটি কণ্ঠরোধক এবং দমনমূলক আইন পাশ করিয়া দেশীয় ভাষায় মন্তব্য এবং সংবাদ প্রকাশের উপর বহু বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির উপর অনুরূপ কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপিত না হওয়ায় সেখানে সরকারের কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা চলিতে থাকে। সরকারের তীব্র সমালোচনাকারী দেশী ও বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত এ সময়কার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'কেশরী', 'মারাঠা' 'হিন্দু', 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টকে ফাঁকি দেওয়ার জন্ম অমৃত বাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এ সময় ইহাকে রাতারাতি ইংরাজীতে রূপান্তরিত করেন।

ইংরেজ সরকারের উৎপীড়নমূলক কার্য ও আচরণের তীব্র সমালোচনা অব্যাহত থাকাবস্থায় 'ইলবার্ট বিলের' খসড়া রচনার কথা জানাজানি হইয়া পড়ে। এই বিলের খসড়ায় এইমর্মে একটি বিধান সন্নিবেশিত হয় যে অতঃপর ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গদের বিচার করিতে পারিবেন। বড়লাট লর্ড রিপনের উদ্যোগে তাঁহার আইনসচিব স্যার সি. পি. ইলবার্ট উক্ত বিলের খসড়া রচনা করেন বলিয়া ভারতবর্ষস্থিত ইংরেজরা উভয়ের

বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে পাল্টা কোন আন্দোলনের অভাবে সরকার কর্তৃক বিলটি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হয় এবং শ্বেতাঙ্গদের বিচার শ্বেতাঙ্গ বিচারকগণের এজলাশে নিষ্পন্ন হইতে থাকে।

ভারতীয় নেতৃবর্গের এই দুর্বলতার জন্য ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ইংরাজ-বিদ্বেষই শুধু বৃদ্ধি পায় না, উপরন্তু দুর্বল নেতৃত্বের অবসানের চিন্তাও তখন হইতে তাহাদের মনে স্থান লাভ করে। শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক যথাসময়ে ইঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে পর্যন্ত ইঁহারই সুযোগ্য নেতৃত্বে যুব সম্প্রদায় তাহাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ইহার পর যতই দিন যাইতে থাকে, ততই শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিতে এবং জাতীয় চিন্তাধারার উদ্বুদ্ধ লেখক ও সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গোড়ার দিকে লেখকদের মধ্যে শ্রীহরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশিশির কুমার ঘোষ, শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চ্যাট্যার্জী প্রমুখ অন্যতম। ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনার মধ্যে জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট ছাপ থাকিত। বৃটিশ বিরোধী বহু ব্যঙ্গাত্মক রচনা এই সময় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখক ও সংবাদপত্রের মধ্যে শ্রীরানাডে, শ্রীগোখেল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীগণেশ সাভারকর, শ্রীশ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, মওলানা আবুল্ কালাম আজাদ, আগা মঈদুল ইসলাম ও 'কেশরী', 'যুগান্তর', ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট', 'আল্-হেলাল', 'হাব্লুল মতিন' ইত্যাদি সংবাদপত্র প্রধান।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায়ে লেখকশ্রেণী ও সংবাদ-পত্রের দান অবিস্মরণীয়। এই সময়কার লেখকগণের মধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, মিঃ বি. জি. হর্নীম্যান, মওলানা মোহাম্মদ আলী, জনাব মুজিবুর রহমান, শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রী সি. ওয়াই. চিন্তামণি, ডঃ এ্যানি বেসান্ট মওলানা মনিরুজ্জান ইসলামাবাদী, মহাত্মা এম. কে. গান্ধী, শ্রীলালা লজপৎ রায়, জনাব সৈয়দ হোসেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ শ্রী ডি. এল. রায়, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যরঞ্জন বখশী, জনাব

আবদুল্লাহ্ ব্রেলভী, জনাব সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ, মিঃ মার্মাডিউক পিক্থহল, শ্রী নৃপেন ব্যানার্জী, মওলানা হাসরৎ মোহানী, শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মওলানা জাফর আলি খান, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফি, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী, শ্রীসতেন্দ্র নাথ মজুমদার এবং দি মুসলমান ধূমকেতু, আনন্দবাজার, যুগান্তর বসুমতি, লীডার, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, জমিদার, বোম্বে ক্রনিকেল, সার্চলাইট, মদীনা, আজাদ, সত্যাগ্রহ, ইয়ং ইণ্ডিয়া, ফরওয়ার্ড, মিলাপ, প্রতাপ, রোজানা হিন্দ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসকল লেখক এবং সংবাদপত্রের কোন কোনটি রাজরোষে পতিত হইয়া নানাভাবে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশ ও পুনঃ পুনঃ মুদ্রণের জন্য লাহোরের উর্দু দৈনিক 'জমিদার' পত্রিকার পর পর চারিজন সম্পাদক কারাদণ্ড ভোগ করেন।

ইহা লক্ষ্যণীয় যে, সাংবাদিক এবং লেখকগণের অনেকেই জীবনের কোন না কোন সময় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া সেক্ষেত্রেও প্রচুর সুনাম অর্জন এবং বিদেশী সরকারের হাতে প্রভূত নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। দুইটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের যথা, শ্রী সদানন্দের ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া এবং শ্রী বিধু সেনগুপ্তের ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার দানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই কংগ্রেসের দৃঢ় সমর্থক ছিল। প্রথমটির প্রধান কার্যালয় ছিল বোম্বাইয়ে, দ্বিতীয়টি প্রধান অফিস ছিল কলিকাতায়।

১৯৪০ সালের পূর্বে ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব কোনো সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছিলনা। এই অভাব পূরণের জন্য পাটনার ব্যারিষ্টার জনাব সৈয়দ মোহাম্মদের উদ্যোগে ওরিয়েণ্ট প্রেস অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সদর অফিস ছিল দিল্লীতে। শাখা অফিসগুলির মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, করাচী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, এলাহাবাদ, পাটনা, কটক, হায়দরাবাদ ও শিলং-এর নাম উল্লেখ করা যায়। ইহা সাধারণতঃ মুসলমান ও মুসলিম লীগ সম্পর্কিত সংবাদ সরবরাহ করিত বলিয়া কংগ্রেস-সমর্থক সংবাদপত্রগুলির সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ

করে নাই। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। স্বাধীনতা পূর্ব-কালীন মুসলমান সাংবাদিকগণের অনেকে কোন না কোন পর্যায়ে ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান সংগ্রামে ইহার প্রচুর অবদান রহিয়াছে। গ্রন্থকার ইহার কলিকাতা, কটক ও শিলং অফিসের সম্পাদক ছিলেন কয়েক বৎসর।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রদেশে মন্ত্রিত্ব

উপরে আমরা দেখিয়াছি, ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই কয় বৎসর বিপ্লববাদীদের দলগুলি বৃটিশ শাসনব্যবস্থার মূলে চরম আঘাত হানিবার জন্য যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এ-সময় তাহাদের দ্বারা যত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বিপ্লববাদ আন্দোলনের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে তাহা সত্যই অতুলনীয়। বিপ্লবীদেরও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এসময়টায় বোধ হয় সর্বাধিক। নেতৃস্থানীয় বিপ্লববাদীদের বেশীর ভাগ হয় ফাঁসিতে প্রাণ দান করায় কিম্বা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় অথবা বিনা বিচারে দীর্ঘকালের জন্য আটক হইয়া পড়ায় আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। যাহারা পুলিশকে ফাঁকি দিয়া ইহার পরও কারাগারের বাহিরে রহিল, তাহারাও পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মগোপন করিয়া অনেককেই পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে হইতেছিল। যোগাযোগের অভাবে ইহারা কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। বাহ্যতঃ মনে হইতেছিল, বিপ্লববাদ আর সহজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে বৃটিশ সরকার তাঁহাদের চণ্ডনীতির এই সাময়িক সাফল্যে অত্যন্ত উল্লসিত এবং এদেশে তাঁহাদের শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই অবস্থায় লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের বৎসরাধিক কাল পরে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন পাশ করেন। মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারে তাঁহারা ভারতীয়দের হস্তে যে পরিমাণ ক্ষমতা দিয়াছিলেন, এই আইনে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচুর রক্ষা কবচের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষমতা বড়লাট এবং প্রাদেশিক গভর্ণরগণের নিকট থাকিয়া যায়। সত্য বটে সংরক্ষিত বিভাগ নামে কিছু

রাখা হইল না, কিন্তু এই আইনে এমন সব বিধান সন্নিবিষ্ট হয় যে, তাহা প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা ভারতীয়দের হস্তে প্রদত্ত ক্ষমতা একেবারে অকেজো করিয়া দিতে পারিতেন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে নূতন ভারত-শাসন আইন চালু করা হইবে ইহাও আইনে বলা থাকে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের একটা সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

ঠিকা মন্ত্রিসভা

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তথাপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলেন, অধিকাংশ প্রদেশের আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তাঁহাদের লাভ হইল। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণে তাঁহারা সম্মত হইলেন না। তাঁহারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিলেন, বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণের এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা মানিয়া লইয়া তাঁহারা মন্ত্রি-সভা গঠন করিতে রাজী নহেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরপরই জনাব জিন্নাহ্ সব কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব দিলে নীতিগত কারণে কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখান করেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অগ্রসর না হওয়ায়, কংগ্রেস-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে গভর্ণরগণ তাঁহাদের প্রিয়ভাজন লোককে দিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা নূতন আইনটি চালু করিবার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রিয়ভাজন ব্যক্তিগণের মধ্যে মুসলমানেরই সংখ্যাধিক্য ছিল।

এই মন্ত্রিসভাগুলির প্রচলিত নাম ছিল 'ঠিকা মন্ত্রিসভা।' ইহাদের স্থায়িত্বকাল সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্ণরের মর্জীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইল, ইহা একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। বাকী চারিটি প্রদেশে মুসলিম লীগ কিম্বা উহার প্রভাবাধীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিয়া পাঞ্জাব ছাড়া অন্য কোথাও যে স্থায়ী কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারেনা, ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ইহা বুঝিতে পারিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার ফলে কংগ্রেস ও বড়লাটের মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালের ২২শে জুন বড়লাট একটি বিবৃতি মারফৎ এই মর্মে এক আশ্বাস দান করেন যে, প্রাদেশিক গভর্ণর মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। মূলতঃ কংগ্রেসেরও ইহাই ছিল প্রধান দাবী। বড়লাটের আশ্বাস পাইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অবশিষ্ট চারিটি প্রদেশের মন্ত্রিসভায় মুসলমান-প্রধান্য রহিল বটে, কিন্তু উহা যে খাঁটি লীগ-মন্ত্রিসভা, তাহাও বলার উপায় ছিল না। বাংলায় জনাব এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, তাহা ছিল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। জনাব ফজলুল হক কিছুদিন পর মুসলিম লীগে যোগদান করিলেও ইহার রূপ বদলায় নাই। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট দলের নেতা স্যার সিকান্দর হায়াৎ খানের মন্ত্রিসভার সমর্থকগণের মধ্যে মালিক বরকত আলি ব্যতীত মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচিত অপর কোন মুসলমান সদস্য ছিলেন না। পরে মুসলমান সদস্যগণের অনেকে লীগে যোগদান করিলেও ইউনিয়নিস্ট দলের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক পূর্ববৎ বজায় থাকে। এই বিভক্ত আনুগত্যের জন্য লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত স্যার সিকান্দর হায়াতের মতবিরোধ একাধিকবার গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল।

সিন্ধু প্রদেশে স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েত্‌ উল্লাহ্‌ লীগ-টিকেটে নির্বাচিত হইয়া যে-মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিভিন্ন দলের সদস্য গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস কর্তৃক অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর প্রথম আঘাতেই জনাব হিদায়েত্‌ উল্লাহ্‌র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কংগ্রেস ও স্বতন্ত্রদলীয় সদস্যগণের সাহায্যে তদস্থলে খান বাহাদুর আল্লাহ্‌ বখ্‌শ নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্যার হিদায়েত্‌ উল্লাহ্‌ মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিতে না দিয়া লীগ-বিরোধী আল্লাহ্‌ বখ্‌শ মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত কিছু সংখ্যক লীগ সদস্যও দল ত্যাগ করিয়াছিলেন। খান বাহাদুর আল্লাহ্‌ বখ্‌শের হত্যার পর স্যার হিদায়েত্‌ উল্লাহ্‌ আবার মুসলিম লীগ দলে

প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলিম লীগের প্রতি আনুগত্যের অভাবের জন্ত তাঁহাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। পরবর্তীকালে বাংলা দেশেও ইহা সংক্রমিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ আসামে কিছু দিন পর কংগ্রেস অন্তান্ত দলের সহযোগিতায় স্যার সাদুল্লাহ্‌র মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে সমর্থ হয়। বাংলার ন্তায় আসামেও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করিতেন ইউরোপীয় সদস্যগণ। তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ভোট দান করিতেন এবং খুব অল্পক্ষেত্রে তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিতেন। এস্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সাতটি কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রি-সভায় যে কয়জন মুসলমান আসন লাভ করেন, তাঁহারা কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ টিকেটে নয়, বরঞ্চ নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবেই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের প্রতি মুসলিম লীগের মনোভাব যাহাই থাক না কেন, তাঁহাদিগকে দলত্যাগী বা আদর্শভ্রষ্ট বলা যায় নাই।

গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষ যোগ্যতার সহিত স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের পর জনাব মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ আইন ব্যবসায়ী হিসাবে ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে যোগদান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলি, স্যার মোহাম্মদ শফি, ডাঃ মোখতার আহমদ আনসারী, হেকিম আজমল খান প্রমুখ নেতৃবর্গ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ভারতের মুসলিম রাজনীতিক্ষেত্রে জনাব জিন্নাহ্‌র ন্তায় একজন প্রভাবশালী নেতার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকে। স্মরণ থাকে যে, ইহার বহু বৎসর পূর্ব হইতে লীগের স্থায়ী সভাপতি মহামান্য আগা খান ইউরোপে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনীতিতে তাঁহার পুনঃ প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের পীড়াপীড়িতে জনাব জিন্নাহ ইংলণ্ডে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন পূর্বক কিছু দিন পর মুসলিম লীগের প্রেসি-ডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নূতন ভারত-শাসন আইন প্রবর্তনের তারিখ ঘোষিত হইলে, জনাব জিন্নাহ্ সকলকে লীগের পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান জানান।

তাঁহারই চেষ্টায় ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য মুসলীম লীগ টিকেটে নির্বাচিত হইতে পারিয়াছিলেন। নির্বাচনের পর তিনি কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। জনাব জিন্নাহ্‌র ন্যায় একজন তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষে কংগ্রেসের এই ঔদ্ধত্যের নিকট নতি স্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। একারণেই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় একজন প্রগতিপন্থী মুসলিম রাজনীতিবিদ ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সংখ্যা-গরিষ্ঠ আইনসভায় প্রতিক্রিয়াশীল এবং বৃটিশ সরকার-ঘেঁষা ব্যক্তিগণের সমবায়ে গঠিত 'ঠিকা মন্ত্রিসভা'র অস্তিত্ব বরদাশ্‌ত করিয়াছিলেন এবং এই একই কারণে লর্ড লিন্‌লিথগোর আশ্বাসবাণীর পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে, তিনি লীগ সদস্যগণকে উহার বিরোধিতা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। লীগের এই নীতি শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল বলিয়াই ইংরেজ শাসকচক্র পৃষ্ঠপোষিত একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা নামে লীগকে দেশে বিদেশে অপবাদ কুড়াইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ লীগের বৃটিশ-বিরোধী কোন ভূমিকা ছিলনা এবং থাকিলেও তাহা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবোধ্য।

সহযোগিতার অন্তরায়

এস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৬ সালে জনাব জিন্নাহ্‌র ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল। তখন হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত লীগ ও কংগ্রেস একযোগে দেশকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস অপেক্ষা লীগই যে অধিক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, তাহা একাধিকবার প্রমাণিতও হইয়াছিল। ১৯২৮ সালের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদল সম্মেলনের পর হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যে সকল মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যদি জনাব জিন্নাহ্‌র প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রদেশে লীগ-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিতেন, অথবা অন্ততঃপক্ষে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ

প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভাকে নৈতিক সমর্থন জানাইতেন, তাহা হইলে উহা পরবর্তীকালে পাকিস্তানের দাবীতে পরিণত হইত না।

দীর্ঘ বঞ্চনা ও প্রতীক্ষার পর হঠাৎ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মিসরের খেদিভ্ ইসমাইলের স্থায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এমন কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হন যাহার ফলে মুসলমানদের মনোভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মে ও স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আইন পরিষদের অধিবেশনের শুরুতে বন্দেমাতরম গানের পরিবেশন, স্কুল-কলেজে পৌত্তলিক ভাবধারার প্রবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইবার জন্যও কংগ্রেস এ সময় নানা চেষ্টাচরিতে লিপ্ত থাকায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এবং তদ্হেতু হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

লীগের কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং পাটনা অধিবেশনে তাই কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে থাকায় লীগ-কর্তৃপক্ষ অতঃপর পীরপুরের রাজাকে সভাপতি করিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পীরপুর কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির সত্যতা স্বীকার করেন। রিপোর্টখানি প্রকাশিত হইলে কংগ্রেসের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব আরও বিষাক্ত হইয়া পড়ে। কংগ্রেসের সমর্থনে হিন্দুরাও মুসলমানদের প্রতি আরও উগ্র হইয়া উঠে। ইহার দরুন সমঝোতার পথ ক্রমশঃ কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। কংগ্রেসের উপর তখন মওলানা আজাদের খুব প্রভাব ছিল। এজন্য অনেকে মনে করেন, তিনি চেষ্টা করিলে উভয়ের সম্পর্কের এতটা অবনতি ঘটিতে পারিত না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ তিনি কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁহার প্রতি লীগ কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির ইহাও একটি কারণ।

১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন আইন পাশ হইলে, ভারতীয়দিগকে বিশেষ করিয়া কংগ্রেসকে তাহা গলাধঃকরণ করাইবার উদ্দেশ্যে এবং কংগ্রেসের প্রতি সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ বৃটিশ সরকার বিচারাধীন অন্তরীণাবদ্ধ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ-প্রায় বহু বিপ্লবীকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দেন। যাহাদিগকে ইহার পরও ধরিয়া রাখা হয়, যথাসময়ে তাহাদের বিষয়ও সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে বলিয়া তাঁহারা প্রতিশ্রুত হন। কংগ্রেস পার্টি যেই কয়টি প্রদেশ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, সে সকল প্রদেশের বহু রাজনৈতিক বন্দীকে তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করিয়া দেন। বাংলায় বন্দীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। বিনাশর্তে তাঁহাদের মুক্তির জন্য কংগ্রেস দল জনাব ফজলুল হকের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার উপর ভয়ানক চাপ দিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এব্যাপারে বাংলার মন্ত্রিসভার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না। ফলে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের ইহা একটি প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। স্মরণ করা যাইতে পারে, ইহারও পূর্বে ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ টিকেটে নির্বাচিত সদস্যগণকে বাদ দিয়া কৃষক প্রজা ও অন্যান্য দলীয় সদস্য গণের সমবায়ে জনাব ফফলুল হক বঙ্গদেশের প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রী শরৎচন্দ্র বসু এই শর্তে জনাব ফজলুল হককে সমর্থনের প্রস্তাব দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিসভা গঠনের পর প্রথম সুযোগে তিনি প্রদেশের রাজবন্দীদিগকে বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করিবেন। গভর্ণরের বিরোধিতার আশঙ্কায় তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া শেষ পর্যন্ত নিজেও লীগে যোগদান করেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবিগণের অনেকে এ সময় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া যান। যাঁহারা গেলেন না, তাঁহারাও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হইতে এই ভাবিয়া দূরে রহিলেন যে, সীমাবদ্ধভাবে হইলেও দেশের শাসন ক্ষমতা এদেশীয়-দেরই হাতে আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ণ স্বাধীনতা না পাইলেও বৃটিশের বিরুদ্ধে তাঁহাদের যেই সকল অভিযোগ ছিল, উহার কিছুটা ইতিমধ্যেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। কংগ্রেসেরই প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক টান ছিল সত্য কিন্তু লীগ মন্ত্রিসভাকেও তাঁহারা কোন দিক্ দিয়া উত্যক্ত করেন নাই। নীতিগত কারণে কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে

অস্তিত্ব জনকয়েক ইউরোপীয় সদস্যের সমর্থনের উপর তখন নির্ভরশীল না থাকিলে বাংলায় মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী সংখ্যা যে আরও অনেক বৃদ্ধি পাইত, তাহা অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের ধারণা। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সীমিত ক্ষমতা লইয়াও কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী, মন্ত্রিসভাগুলি এ সময় বহু জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল দুই বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় মহাসমরে জড়িত হইয়া পড়েন। একটি ভয়াবহ মহাসমরের লক্ষণ পূর্ব হইতে সুস্পষ্ট থাকায়, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ আগেভাগে বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে ভারতীয় জনসাধারণের অনুমোদন ব্যতীত ভারতবর্ষকে কোন যুদ্ধে জড়িত করার কিম্বা যুদ্ধে ভারতের সম্পদ নিয়োগের সকল চেষ্টায় তাঁহারা বাধা দিবেন। ইহা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভারতকেও তাহাতে জড়িত করেন। ইহার দুই সপ্তাহ পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এইমর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগদান করিবে কিনা তাহা ভারতীয়রাই স্থির করিবে এবং ভারতে বা অন্য কোথাও সাম্রাজ্যবাদকে জীয়াইয়া রাখার জন্য পরিচালিত কোন যুদ্ধে কংগ্রেস কোন রকম সহযোগিতা করিবেন না। কংগ্রেসের পক্ষে ইহা বলা যেমন খুবই স্বাভাবিক ছিল, তেমনি ভারতবর্ষকে একবার যুদ্ধে জড়িত করিয়া দিয়া জয়-পরাজয়ের পূর্বে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়া লওয়াও বৃটিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই উভয় পক্ষ তাঁহাদের স্ব স্ব মতে দৃঢ় থাকেন।

বড়লাট কংগ্রেসের উত্তরে যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহাতে কংগ্রেসের দাবী অস্বীকৃত এবং উহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায়, ১৯৩৯ সালের অক্টোবরের শেষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহের মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ পূর্বক কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের আনুগত্য, ইহার আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের জাতীয়

মর্যাদার প্রতি তাহাদের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করেন। ইহার ফলে আবার এক অচলাবস্থার উদ্ভব ঘটিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের ন্যায় এবার আর বড়লাট ঠিকাওয়ালাদের হাতে মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া দিলেন না। সুযোগ বুঝিয়া লীগ কর্তৃপক্ষ এই সকল প্রদেশের লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টিকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানাইতে যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, বড়লাট তাহাও সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দেন। কাজেই কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে গভর্ণরের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়। অপরপক্ষে লীগ কর্তৃপক্ষের অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁহারা বড়লাটের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ইহা আর গোপন রাখার অবকাশ রহিল না যে, মন্ত্রীত্বের বিনিময়ে লীগ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং থাকিবেন।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভাসমূহের উপর লীগ কর্তৃপক্ষ ভয়ানক অসন্তুষ্ট ছিলেন ইহা উপরে একাধিক স্থানে এবং প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের এই আকস্মিক পদত্যাগে তাঁহারা আনন্দিতই হন। এই আনন্দের অভিব্যক্তির জন্য লীগ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে একটা নির্দিষ্ট দিন "নাজাত দিবস" পালনের আহ্বান জানান। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও জনসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাজাত দিবস উদ্‌যাপনের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তদনুসারে বাংলা সহ আরও কোন কোন প্রদেশে সাড়ম্বরে নাজাত দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে ইহার সমীচীনতার প্রশ্ন লইয়া লীগ মহলে গুরুতর মতানৈক্য দেখা দেয়। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী লীগ কর্তৃপক্ষের এই কার্যকে জাতীয় মর্যাদার হানিকর এবং সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদারী নামে আখ্যায়িত করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা দেন। যুক্ত প্রদেশের লীগ হইতেও কেহ কেহ স্বেচ্ছায় উপরোক্ত কারণে খসিয়া পড়েন এবং বিরোধিতার জন্য কেহ কেহ বহিষ্কৃত হন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামে নাজাত দিবস অত্যন্ত মামুলীভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী অতঃপর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন নাই। তবে তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ হইতেও বিরত থাকেন।

অতি তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও নাজাত দিবস উদ্‌যাপনের ভিতর দিয়া এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তিন বৎসরে এত অধিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে অতঃপর উভয়ের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বস্তুতঃ পীরপুর রিপোর্ট প্রকাশের পর হইতে তাই কিছু সংখ্যক মুসলমান ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র এলাকার পুরাতন দাবীর যৌক্তিকতা লইয়া নূতনভাবে চিন্তাভাবনা করিতে থাকেন। ইঁহাদের সকলেই যে লীগ-সমর্থক ছিলেন, তাহা নয়।

চৌধুরী রহমত আলি নামক পাঞ্জাবের জনৈক যুবক ইহার প্রায় আট বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে সে সময় নূতন কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ পাইলেই তাহা নিবারণের উপায় সম্পর্কে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। দাঙ্গার পশ্চাতে খ্যাতনামা বহু হিন্দু নেতার উস্কানী এবং সাহায্যের কথা জানিতে পারিয়া তিনি মর্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা এলাকার ব্যবস্থা না হইলে দূর ভবিষ্যতে তাহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে। কার্যতঃ তখন হইতে তিনি ইংলণ্ডের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার অভিমত নানাভাবে ব্যক্ত করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফললাভ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

পাকিস্তান নামের উৎপত্তি

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরোধকল্পে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করায়, চৌধুরী রহমত আলি দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি স্বরচিত একখানি পুস্তিকা ইংলণ্ডে উপস্থিত সকল সদস্যের মধ্যে বণ্টন করেন। এই পুস্তিকায় তিনি প্রস্তাব করেন পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশ লইয়া একটি স্বতন্ত্র এলাকা গঠনপূর্বক উহাকে মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া উচিত। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি পাঞ্জাবের P, কাশ্মীরের

K, সিন্ধুর S, এবং বেলুচিস্তান ও পাখতুনিস্তানের Tan সহযোগে তাঁহার প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র এলাকার নাম দেন Pakistan—পাকিস্তান। এই নামের সহিত পাক, না-পাকের কোনই সম্পর্ক নাই। পৃথিবীর শত শত এলাকার নামের ন্যায় ইহাও একটি নাম মাত্র।

লক্ষণীয় যে, মওলানা হাসরত মোহানী এবং স্যার ইকবালের পরিকল্পনার ন্যায় চৌধুরী রহমত আলির এই প্রস্তাবেও একটি মাত্র স্বতন্ত্র এলাকা গঠনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির কথা দূরে থাক, এমন কি বাংলাদেশের পর্যন্ত ইহাতে কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই তিনটি প্রস্তাবেই যেই এলাকাগুলির প্রতি ইঙ্গিত বা উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল না বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। পক্ষান্তরে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইত বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং বোম্বাই প্রদেশের শহরাঞ্চলে। ১৯২৬ সালে ইহা বাংলায়ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল সত্য, তবে কোন সময় প্রদেশব্যাপক হয় নাই। বাংলা সহ দাঙ্গা-উপদ্রুত প্রদেশগুলি বাদ রাখিয়া ভারতবর্ষের এক কোণে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলি লইয়া একটি স্বতন্ত্র এলাকা গঠন দ্বারা কিরূপে সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের মুসলমানদের জানমাল রক্ষা সংক্রান্ত বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভবপর বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠাও আর একটা কঠিন সমস্যা। কারণ, এক প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ অন্য প্রদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর গ্রহণ করা ন্যায়ানুগ হইতে পারে না।

লাহোর প্রস্তাব-পূর্ব কালে দাঙ্গা উপদ্রুত প্রদেশগুলিতে ন্যূনপক্ষে তিন কোটি মুসলমানের বাস ছিল। বিস্ময়ের বিষয় যে, ইহাদের নিরাপত্তার উপর উল্লিখিত তিনটি প্রস্তাবে, এমন কি পরবর্তীকালে লাহোর প্রস্তাবেও জোর দেওয়া হয় নাই। ফলে দেশবিভাগ সত্ত্বেও মূল সমস্যা মূলতঃ অমীমাংসীতই রহিয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া যে কোন কারণে হোক্ না কেন, কাশ্মীর চিহ্নিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, পাকিস্তান নামটিরও সার্থকতা পুরোপুরিভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সর্বোপরি পাকিস্তান নামটির মধ্যে বাংলার নামের প্রতিনিধিত্বের জন্য কোন অক্ষর সং-

যোজিত হয় নাই। ইহার ফলে অন্য প্রদেশগুলির আদ্য অথবা অন্ত্যাক্ষর সংযোগে যে নামটি গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত যে বাংলারও সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। অথচ বঙ্গদেশে তখন মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যার দ্বিগুণ।

এলাহাবাদ অধিবেশনের পরও স্যার মোহাম্মদ ইকবাল দীর্ঘ আট বৎসর জীবিত ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত আট বৎসরের মধ্যে তিনি স্বতন্ত্র এলাকা দাবীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। মওলানা হাসরত মোহানী শুধু যে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকালের দুই যুগের মধ্যে তাঁহার দাবীর পুনরুল্লেখ করেন নাই তাহাই নয়, উপরন্তু বসবাসের জন্য তিনি পাকিস্তানেও আসেন নাই। একমাত্র চৌধুরী রহমত আলিই ১৯৩০ সাল হইতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত তাঁহার দাবীর উপর অনড় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এ মর্মে এক গুজব রটে যে, পাঞ্জাব প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কিত ঘোষণা শ্রবণের পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। তদুপরি বাস্তুহারা লক্ষ লক্ষ লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় তিনি এমনই মর্মাহত হইয়া পড়েন যে, অকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অথচ এই দৃঢ়চিত্ত এবং আদর্শবান ব্যক্তির নামটি পর্যন্ত আর কোথাও উচ্চারিত হইতে শুনা যায় না। 'পাকিস্তান' শব্দটি যে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ইহাও অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলিয়া যাইতেছে।

পাকিস্তান দাবী

উপরে বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁহাদের নীতি ঘোষণা করিয়া বৃটিশ সরকারের সহিত তাঁহাদের সহযোগিতা প্রত্যাহার করেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ যুদ্ধ সম্পর্কে উহার নীতি ঘোষণা হইতে বিরত এবং উহার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করিয়া থাকায়, দেশে এবং বিদেশে ইহার তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে যুদ্ধ এবং মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে

পারে মনে করিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশ হইতে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যায় প্রতিনিধি লাহোরে সমবেত হন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাদশাহী মসজিদের অদূরে মিণ্টো পার্কে বিরাট সভামণ্ডপে ২১শে মার্চ অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের তৃতীয় দিবস বিষয় নির্বাচনী কমিটির প্রাতঃকালীন বৈঠকে এই সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য একটি নয় বরঞ্চ দুইটি স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবী সম্বলিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। মূল অধিবেশনে উহা উত্থাপনের জন্য বাংলার তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হকের নাম ঘোষিত হয়। বিষয় নির্বাচনী কমিটি অতঃপর প্রস্তাবটি সমর্থনের জন্য প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এক একজন প্রতিনিধির নাম করেন। তন্মধ্যে যুক্ত প্রদেশের জনাব চৌধুরী খালেকুজ্জামানের নাম সর্বোচ্চে ছিল।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে অপরাহ্নে মূল অধিবেশনে জনাব ফজলুল হক প্রস্তাবটি পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হন। সভামণ্ডপে তখন ন্যূনাধিক ৮০ হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবটির একটি পংক্তিও শেষ না হইতে সভামণ্ডপে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, তাহা লীগের ইতিহাসে ছিল সত্যই অভূতপূর্ব। পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে ইহার চেয়েও অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পর্যন্ত একসঙ্গে এত অধিক লোকের সমাবেশে ইতিপূর্বে কোন বক্তা এত অধিক বার এবং এত ঘন ঘন হাততালি ও হর্ষধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। জনাব ফজলুল হকের উচ্চকণ্ঠ জনতার বিরামহীন হর্ষধ্বনির মধ্যে এমনি তলাইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার নিকটতম ব্যক্তির কানে পর্যন্ত প্রস্তাবের অধিকাংশ শব্দ পৌঁছিতে পারে নাই। প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন যুক্ত প্রদেশের জনাব চৌধুরী খালেকুজ্জামান, আসামের জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী, বিহারের জনাব হোসেন ইমাম, মধ্য প্রদেশের জনাব আবদুর রউফ শাহ, বোম্বাইয়ের স্যার করিম ভাই, মাদ্রাজের জনাব ইসহাক শেঠ ও জনাব আবদুল হামিদ, সিন্ধুর জনাব জি. এম. সৈয়দ, সীমান্ত প্রদেশের সর্দার আওরঙ্গজেব খান, বেলুচিস্তানের জনাব কাজি মোহাম্মদ ইসা এবং পাঞ্জাবের স্যার শাহ নওয়াজ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। শেষোক্ত জন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও মামদোতের দানশীল জমিদার ছিলেন।

লাহোর প্রস্তাব (বঙ্গানুবাদ)

"শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল এবং উহার কার্যকরী কমিটি এ যাবৎ যে সকল কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগস্ট, ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২২শে অক্টোবর এবং ১৯৪০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে যে মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উক্ত কার্যক্রম ও মনোভাবকে সর্বতোভাবে অনুমোদন দান করিতেছে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ফেডারেশনের যে পরিকল্পনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা এ দেশের বিচিত্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অকেজো, অপ্রযোজ্য এবং মুসলিম ভারতের জন্য উহা একান্তভাবেই গ্রহণের অযোগ্য।"

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরও উল্লেখ করিতেছে যে, যে নীতি ও পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হইয়াছে, উহা বিভিন্ন দল, সম্প্রদায়, স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের সহিত আলোচনাক্রমে পুনর্বিবেচনা করা হইবে বলিয়া ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে বড়লাট যে ঘোষণা করেন, তদনুযায়ী গোটা শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাটি পুনর্বিবেচনা না হইলে ভারতীয় মুসলমানদের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রণীত অপর কোন পরিকল্পনাই মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে না।"

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অত্র অধিবেশন এই মর্মে অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, নিম্নোক্ত মৌলিক আদর্শসমূহকে ভিত্তি হিসাবে না ধরিয়া অপর যে কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর এবং মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না: নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তথা এদেশের কয়েক কোটি মুসলমানরা দাবী করিতেছে যে, যে সব এলাকায় একান্তভাবেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—যেমন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদবদল করিয়া ঐ সকল এলাকাকে ভৌগোলিক দিক দিয়া এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হউক, যাহাতে

উহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'স্টেট্‌স' এর রূপ পরিগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটরে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা লাভ করিতে পারে।"

"এই অধিবেশন আরও দাবী করিতেছে যে, উপরোক্তভাবে গঠিত ইউনিটদ্বয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য শাসনতন্ত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং অত্যন্ত কার্যকর আইনানুগ নিরাপত্তার বিধান রাখিতে হইবে ; তাহাদিগের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শাসন পরিচালনাসহ অন্যান্য যাবতীয় স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাহাদিগের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। ভারতের অন্য যে সব এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যালঘু, ঐসব এলাকায়ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য শাসনতন্ত্রে বিশেষ কার্যকর ও আইনগত সংবিধানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং মুসলমান ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে তাহাদিগের মতামত যাচাই করিতে হইবে।"

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উপরোক্ত মূল আদর্শসমূহের ভিত্তিতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে শাসনতন্ত্রের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে। উক্ত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাটি এরূপভাবে প্রণীত হইতে হইবে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলদ্বয় চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশরক্ষা, যোগাযোগ, কাস্টম্‌স এবং প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোন দফতরের দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।"

LAHORE RESOLUTION

"While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committe of the All-India Muslim League, as indicated in their Resolutions dated the 27th August, 17th and 18th of September and 22nd of October, 1939, and 3rd February, 1940 on the constitution issue, this session of the All-India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of Federation embodied in the Government of India Act, 1935 is totaly unsuited to and unworkable in the peculiar conditions of

this country and is altogether unacceptable to Muslim India."

"It further records its emphathic view that while the declaration dated the 18th of October, 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is re-assuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1935, is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India, Muslim India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is re-considered de-novo and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it framed with their approval and consent."

"Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan is workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which would be so constituted with such territorial re-adjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute independent States in which the Constituent Units shall be autonomous and sovereign.

"That adequate, effective and mandatory sefeguards should be specially provided in the constitution for minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the Mussalmans in a minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic,

political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

"This session further authorises the Working Commitee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs, and such other matters as may be necessary.

প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত করিয়া তোলার জন্ম লীগ-প্রেসিডেণ্ট সমবেত সকলকে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইয়া বলেন, এই সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত কার্যসূচী লীগের পরবর্তী মাদ্রাজ অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রশ্নে মুসলিম লীগের সুস্পষ্ট অভিমত এবং উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হওয়ায়, লীগের এই অধিবেশনটি সমধিক গুরুত্ব লাভ করে। মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার অভাবে যে-সকল মুসলমান এ যাবৎ উহাতে যোগদানে বিরত ছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ অতঃপর লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে কেহ কেহ অ-মুসলিম মহলের স্থায় লাহোর প্রস্তাবকে একটি অবাস্তব ও উদ্ভট পরিকল্পনা নামে অভিহিত করিয়া এই অভিমতব্যক্ত করিতে থাকেন যে, বৃটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের সহিত আপোষ-আলোচনায় দর কষাকষির জন্যই ইহা রচিত হইয়াছে। যাহা হোক্, পর বৎসর লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবটি যথারীতি অনুমোদিত এবং পাকিস্তান দাবী জোরদার করিয়া তোলার জন্ম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আহ্বান জানান হয়। অতঃপর দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পর্যন্ত অগণিত সভা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং মিছিল ও মোর্চা সংগঠিত হইতে থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্রিপ্‌স মিশন

লীগের লাহোর প্রস্তাবটি কার্যকর করিয়া তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনায় লীগ মহল যখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, ইউরোপ এবং আফ্রিকার রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি যখন যুদ্ধে জার্মানীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, সে সময় ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান আকস্মিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মিত্রশক্তি, বিশেষ করিয়া বৃটেনের জন্য এক দারুণ সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের অগ্রগতির বিরুদ্ধে কার্যকর কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পূর্বেই, জাপানীরা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকার পূর্বক বার্মার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বার্মাও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। বার্মা ও মালয় তখন বৃটিশের শাসনাধীন ছিল।

প্রথম মহাসমরের ন্যায় দ্বিতীয় মহাসমরেও বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে তাঁহাদের প্রধান সরবরাহ-কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এই সরবরাহ কেন্দ্র এক্ষণে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া বৃটিশ সরকার তথা মিত্রশক্তি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। এবার প্রথম মহাসমরকালীন প্রতিশ্রুতির ন্যায় ভুয়া প্রতিশ্রুতি দ্বারা বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীকে তাঁহাদের যুদ্ধোদ্যমে টানিয়া আনিতে পারা যাইবেনা চিন্তা করিয়া তাহারা নানা উপায় উদ্ভাবনে রত হন। প্রকৃতপক্ষে জাপান কর্তৃক বার্মা অধিকারের ফলে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের সামগ্রিক নিরাপত্তা লইয়া অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইয়া পড়িলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যেও তাঁহাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান সুনিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স

কতিপয় প্রস্তাব সহ ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে দিল্লী আগমন করেন। ক্রীপ্‌স প্রস্তাবে যুদ্ধাবসানে ভারতবর্ষকে কয়েকটি শর্তে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রদেশগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল। স্মরণ করা যাইতে পারে, বৃটিশ মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূর্বে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস রাশিয়ায় রাজদূত থাকার সময় রাশিয়া মিত্রশক্তির পক্ষাবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় মহাসমরে যোগদান করে।

এদেশে আগমনের পর তিনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফল হইল না। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রস্তাবকে 'A post-dated cheque on a crashing bank' আখ্যা দিলে পর, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করিয়া এই কারণে ইহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসের সম্মতি ব্যতিরেকে বৃটিশ সরকার ইহা কার্যকর করিবেন না এবং লীগের সব কয়টি দাবী পূরণেরও কোন প্রতিশ্রুতি ইহাতে নাই। সেই অবস্থায় প্রস্তাবটি অর্থহীন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পর অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের আর কোন প্রশ্নই উঠে নাই। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের প্রচেষ্টা এইরূপে শেষ পর্যন্ত একটি পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয় এবং অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে।

কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাব

এদিকে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। কংগ্রেস ও লীগের মতবিরোধের অবসান ঘটাইয়া বৃটিশ সরকারের উপর চাপ্‌ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় দাবী-দাওয়া আদায় এবং জাপানের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ প্রভাবশালী সদস্য শ্রী চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারিয়া মুসলমানদের পক্ষে কিছুটা অনুকূল বিবেচিত শর্তে লীগের সহিত যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য কংগ্রেসের প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান জানান। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশনে তাঁহার

এই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। কংগ্রেসের এই কার্যে বিরক্ত এবং মর্মাহত হইয়া কংগ্রেসের এই একনিষ্ঠ সেবক উঁহার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। রাজাজীর আপোষ প্রস্তাবটি সি. আর. ফর্মুলা নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

ইত্যবসরে যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য কংগ্রেস একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার কার্যে মনোনিবেশ করে। সেই বৎসরেরই ৫ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে, বৃটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিতে আহ্বান জানাইয়া একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার মাত্র দুই দিন পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাঁহাদের আহমদাবাদ অধিবেশনে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ইহাই কংগ্রেসের কুইট্‌ ইণ্ডিয়া প্রস্তাব নামে খ্যাত। প্রস্তাবটি যথারীতি গৃহীত হওয়ায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ গ্রেফতার হন।

বৃটিশ সরকারের চণ্ডনীতির প্রয়োগ কিন্তু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করিতে থাকেন। গ্রেফতারের কাজ এত দ্রুততার সহিত সম্পাদিত হয় যে, কয়েক দিনের মধ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে শুধু শ্রীভুলা-ভাই দেশাই ও শ্রীরাজা গোপালাচারিয়াই শেষ পর্যন্ত কারাগারের বাহিরে রহিয়া গেলেন। শ্রী ভুলাভাই দেশাই সেই সময় কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীরাজা গোপালাচারিয়া ইহার প্রায় তিন মাস পুর্বে কংগ্রেসের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। নেতৃবর্গের ধর-পাকড় শুরু হওয়া মাত্রই, সমাজতন্ত্রী দলের শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীমতি অরুণা আসফ আলি, শ্রীঅচুৎ পটবর্ধন, ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতৃবর্গ সহ আরও অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী আত্মগোপন করেন। পুলিশের লোকজন ও গোয়েন্দারা তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইল না। সংগ্রামী কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এক সঙ্গে একই কারণে এত অধিক সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইতিপুর্বে কখনও

গ্রেফতার হন নাই। গ্রেফতারের পর সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী পুনা এবং অন্যান্য নেতা বিভিন্ন কারাগারে প্রেরিত হন।

বৃটিশ সরকারের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ জনসাধারণ সানন্দেই গ্রহণ করে। কিন্তু কিভাবে চ্যালেঞ্জের সমুচিত উত্তর দিতে হইবে তাহারা তাহা জানিত না। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিল যে, 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবকে কার্যকর করিতে হইলে 'বৃটিশ-রাজ খতম্ করেঙ্গে, ইয়া মারেঙ্গে' ইহাই হইবে মূল মন্ত্র এবং শ্লোগান।

কলিকাতার হিন্দু ছাত্রসমাজ ১২ই আগস্ট তাহাদের স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শোভাযাত্রা সহকারে কয়েকটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ পূর্বক আন্দোলনের সূচনা করে। পর দিবস সভা করিবার জন্য তাহারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হইলে পুলিশ তাহাদের উপর প্রথমে লাঠি ও পরে গুলী চালায়। গ্রন্থকার নিজেও শরীরের কয়েক স্থানে আঘাত পান। পুলিশের এই অন্যায় আচরণে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার পর হইতে সমগ্র কলিকাতায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং উত্তেজিত ছাত্রদের সঙ্গে জনসাধারণ আসিয়া যোগদান করে। তাহারা ট্রামের দড়ি কাটিয়া, বাস-গাড়ীর টায়ার-টিউব ফুটা করিয়া দিয়া গাড়ী চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। ব্যারিকেড্ রচনার জন্য ডাস্টবিন, চিঠির বাক্স ইট-পাটকেল আনিয়া মাঝখানে স্তূপীকৃতভাবে রাখা হইতে থাকে। ছোটখাটো পোস্ট অফিস ও পাবলিক টেলিফোনের উপর হামলা চলে এবং সাহেবী পোশাক পরিহিত ভারতীয়দের হ্যাট ও টাই অগ্নিদগ্ধ করা হইতে থাকে। কারখানার শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার দোকান পাট জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং গোপন বেতারকেন্দ্র হইতে আন্দোলনের সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকে।

তাহা ছাড়া অসংখ্য প্রচারপত্রে এবং হ্যাণ্ডবিলে কলিকাতার রাস্তাঘাট ছাইয়া যায়। পুলিশ ও মিলিটারী তখন বেপরোয়াভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দেয়। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে, সরকারী হিসাবে ২০ জন এবং বেসরকারী হিসাবে ৬৫ জন নিহত এবং তিন শতাধিক লোক আহত হয়। ঐ সময়ে শুধু কলিকাতায় ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার লোক গ্রেফতার

হইয়াছিল। গ্রেফ্তারের সময় ও পরে ইহাদের অনেকের উপর পুলিশ ভয়ানক অত্যাচার করে।

এ সময় বাংলায় জনাব ফজলুল হকের দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার দেড় বৎসর পূর্বে ভাইস্রয়ের সময় কাউন্সিলে যোগদানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইলে, ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ্ এবং তিনি ছাড়া লীগপন্থী অন্যান্য মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে পর, তিনি হিন্দু মহাসভাপন্থী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দল ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় বাংলায় দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। এ কারণে তিনি এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহ্ লীগ হইতে বহিষ্কৃত হন। তাঁহার এই দ্বিতীয়বার মন্ত্রিত্বের আমলে আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান উপলক্ষে বাংলার হিন্দু যুবক সম্প্রদায় এবং হাজার হাজার হিন্দু জনসাধারণ পুলিশ এবং সৈন্যের হাতে যে অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, বাংলার ইতিহাসে উহার বেশী নজীর নাই।

মেদিনীপুরে অত্যাচার চরমে পৌঁছিলে মন্ত্রী হিসাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ তথায় গমন করিতে চাহিলে সরকার অনুমতি দেন নাই। এই অশোভন আচরণ এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। অত্যাচার ও নিপীড়নের পশ্চাতে জনাব ফজলুল হকের কোন হাত ছিল না। কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অনুসরণে ইহার প্রতিবাদে পদত্যাগের পরিবর্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ দ্বারা তিনি কেন অহেতুক ইহার দায়িত্ব আইনতঃ ও দৃশ্যতঃ স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছিলেন তাহা একটি জিজ্ঞাস্য হইয়া রহিয়াছে। অর্থমন্ত্রী হিসাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের স্থান ছিল দুই নম্বরে এবং জনাব ফজলুল হকের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন তিনি।

মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মদান

কলিকাতার পরেই সর্বাগ্রে মেদিনীপুরের নাম করিতে হয়। 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' আন্দোলনকারীরা মেদিনীপুরের কয়েকটি থানা হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনপূর্বক তথায় স্বদেশী শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করে। তন্মধ্যে

একটি থানায় তাহাদের শাসনব্যবস্থা প্রায় ছয় মাস যথারীতি চালু ছিল। মহিষাদলে সৈন্যদের ন্যায় ইউনিফরম পরিহিত প্রায় কুড়ি হাজার স্বেচ্ছাসেবক থানার সম্মুখে সমবেদ হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সংবাদ পাইয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একদল সশস্ত্র পুলিশসহ পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণের মনোভাব বুঝিয়া তিনি কোন রকমে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যান। তৎপর ২৯শে সেপ্টেম্বর সরকারী ভবনগুলি দখলের অভিপ্রায়ে বহু সহস্র লোক বিভিন্ন দিক হইতে তমলুক শহরে উপস্থিত হয়। একটি শোভাযাত্রী দলের নেতা ছিলেন রামচন্দ্র বেরা। পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণে তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া থানাগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। অপর একটি দলের নেত্রী ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁহার হাতে ছিল কংগ্রেস পতাকা। সৈন্তরা প্রথমে তাঁহার হাত লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোঁড়ে। ডান হাতে গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর মাতঙ্গিনী বাম হাতে কংগ্রেস পতাকা ধারণ করেন। সেই হাতটিও লক্ষ্য করিয়া সৈন্তরা গুলী চালায়। তৃতীয় গুলীটি এই মহিয়সী মহিলার ললাট ভেদ করিয়া যায়। মাতঙ্গিনী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বীরাঙ্গনার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

মেদিনীপুরের এই গণ-অভ্যুত্থান দমন করিবার জন্য বৃটিশ সরকার তাঁহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াও কোন কূল-কিনারা পাইতেছিলেন না। তমলুক ও কাঁথি হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জনগণ তথায় একটি জাতীয় সরকার গঠন করে। এই জাতীয় সরকারের একজন প্রেসিডেণ্ট, একজন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইঁহাদের অধীনে থানা ও ইউনিয়ন শাসন-কমিটি গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহাদের চারি মাস কাল স্থায়ী শাসন-আমলে বন্যা-পীড়িত অঞ্চলেও একটি লোক কোন দিন অভুক্ত থাকে নাই। চুরি-ডাকাতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষাবৃত্তি বেআইনী ঘোষণা করিয়া দিয়া জাতীয় সরকার দুস্থ ও অশক্ত নর-নারীদের ভরণপোষণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃটিশ আমলের

দুর্নীতিপরায়ণতা রাতারাতি যেন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে উড়িয়া গিয়াছিল। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অজ্ঞ জনসাধারণ রাতারাতি কতটা শক্তি সঞ্চয় এবং বন্দুক-কামানের মুখে কতটা সাহসের পরিচয় প্রদান করিতে পারে মেদিনীপুর ইহার স্বাক্ষর বহন করে।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে বৃটিশ সরকার অস্ত্রবলে তমলুক ও কাঁথি পুনর্দখল করিতে সমর্থ হন। এ সময় সৈন্যরা শত শত লোককে হত্যা ও গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন এবং অসংখ্য নারীর শ্লীলতাহানি করে। কোন কোন এলাকায় চারি বৎসর পর, দেশ বিভাগের সময়ও, বৃটিশ সৈন্য এবং পুলিশদের ধ্বংসলীলার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল একটি বেসরকারী হিসাবে প্রকাশ, আগস্ট আন্দোলনে শুধু মেদিনীপুর জেলায় সৈন্য ও পুলিশের হাতে এগার শত লোক প্রাণ হারায়। আহতদের সংখ্যা ছিল ইহার পাঁচগুণ। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের অশিক্ষিত জনসাধারণের দৃঢ় মনোবল, আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অপূর্ব ত্যাগের কথা চিরকাল লিখিত থাকিবে আর সেই সঙ্গে লোকে অশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে নব্য মেদিনীপুরের স্রষ্টা এবং গণ-অভ্যুত্থানের কয়েক বৎসর পূর্বে লোকান্তরিত শ্রী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে।

ব্যাপকতা, তীব্রতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়া মেদিনীপুরের ঘটনাবলীর সহিত তুলনাযোগ্য না হইলেও বাংলার প্রায় সব জেলায় বিশেষ করিয়া দিনাজপুর, বীরভূম, ঢাকা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় জনতার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তি ও ভবন, অফিস, দলিলপত্র বিনষ্ট এবং সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। দিনাজপুরেও মুসলিম লীগের বেশ প্রভাব ছিল। তাহা সত্ত্বেও এবং অন্যান্য জেলার ব্যতিক্রমে এই জেলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মুক্তির পর ইহারাই তেভাগা আন্দোলনের সূচনা করে।

আসাম প্রদেশ

আসামেও নানা স্থানে এই গণ-জাগরণ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। জনসাধারণ বহু স্থানে থানা এবং সরকারী ভবন দখল করিয়া উহার উপর

জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। অতঃপর তাহারা রেল লাইন তুলিয়া, সৈন্যদের রসদের গুদাম লুঠ করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় দারুণ বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, সরকার সৈন্য ও পুলিশকে গুলী বর্ষণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রায় পাঁচ মাস কাল তথায় অরাজকতা চলে। আসামেও সৈন্য এবং পুলিশের সহিত সংঘর্ষে বহু লোক প্রাণ হারায়। আসামের এই গণ-সংগ্রামের সহিত কনকলতা নাম্নী মাত্র ১৩ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার আত্মাহুতি চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বালিকার পরিচালনায় একটি শোভাযাত্রী দল দরং জেলার সোহপুর থানা অধিকার করিতে যায়। থানার দারোগা কর্তৃক গুলীবর্ষণের ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও কনকলতা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকে। পুলিশ তখন তাহাকে সেই অবস্থায় গুলী করে।

বিহার প্রদেশ

বিহারের গণ-অভ্যুত্থান মেদিনীপুরের ঘটনাবলীর সহিত তুলনাযোগ্য। কলিকাতার ছাত্রসমাজের ন্যায় পাটনার স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও ১১ই আগস্ট ইহার সূচনা করে। তাহারা প্রথমে হাইকোর্ট এবং আইন পরিষদ ভবনের উপর কংগ্রেসের পতাকা উড্ডীন করিয়া উহার প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। আইন পরিষদের সম্মুখে পুলিশের সহিত এক সংঘর্ষে ৭ জন ছাত্র নিহত এবং প্রায় একশত জন আহত হয়। ১২ই আগস্ট হইতে বিহারের বহু জায়গায় ভয়াবহ গোলমাল শুরু হইয়া যায়। বাঁকীপুর জেলের সম্মুখে সংঘটিত ঘটনা তন্মধ্যে একটি। জনসাধারণ ডাকঘর ও থানা পোড়াইয়া দিয়া, রেল লাইন ও সেতু ভাঙ্গিয়া, টেলিফোন এবং টেলিগ্রামের তার কাটিয়া দিয়া বিহারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করিয়া দেয়। পাটনা শহর মিলিটারীর হাতে তুলিয়া দিয়াও সরকার তথায় আইন এবং শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পর পাটনায় একটি বন্দীশিবির স্থাপন করিয়া ক্রোধান্ধ সরকার বহু বিশিষ্ট নাগরিককে উহার মধ্যে অন্যায়ভাবে আটক রাখিয়াছিলেন।

মুঙ্গের জেলার হিন্দু-মুসলমান যুব সম্প্রদায় গেরিলা যুদ্ধের জন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহপূর্বক একটি অনুচ্চ পাহাড়ে তাহাদের ঘাঁটি স্থাপন করে।

তথা হইতে তাহারা বিভিন্ন স্থানে সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইতে থাকে। ইহাদের দমনের জন্য সরকার বোমাবর্ষী বিমান নিয়োগ করেন। ইহার ফলে অর্ধশত যুবক নিহত এবং প্রায় তিন শত জন আহত হয়। মেদিনীপুরের ন্যায় বিহারেরও অনেকগুলি এলাকায় বেশ কিছুদিন জাতীয় সরকারের কাজ চালু ছিল। প্রায় এক হাজার লোক সৈন্য ও পুলিশের সহিত লড়াইয়ে বীরের মত তথায় মৃত্যু বরণ করে। কিছু সংখ্যক লোকের মৃতদেহের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। জনসাধারণের হাতে বিহারে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশকেও প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া সরকারের অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণও দাঁড়াইয়াছিল কয়েক কোটি টাকার উপর। বিহারে দণ্ডপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজারেরও অধিক।

যুক্ত প্রদেশ

যুক্ত প্রদেশের যে কয়টি জেলায় গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তন্মধ্যে বালিয়া জেলার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই জেলায় বৃটিশের শাসনব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। গণ-আদালতে অত্যাচারী অফিসার এবং পুলিশের বিচার হইত। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রতি চরম দণ্ডাজ্ঞা প্রদান এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা হইয়াছিল। দুই মাস পর হস্তচ্যুত এলাকা পুনর্দখলের সময় সৈন্যরা কয়েক শত বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয়, এবং গুলী করিয়া বহু লোককে হত্যা করে। এমনকি ধর্ষণের পর বহু নারীকে সৈন্যরা বিবস্ত্র করিয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়া চরম বর্বরতার পরিচয় দিতে একটুও সঙ্কোচবোধ করে নাই।

উপদ্রুত অঞ্চলের কথাই উঠে না, এমনকি শান্ত এলাকার বেসামরিক ইংরেজগণও বহু দিন ঘরের বাহিরে যাইতে সাহস পান নাই। বহু ইংরেজকে অনাহারে এবং অর্ধাহারে দিনের পর দিন কাটাইতে হইয়াছিল। যতদূর জানা যায়, যুক্ত প্রদেশে গণ-বিদ্রোহে প্রায় ৫০টি থানা, ৯০টি সরকারী ভবন, প্রায় ১২৫টি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, শতাধিক রেল স্টেশন, ৫ শতাধিক টেলিগ্রাম পোস্ট এবং ট্রেনের বহু কামরার বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য পুলিশ ও সৈন্যদল ১১৩টি ক্ষেত্রে গুলী-

বর্ষণ করে। সর্বমোট বাইশ হাজার লোককে গ্রেফতার ও চালান দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে এগার হাজার বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে। বেশ কয়েকজনের ফাঁসি হয়। দিনাজপুর ছাড়া বাংলার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমে বিহারের ন্যায় যুক্ত-প্রদেশেও হাজার হাজার মুসলমান আগস্ট বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিল।

বোম্বাই প্রদেশ

কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের শ্রমিক কৃষক ও ছাত্র সমাজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়। আহ-মদাবাদ মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলির শিক্ষকবর্গ ধর্মঘট করায় একই দিন ১৬ শত শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। প্রদেশের অধিকাংশ সুতা ও বস্ত্র মিলে বহু দিন ধর্মঘট চলে। পোরবন্দরের জেলে সম্প্রদায় একটি সরকারী গুদাম হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের চাউল, চিনি ইত্যাদি বাহির করিয়া লইয়া দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে। বহু স্থানে কৃষকরা তাহা-দের উদ্বৃত্ত শস্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়। ভিলাদা নামক স্থানে শোভাযাত্রীরা তাহাদের পথরোধকারী পুলিশের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বন্দী করে। কংগ্রেস পতাকা অভিবাদন এবং ক্ষমা প্রার্থনার পর তাহা-দিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ে সংস্থাপিত গোপন বেতারকেন্দ্র হইতে সে সময় প্রত্যহ একবার সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকে।

বাংলার মেদিনীপুর এবং যুক্ত প্রদেশের বালিয়ার ন্যায় বোম্বাই প্রদে-শের সাতারা জেলায় গণ-আন্দোলন সর্বাপেক্ষা তীব্র আকার ধারণ করিয়া-ছিল। প্রথম দুই মাস আন্দোলনকারীরা অহিংস ছিল। কিন্তু পুলিশ ও সৈন্যদের নির্মম অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য জনগণ অবশেষে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হয়। ফলে সংগ্রামী জনতার হাতে বহু গ্রাম্য কাছারী, রেল স্টেশন, পোস্ট-অফিস, ডাক বাংলো ইত্যাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সৈন্য এবং পুলিশ জনসাধারণের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বাহির হইতে বহু গুণ্ডা আমদানী করে। বাবুরাও দেশমুখ নামক একজন নামজাদা গুণ্ডা ইহাদের সর্দার হয়। ইহার সাহায্যে পুলিশ বহু অপকর্ম সাধন

করে। গণ-বাহিনীর বিপুল লোকজন একদিন ইহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে সন্ত্রস্ত হইয়া পুলিশের লোকজনেরা সাতারা ছাড়িয়া পলায়ন করিলে পর তথায় একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা "পত্রী সরকার" নামে অভিহিত হয়। এই নূতন সরকার প্রায় দশ মাস কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এ সময় গোপন কেন্দ্র হইতে শ্রীঅচ্যুত পটবর্ধন সাতারার এই গণ-বিদ্রোহ পরিচালনা করিতেন। সাতারা পুনর্দখলের সময় সৈন্য ও পুলিশের লোকজন জনসাধারণের উপর যে নির্মম অত্যাচার করিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই গণ-আন্দোলনের সময় সাতারায় উভয় পক্ষে অর্ধ সহস্র লোক প্রাণ হারায়।

মাদ্রাজ

আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে মাদ্রাজ প্রদেশেও পুলিশ এবং সৈন্যদের হাতে বহু লোক প্রাণ হারায়। বালিয়া ও মেদিনীপুরের ন্যায় মাদ্রাজেও একাধিক জেলায় বৃটিশের শাসন-ব্যবস্থায় ইস্পাত-কাঠামো নিরস্ত্র জনসাধারণের রিক্ত হস্তের প্রথম আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। সেস্থানেও নির্দয় পুলিশ ও সৈন্যরা বহু জনক-জননীর কোল হইতে তাহাদের প্রাণ-প্রিয় সন্তানদিগকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়া চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে নীরব-নিশ্চল করিয়া দেয়। অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে মাদ্রাজের গ্রাম্যাঞ্চলে পর্যন্ত গণ-সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়। তবে গ্রেফ্তারের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মাদ্রাজে কমই ছিল। সরকারী ধন-সম্পত্তি এবং ইমারত ইত্যাদিও এ প্রদেশে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সীমান্ত প্রদেশ

অস্ত্রই যাহাদের জীবনের প্রধান সম্বল, আগষ্ট আন্দোলনে সীমান্ত প্রদেশের সেই পাঠানরা অহিংস নীতির প্রতি আর এক দফা তাহাদের

অবিচলিত আস্থা প্রদর্শন করে। পেশোয়ার হইতে এই অহিংস বিপ্লব আন্দোলনটি ধীরে ধীরে সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফার খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাঠানরা গোড়ার দিকে শুধু কংগ্রেস বাণীই ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল—কোনরূপ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু সরকার পক্ষের নানা উস্কানীমূলক কার্যে শীঘ্রই পাঠানরা বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। অতঃপর তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা বাহির করিতে থাকে। পুলিশ ও সৈন্যরা নিরস্ত্র খোদাই খিদমত্গারদিগকে এই কার্যেও বাধা দিতে থাকিলে, কয়েক স্থানে সংঘর্ষ বাধে এবং তাহাতে বহু লোক হতাহত হয়।

পুলিশ ও সৈন্যদের এই কার্যের প্রতিবাদে ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন চালু করার কথা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠোর মূর্তি ধারণ এবং সৈন্যবাহিনীকে আন্দোলন দমনের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর আরম্ভ হয় খোদাই-খিদ্মতগার ও ছাত্র-যুবকদের উপর নির্বিচারে লাঠি এবং গুলী চালনা। ১০ই অক্টোবর মার্দান কোর্ট-প্রাঙ্গনে সশস্ত্র পুলিশ একটি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিয়া আটজনকে নিহত এবং ত্রিশজনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। অতঃপর মার্দান শহরে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্যের জন্য ২৭শে অক্টোবর সেস্থানে একটি জনসভা আহুত হয়। উহাতে যোগদানের মানসে খান আবদুল গফ্ফার খান পাঁচ শত কর্মী সহ মার্দান জেলায় প্রবেশ করা মাত্রই সশস্ত্র পুলিশের একটি বিরাট দল অকস্মাৎ তাঁহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহাদের লাঠির আঘাতে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর জখম হন। প্রহারের চোটে সীমান্ত গান্ধীর সংজ্ঞা লোপ পায়। সেই অবস্থায় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়া লইয়া যায়। আন্দোলনের সময় সীমান্ত প্রদেশে পাঁচ সহস্রাধিক লোককে গ্রেফ্তার করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে হাজারের অধিক লোক বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

অন্যান্য প্রদেশ

কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেফ্‌তারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বহু শহর ও গ্রামাঞ্চলে নিরুপদ্রব বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। কয়েক দিনের মধ্যে চিমুর, অস্তি, রামটেক, বেতুল, নাগপুর, যাভেলী প্রভৃতি স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারী সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। কোন কোন স্থানে তাহারা স্বাধীন সরকার স্থাপনপূর্বক নিজেদের রচিত আইন-কানুন প্রবর্তন করিয়াছিল। এই প্রদেশেও পুলিশ এবং সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়।

উড়িষ্যার ন্যায় একটি অনগ্রসর প্রদেশের অধিবাসীরা পর্যন্ত আগস্ট সংগ্রামে দারুণ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করে। কটক, বালেশ্বর ঢেন্‌কানল তালচে, কোরাপুট, জয়পুর, চাতারা প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কয়েক স্থানে বহু মাস পর্যন্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উড়িষ্যায়ও পুলিশের সহিত সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি দণ্ডিত হয়।

আগস্ট গণ-বিপ্লবের সঠিক ও বিস্তারিত ইতিহাস নানা কারণে রচিত হইতে পারিতেছে না। তবে বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায়, আন্দোলনকারীদের পক্ষে নিহতদের সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক দাঁড়াইয়াছিল। তন্মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল আড়াই শতের উপর। চিরাচরিত প্রথানুসারে সরকার পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সযত্নে গোপন রাখা হইয়াছিল বলিয়া এক্ষেত্রে অনুমানই প্রধান সম্বল। তবে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে তখন প্রকাশ পাইয়াছিল, সংগ্রামী জনতার রুদ্ররোষের মুখে গণ-আদালতের বিচারে এবং অতর্কিত আক্রমণে সরকার পক্ষের আট শতাধিক লোককে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং পরাধীনতার লৌহকঠিন শৃঙ্খল ছিন্নের মানসে নিরক্ষর, নিরন্ন জনসাধারণের বজ্রকঠোর সঙ্কল্প, সর্বোপরি তাহাদের দুর্জয় সাহস ও মনোবল দেখিয়া বৃটিশ সরকার অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সর্বপ্রথম তাঁহারা বুঝিতে পারেন, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস-স্তূপের উপর তাঁহাদের সযত্নে নির্মিত সৌধের স্থায়িত্বের জন্য এযাবৎ

তাঁহারা যাহাদের আনুগত্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছিলেন, সেই হিন্দুদেরই হাতে তাহা ধ্বংস হইতে যাইতেছে। পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে ইহাদিগকে সাময়িকভাবে দমন করিবার শক্তি তখনও হয়ত বৃটিশ সরকারের ছিল। কিন্তু তাঁহাদের শাসনের প্রতি হিন্দুদের সমর্থন এবং সদিচ্ছা ফিরাইযা আনার কোন যাদুমন্ত্রই তখন আর তাঁহাদের হাতে অবশিষ্ট ছিল না।

অনেকেব বিশ্বাস সেই সময় হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন। সদাসতর্ক জনাব জিন্নাহ্ ঠিক এ সময় আওয়াজ তোলেন, Divide and quit—হিন্দু রাজনীতিকদের মতে ইহার অর্থ দাঁড়ায়ঃ If you do not divide, stay এই প্রচারণার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাব প্র শ্ন জনাব জিন্নাহর ভূমিকা সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনার উদ্ভব ঘটে এবং তাঁহার দেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতিকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে। আগস্ট আন্দোলনেব সময়ই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দলের অস্তিত্বেব প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাইর কোন কোন স্থানে ইহারাই হিন্দু জনসাধারণকে নেতৃত্ব দান করিয়াছিল। আন্দোলন প্রশমিত হওয়ার পর ইহাদের কর্মতৎপরতা শাসক গোষ্ঠীর পবিবর্তে মুসলমানদেব বিরুদ্ধে পরিচালিত হয।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়েব তুলনায় আগস্ট আন্দোলনে বৃটিশের পক্ষে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ অনুল্লেখযোগ্য হইলেও ইহা ভারতবর্ষে তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থার মূলে যে ফাটল ধরাইয়া দেয় তাহার বিস্তৃতি রোধেব সময় এবং সুযোগ আর তাঁহারা পান নাই। ইউরোপ ও আফ্রিকাব বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যখন জার্মানীর হাতে তাঁহাদেব বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ঘটিতেছিল ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে তাঁহাদের জন্য আর এক নূতন বিপদ-সঙ্কেত উত্থিত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতবর্ষের কোন স্বার্থ ছিল না। ভারতবাসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বৃটিশ সরকার যুদ্ধের খাতায় ইহার নাম লিখাইয়া

দিয়াছিলেন। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। তাঁহাদের এই কার্যে শাপে বরের ন্যায় লাভবান হন বৃটিশ সরকার। তাঁহারা নির্বিবাদে সে সকল প্রদেশের লোকবল ও সম্পদ যুদ্ধে নিয়োগ করিবার সুযোগ পান। ক্ষমতা হাতছাড়া হইয়া পড়ায় কংগ্রেসীরা এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারকে বাধা দিতে পারিতেছিলেন না সত্য, কিন্তু মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহাদের বিক্ষোভ প্রকাশের একটা মহা সুযোগ উপস্থিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদে যুদ্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া মাত্রই পরিষদে কংগ্রেসী দলের তদানীন্তন নেতা জনাব আবদুল কাইয়ুম খান মন্তব্য করেন, 'স্বাধীনতাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বাধীনতাই যদি না পাওয়া গেল, তাহা হইলে গরুর জায়গায় গাধা আসিল কি আর কিছু আসিল, তাহা লইয়া তাঁহাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। বিদেশী শাসনের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব অপরিবর্তিতই থাকিবে।'

পরিষদকক্ষে উচ্চারিত জনাব আবদুল কাইয়ুমের এই একটি মাত্র বাক্য হইতে বৃটিশ সরকারের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের উপর বৃটিশ সরকার এ কারণেই এতটা চটা ছিলেন। এদিকে জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়াই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে বৃটিশ মার্কিন, ওলন্দাজ এবং পর্তুগীজদের শাসন এবং প্রভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে সিঙ্গাপুর ও মালয়ের পতন ঘটিলে, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যদিগকে তথায় ফেলিয়া রাখিয়া ইংরেজ সৈন্যরা প্রাণ লইয়া বার্মা এবং কিছু দিন পর বার্মা হইতে ভারতাভিমুখে পলায়ন করে। সিঙ্গাপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জাপানের হাতে তখন প্রায় কুড়ি হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়া পড়ে। ক্যাপ্টেন মোহন সিংহও সেই সঙ্গে আটক হইয়া পড়িয়াছিলেন। বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের সমবায়ে একটি মুক্তি বাহিনী গঠন পূর্বক বৃটিশের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লওয়ার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। জ্ঞানী প্রীতম্ সিংহ, স্বামী সত্যানন্দ পুরী প্রমুখ নেতৃবর্গ তাঁহার সহিত এ ব্যাপারে একমত হন। জাপ-মিলিটারী কর্তৃপক্ষ

তাঁহাদের পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবার পর, কুয়ালালামপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতিষ্ঠার কথা সাধারণ্যে ঘোষিত হয়। ইহার কিছুদিন পর আরও প্রায় চল্লিশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ-এর পতাকাতলে সমবেত হন। সামরিক শিক্ষার জন্য ইহারাও যথাসময়ে বিভিন্ন শিবিরে প্রেরিত হইতে থাকেন।

মার্চ মাসে জাপানের রাজধানী টোকিওতে প্রথম মহাসমরকালীন ভারতের অন্যতম বিপ্লবী নেতা শ্রী রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণের এক সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুন মাসে ব্যাঙ্ককে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ জন্মলাভ করে এবং শ্রী রাসবিহারী বসু ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন।

ইতিপূর্বে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ-এর নেতৃত্বে ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদিগকে লইয়া গঠিত আজাদ হিন্দ্ বাহিনী এই সম্মেলনে যথারীতি স্বীকৃতি পায়। এ সময় আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর লোকজনের সংখ্যা প্রায় আশি হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার ছিল স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত নূতন রিক্রুট।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে সমবেত নেতৃবৃন্দ ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাপানের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জাপ-কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে নীরব থাকিয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোকজনকে তাঁহাদের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মোহন সিংহ এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতে থাকায় ক্রুদ্ধ জাপ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়া আবার বন্দীশিবিরে পাঠাইয়া দেন। গ্রেফতারের সময় মোহন সিংহ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দিয়া লোকজনকে আপন আপন শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। তাঁহার অন্যায় গ্রেফ্তার এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাপ-কর্তৃপক্ষের অর্থপূর্ণ নীরবতা হইতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোকজনেরা বুঝিতে পারে, তাহাদের সাহায্যে জাপানীরা যদি কোন রকমে ভারতবর্ষ জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উহা তাহারা দখলে রাখিবার চেষ্টা করিবে। তেমন অবস্থায় পরাধীন ভারতবর্ষ পরাধীনই থাকিয়া যাইবে, তফাৎ হইবে শুধু মনিবের পরিবর্তন।

এ কারণে মোহন সিংহ-এর নির্দেশ অনুসারে বহু লোক শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবীণ বিপ্লবী শ্রী রাসবিহারী বসু আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি ভাঙ্গন রোধ করিতে পারিতেছিলেন না। জাপানীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কোথাও আত্মপ্রকাশ এবং কোথাও ধূমায়িত হইতে থাকে।

সুভাষ চন্দ্রের উপস্থিতি

ঠিক এই সময় একখানি জার্মান সাবমেরিনযোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু ইউরোপ হইতে সুমাত্রা দ্বীপে অবতরণ করেন। কলিকাতায় স্বগৃহে অন্তরীণাবদ্ধ শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু মহাসমরের গোড়ার দিকে পাহারারত পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া মুসলমান দরবেশের বেশে পলায়নপূর্বক প্রথমে কাবুল এবং তথা হইতে বার্লিন পৌঁছেন। বার্লিন ও ভিয়েনায় বসিয়া জার্মান কর্তৃপক্ষের সহিত গোপন সলা-পরামর্শের পর একখানি জার্মান সাবমেরিনযোগে তিনি জাপানীদের অধিকৃত সুমাত্রা দ্বীপে গমন করেন। জাপান সরকারের অনুরোধক্রমে অতঃপর শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু তথা হইতে বিমানযোগে টোকিও যান। সেখানে তিনি জাপান সরকারের সহিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিয়া লইয়া ১৯৪২ সালের ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছেন। ইহার মাত্র দুই দিন পর সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শ্রী রাসবিহারী বসু স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসুকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ তখনও বন্দী শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রী সুভাষ চন্দ্রের নির্বাচনী মূল সমস্যার সমাধান সহজতর হইয়া যায়। সভাস্থলেই তিনি ঘোষণা করেন, ইংরেজদের হাত হইতে ভারতবর্ষ ছিনাইয়া লওয়ার ব্যাপারে আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপান সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিবেন এবং সাহায্যের বিনিময়ে ভারতের উপর তাহারা কোন দাবী-দাওয়া করিবেন না। ইহার পর ৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে প্রায় অর্ধ লক্ষ ভারতীয়দের অপর একটি সভা হয়। এই সভায় তিনি

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। সভাস্থলেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি এবং বেশ মোটা অর্থ সংগৃহীত হয়। শেষ পর্যন্ত এই তহবিলে প্রায় ১৩ কোটি টাকা, প্রচুর অলঙ্কার এবং খাদ্যশস্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার একটা বড় অংশ আসিয়াছিল প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের নিকট হইতে। বার্মার বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব হবীব মোহাম্মদ একাই এক কোটি টাকার অধিক দান করেন। তাঁহার দেশপ্রেম ও বদান্যতার জন্য তাঁহাকে 'সেবক-ই-হিন্দ' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল।

আজাদ হিন্দ্‌ মন্ত্রিসভা

আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের গঠন ও পুনর্বিন্যাসে দুই মাস অতিবাহিত হয়। অতঃপর ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়—প্রেসিডেণ্ট শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু, মন্ত্রী শ্রী রাসবিহারী বসু, কর্ণেল শাহ্‌ নওয়াজ; কর্ণেল এ. সি. চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন, দেবনাথ দাস, করিম গনি, ডি. এম. খাঁ, এ. ইয়ালাপ্‌পা; জে. থিভি; এ. এম. সরকার; সরদার ঈশ্বর সিংহ, কর্ণেল আজিজ আহমদ, কর্ণেল এন. এস. ভগৎ; কর্ণেল জে. কে ভোঁসলা, কর্ণেল এম. জেড. কিয়ানী; কর্ণেল গুলজার সিংহ; কর্ণেল লোকনাথম্‌; এ. এম. সাহা ও কর্ণেল এহ্‌সান কাদির। মন্ত্রিসভার ছয়জন সদস্য ব্যতীত আরও কতিপয় মুসলমান এ সময় আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। কর্ণেল হবিবুর রহমান হন পদাধিকার বলে সর্বাধিনায়ক সুভাষ বসুর এডিকং।

আজাদ হিন্দ্‌ সরকার যথাসময়ে জাপান, ফিলিপাইন, মাঞ্চুকু, জার্মানী, থাইল্যাণ্ড, বার্মা, ইতালী প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ জাপ-সরকার অতঃপর তাঁহাদের অধিকৃত আন্দামান, নিকোবর এবং অন্যান্য দ্বীপ আজাদ হিন্দ্‌ সরকারকে বিনাশর্তে ছাড়িয়া দেন। কর্ণেল লোকনাথম্‌ উক্ত দ্বীপগুলির প্রথম চীফ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে বিনা যুদ্ধে জাপান এই দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল।

জাপানীদের হাতে ইহার পতনের পূর্বে বৃটিশ সরকার কিছু সংখ্যক দণ্ডপ্রাপ্ত লোককে ভারতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। বেশ কিছু সংখ্যক কয়েদীকে জাপানীরা মুক্তি দেন। ইহাদের কেহ কেহ পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেয়।

সামরিক শিক্ষা শিবির

বার্মা প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান দলে দলে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিতে থাকিলে তাঁহাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানে শিবির খোলা হয়। ইহারা বার্মায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারেও জাপ-সামরিক কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে থাকে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকান ভারত সীমান্তে অবস্থিত বৃটিশ এবং আমেরিকান সৈন্যদিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়া আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর একটি দল সর্বপ্রথম ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে। সে সময় যদি তাহারা সামান্য সংখ্যক জঙ্গী এবং বোমারু বিমানপোতের সাহায্য পাইত, তাহা হইলে তাহাদের অগ্রগতি মিত্রশক্তির হাতে ব্যাহত হইয়া পড়িত না। কোন প্রকারে একবার নাফ্ নদী অতিক্রম করিতে পারিলে চট্টগ্রাম বন্দরটিও তাঁহাদের দখলে চলিয়া যাইত। চট্টগ্রাম দখলের পর মিত্র শক্তির দুর্বল বাহিনী সচেতন জনসাধারণ কর্তৃক পরিবেষ্টনের ভয়ে কোথাও যে ইহাদিগকে রুখিয়া দাঁড়াইত না তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু জাপান হইতে ইহারা বিমান-সাহায্য পায় না। উপরন্তু মিত্রশক্তির তীব্র পাল্টা আক্রমণের মুখে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অগ্রগতি রথিডং ও বুথিডং-এর নিকট বারম্বার প্রতিহত হইতে থাকে। এই এলাকার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বাহাদুর শাহ ব্রিগেড প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাতে এ স্থানেই মিত্র শক্তির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক।

আরাকাম অভিযানের কিছুদিন পর কর্ণেল শাহ্ নওয়াজের অধিনায়কত্বে অপর একটি বাহিনী বার্মা ও আসাম সীমান্তের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া মণিপুর আক্রমণ এবং ভীষণ যুদ্ধের পর উহার কিয়দংশ দখল করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়া এ সময় মিত্রশক্তি আসাম সীমান্তে

দলে দলে সৈন্য ও রণ-সম্ভার পাঠাইতে থাকেন। এতদসত্ত্বেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। ভারতের এলাকায় তাহাদের উপস্থিতির সংবাদ প্রকাশ পাইলে পাছে সমগ্র দেশে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে, এই আশঙ্কায় বৃটিশ সরকার আরাকান এবং আসাম সীমান্তের লড়াইয়ের সংবাদ এমনভাবে পরিবেশন করিতে থাকেন যে, যাহাতে ভারতবাসীরা বুঝিতে না পারে জাপানী সৈন্য ছাড়া আর কেহ তথায় যুদ্ধ করিতেছে।

বস্তুতঃ আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর উপস্থিতি এবং সাফল্যের কথা তখন এদেশে প্রকাশ পাইলে, মিত্র-শক্তির একটি সৈন্যও অক্ষত দেহে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ এবং সব রণাঙ্গণে যুদ্ধের মোড়ও ঘুরিয়া যাইত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় এ সময় মিত্র শক্তির পাল্টা আক্রমণ শুরু হইয়া গিয়াছিল বলিয়া জাপান মণিপুর ফ্রণ্টেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে যথোপযুক্ত সাহায্য পাঠাইতে পারে নাই। এ কারণে তাহাদের অগ্রগতি মন্থর হইয়া পড়িতে থাকে। উল্লেখ করা যাইতে পারে, আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নিজস্ব কোন বিমান বহর ছিল না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, জাপ-সাহায্যপুষ্ট আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মোকাবিলার জন্য মিত্রশক্তি ভারতীয়দের পরিবর্তে বৃটিশ, ক্যানাডীয়, মার্কিন ও অস্ট্রেলীয় সৈন্য অত্যধিক সংখ্যায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। কেননা ভারতীয় সৈন্যদের সম্পর্কে তাঁহাদের এই সন্দেহ ছিল যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুখোমুখি হইলেই, ইহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে, এই সন্দেহ একেবারে অমূলক ছিল না।

বিপর্যয়ের সূচনা

প্রকৃতি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এই বৎসর বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। প্রবল বর্ষাজনিত প্লাবিত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা আর সম্ভবপর

হয় না। ফলে বার্মা হইতে স্থলপথের ন্যায় বিমান পথেও সাহায্য প্রাপ্তির শেষ সম্ভাবনা এবং আশা লোপ পায়। রসদপত্রের অভাবে সৈন্যবাহিনী অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু এভাবে দীর্ঘকাল শত্রুর মোকাবেলা করা অসম্ভব মনে করিয়া অবশেষে তাহারা পশ্চাদাপসরণই শ্রেয় মনে করে। স্থির হইল, বর্ষার পর আবার নূতনভাবে আক্রমণ শুরু করা হইবে। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে নাই। পশ্চাদপসরণ পরাজয়ে এবং পরাজয় আত্মসমর্পণে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

এদিকে মিত্রশক্তির আক্রমণে জাপান দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। বার্মার উপর মিত্রশক্তির ক্রমবর্ধমান বিমান আক্রমণ তাহারা কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছিল না। তদুপরি ইতিমধ্যে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্য উত্তর-পশ্চিম বার্মার কয়েকটি এলাকা দখলপূর্বক রেঙ্গুনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা রেঙ্গুনের নিকটবর্তী হইলে সকলের পীড়াপীড়িতে সুভাষ বসু তাঁহার সদর দফতর গুটাইয়া লইয়া ২৪শে এপ্রিল ব্যাঙ্কক চলিয়া যান। তথা হইতে তিনি সিঙ্গাপুর গমন করেন। ইহার কয়েক দিন পর জার্মানীর পতন ঘটে।

ইউরোপের যুদ্ধ নিজেদের অনুকূলে সমাপ্ত করিয়া লইয়া মিত্রশক্তি তাহাদের সমস্ত সৈন্য ও রণসম্ভার নিয়োগ করিলেন জাপানের বিরুদ্ধে। মিত্রশক্তির সমবেত চাপে জাপান ক্রমশঃ হটিয়া যাইতে লাগিল। ইহার মাত্র তিন মাস পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা বর্ষিত হয়। এই দুইটি বোমার আঘাতে নিমেষের মধ্যে উপরোক্ত শহর দুইটি লক্ষাধিক লোকসহ ধ্বংস হইয়া যায়। জীবিতদের মধ্যে পরে আরও লক্ষাধিক মৃত্যুবরণ করে। প্রতিরোধ নিরর্থক মনে করিয়া জাপ-সম্রাট সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। তাঁহারা সুভাষ বসুকে মাঞ্চুকুয় রুশ সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিয়া বলেন, তাঁহারা নিজেদের বিমানপোতে তাঁহাকে তথায় পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত আছেন। তদনুসারে সুভাস বসু তাঁহার কয়েক জন সহকর্মী ও অজ্ঞাত সংখ্যক জাপ-সামরিক অফিসার সহ সিঙ্গাপুর হইতে বিমানযোগে ব্যাঙ্ককে পৌঁছেন। তিনি ১৮ই আগস্ট কর্ণেল হবিবুর রহমান সহ তথা হইতে একখানি বিমানে টোকিও যাত্রা করেন। টোকিওর

পথে বিমানখানি ফরমোজা দ্বীপের তাইহোকু বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করে। সেস্থান হইতে যাত্রার পর বিমানের ইঞ্জিন বিকল হইয়া পড়ে এবং ইহা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়।

অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সুভাষ বসুকে তাড়াতাড়ি স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কয়েক ঘণ্টা পর সেস্থানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। কর্ণেল হবিবুর রহমান কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন। এরূপে দূরদেশে এবং এক অতি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী, নব্য ভারতের আদর্শ ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। যথাসময় জাপ-সরকার কর্তৃক তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত এবং তাঁহার এডিকং কর্ণেল হাবিবুর রহমান কর্তৃক সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গদেশে তাঁহার মতানুসারী ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীবৃন্দ এই বলিয়া তাঁহাকে জীয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা—তিনি আত্ম গোপনে আছেন। কিন্তু পর পর কয়েকটি তদন্ত কমিটি তাঁহার মৃত্যুর সত্যতা দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন।

লাল কেল্লার বিচার

জাপানের আত্মসমর্পণের পর আজাদ হিন্দ্ ফৌজও আনুষ্ঠানিকভাবে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ বৃটিশ সরকার আজাদ্ হিন্দ ফৌজের কতিপয় বিশিষ্ট সেনানীকে সামরিক আদালতে বিচারের জন্য ইতিহাসখ্যাত দিল্লীর লালকেল্লায় উপস্থিত করেন। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাঁহাদের বিচার শুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলীর কথা তাহাদের দেশবাসীরা সর্বপ্রথম সবিস্তার জানিতে পারে। ইহার পর ভারতে এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া উঠে। বৃটিশ সরকার তবুও ইহাদের বিচারকার্য চালাইয়া যাইতে থাকেন। প্রতিবাদ ফলপ্রসূ না হওয়ায় কংগ্রেস ইহাদের সাহায্যের জন্য একটি কমিটি গঠনপূর্বক কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা এবং বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রী ভুলাভাই দেশাইকে প্রধান কৌঁসুলী

নিযুক্ত করেন। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, ব্যারিস্টার জনাব আসফ আলি, ডঃ কৈলাস নাথ কাট্‌জু প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট আইনজীবিগণ শ্রী ভুলাভাই দেশাইকে সাহায্য করিতে থাকেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ প্রমাণিত হইল না বটে, তবে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সেনাবাহিনী ত্যাগ ইত্যাদি অভিযোগে ইঁহাদের অনেকের শাস্তি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মুক্তির জন্য ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণ দেশব্যাপী এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তোলে। বৃটিশ সরকার ইহাতে ভীত হইয়া ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া পান না।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্যাপ্টেন রশিদ আলির শাস্তির প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র ভারতে 'রশিদ আলি দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। সে উপলক্ষে বিভিন্ন শহরে পুলিশের সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষ বাধে। তন্মধ্যে কলিকাতার গণবিক্ষোভ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। এই স্থানে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠিচার্জ, গুলীবর্ষণ পর্যন্ত কিছুই বাদ রাখে নাই। রশিদ আলি দিবসে কলিকাতার মুসলমান ছাত্রীরাও যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ছাত্রনেতা জনাব আবদুল ওয়াসেক এবং গ্রন্থকার একই সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠিচার্জের শিকার হইয়াছিলেন।

'রশিদ আলি দিবস' হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষণকালের জন্য আর একবার ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ইহার সুযোগ গ্রহণের জন্য আগাইয়া আসেন নাই। উল্লেখ করা যাইতে পারে, রশিদ আলির অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার মামলা পরিচালনার জন্য মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন এবং কতিপয় আইনজীবী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটি ও আইনজীবিগণ ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দীন, ক্যাপ্টেন এহসান কাদির প্রমুখ আরও কতিপয়

অভিযুক্ত অফিসারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের দরুন, আজাদ হিন্দ ফৌজের দণ্ডিত ব্যক্তিগণও কিছু দিন পর মুক্তি লাভ করেন। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে ইহাদের স্থান হয় নাই বটে, তবে ইহাদের অনেকে যোগ্যতানুসারে বেসামরিক পদে নিযুক্ত হন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় মহাসমরের পর

লাহোরে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য প্রস্তাবাকারে দুইটি স্বতন্ত্র এলাকার দাবী আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপনের পর ক্রীপ্‌স প্রস্তাব গ্রহণে লীগ কর্তৃপক্ষের অসম্মতি জ্ঞাপন ছাড়া মুসলিম লীগ সম্পর্কে আর কিছু বলা হয় নাই। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য কোন কার্যসূচী গ্রহণের পূর্বেই মুসলিম লীগের দুর্গ হিসাবে বিবেচিত বাংলায় মুসলিম লীগে ফাটল ধরিয়া যায়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা হিসাবে আইন পরিষদে প্রবেশের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে জনাব এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগ, তফশিলী সদস্য এবং কিছু সংখ্যক অ-কংগ্রেসী হিন্দু সদস্যের সহযোগিতায় প্রদেশের সর্বপ্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতঃ পরে কৃষক প্রজা পার্টির কতিপয় সদস্যসহ তিনি নিজেও মুসলিম লীগ দলে যোগদান করেন। ইহার কিছুদিন পর তিনি প্রাদেশিক লীগের সভাপতির পদও গ্রহণ করেন। ইহার ফলে কৃষক-প্রজাদলে ভাঙ্গন ধরে এবং দুইটি উপদল গঠিত হয়।

ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মতামত গ্রহণ ব্যতিরেকে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় মহাসমরে জড়িত করিবার প্রতিবাদে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর যুদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদারের জন্য বড়লাট তাঁহার নেতৃত্বে একটি সমর পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়, প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিগণ পদাধিকার বলে সমর পরিষদের সদস্য থাকিবেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণকে অ-কংগ্রেসীদের সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দানের জন্য লীগ কর্তৃপক্ষ বড়লাটের নিকট সে সময় এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসীদের

আরও অসন্তুষ্টির ভয়ে বড়লাট লীগ কর্তৃপক্ষের উক্ত প্রস্তাবে কোন সাড়া দেন নাই। এ কারণে লীগ কর্তৃপক্ষ বড়লাটের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষের মাত্র চারিটি প্রদেশে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। তন্মধ্যে বাংলার লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ছাড়া অপর কোনটিরই উপর লীগ কর্তৃপক্ষ মোটেই নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না।

আসামে স্যার সাদুল্লাহ কংগ্রেসীদের অনুপস্থিতিতে যে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন, তাহা ইউরোপীয় সদস্যগণের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হইয়া পরিষদে উপর্যুপরি অর্ধ ডজনবার ভোটে পরাজিত হইয়াও তাহাদের সমর্থনে কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। স্যার সাদুল্লাহ কোন সময় মুসলিম লীগের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন না। পাঞ্জাবে ছিল স্যার সিকান্দার হায়াতের ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভা। স্যার ফজলী হোসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইহা একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সদস্য লইয়া গঠিত ছিল এবং তাঁহারা ছিলেন বড় বড় ভূস্বামী অথবা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তি। মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশের সরাসরি ব্যতিক্রমে স্যার সিকান্দর ইউনিয়নিস্ট পার্টির অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ও নীতি বজায় রাখিয়া চলিতেছিলেন। অবশ্য পরে তিনি কতিপয় অনুচর সহ লীগ দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভার লীগ কোয়ালিশন নামকরণ করিতে তিনি শেষ পর্যন্তও রাজী হন নাই। কেন্দ্রীয় লীগ বহুবার তাহাকে শাসাইয়াছেন, কিন্তু শাসন করিতে পারেন নাই।

কংগ্রেস-সমর্থিত সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাহ্ বখ্‌শের হত্যার পর মুসলিম লীগ পার্টিই তথায় দ্বিতীয়বার লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু উহার স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে অতি বড় জ্যোতিষীর পক্ষেও কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা নিরাপদ ছিল না। ভোটযুদ্ধে জয়লাভের জন্যই অনেকে লীগ পার্টিতে যোগদান করিতেন,—মুসলিম লীগের আদর্শ রূপায়ন কিম্বা উহার আদেশ-নির্দেশ পালনের জন্য নয়। পরিষদের লীগ দলীয় প্রায় প্রত্যেক সদস্যই মনে করিতেন, প্রধান মন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। কাহারও সত্যিকারের কোন সমর্থক বা অনুচর ছিল না।

রোপ্যচাক্কিই ছিল যোগ্যতার একমাত্র না হইলেও, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির সদস্যগণের ন্যায় সিন্ধুর লীগ দলীয় সদস্যগণেরও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোন চরিত্র থাকিত না। অনেকেরই অতীত বলিতেও কিছু ছিল না। নিরক্ষর প্রজাদের নিকট হইতে ছলে, বলে, কৌশলে আদায়কৃত ভোটের সাহায্যে নিজেদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের উদ্দেশ্যে ইহারা পরিষদের সদস্য হইতেন।

ইহা জানিয়াও লীগ কর্তৃপক্ষ এই চারিজন প্রধান মন্ত্রীকে বড়লাটের প্রস্তাবিত সমর পরিষদে যোগদান হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেন। স্যার সিকান্দার লীগ কর্তৃপক্ষকে উত্তরে জানাইয়া দেন, সমর পরিষদে যোগদান হইতে বিরত থাকিলেও তিনি যুদ্ধোদ্যমে বৃটিশ সরকারের সহিত পুরোপুরিভাবে সহযোগিতা করিবেন। কারণ, যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে বৃটিশ সরকার তাঁহার প্রদেশের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল। তা'ছাড়া সৈন্য বিভাগে পাঞ্জাবীদের স্বার্থে তিনি কোনও অবস্থায় বৃটিশ সরকারকে এ সময় বিব্রত করিতে চাহেন না। লীগের নির্দেশ মানিয়া লইতে হইলে তাহাকে ইউনিয়নিস্ট পার্টি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং সেই অবস্থায় মুসলিম লীগ বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবে না এবং লীগ কোন দিক দিয়া লাভবান হইবে না।

ফজলুল হকের বিরোধিতা

অপর দুইজন প্রধান মন্ত্রী যখন কি করিবেন কি বলিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, সেই সময় সদা ভাবপ্রবণ সুতরাং অপরিণামদর্শী জনাব ফজলুল হক এই ব্যাপার লইয়া লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত লীগ হইতে পদত্যাগ ও বহিষ্কারে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। বহিষ্কারের পর জনাব ফজলুল হক প্রোগ্রেসিভ লীগ পার্টি গঠন করিয়া মুসলিম লীগের মোকাবিলা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। এই বিতর্কে জনাব ফজলুল হক লীগ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমন কতিপয় অভিযোগ আনয়ন করেন যাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও, মূল বিরোধের সহিত উহার গৌণ সম্পর্কও ছিল না। এদিকে এ সকল কোন্দল দর্শনে ভাইসরয় তাঁহার মতের পরিবর্তন করিয়া সমর

পরিষদ গঠন হইতে বিরত থাকেন। ইহার ফলে স্যার সিকান্দরের মর্যাদা বৃটিশ সরকারের নিকট বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, লীগ কর্তৃপক্ষ অকারণে জনাব ফজলুল হককে হারান এবং জনাব ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা সাংঘাতিক-ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

জনাব ফজলুল হকের ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন জনপ্রিয় নেতা এবং তৎসঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্যের লীগ দল ত্যাগের দরুন প্রাদেশিক লীগ দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মন্ত্রিসভার উপরও যে লীগ কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না, ইহা এই সময় নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। এই পরিস্থিতির জন্য সম্ভবতঃ লীগ কর্তৃপক্ষ মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী জনমত গড়িয়া তোলার প্রারম্ভিক প্রস্তুতি হিসাবে জনাব জিন্নাহর সভাপতিত্বে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক লীগের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বয়সকাল তখন মাত্র তিন মাস।

এই অধিবেশনের পর হইতে তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আন্দোলন এমন জোরদার হইয়া উঠে যে, জনাব ফজলুল হক তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও ইহার মোকাবিলা করিতে পারেন নাই। ইহার মাত্র ষোল মাস পর বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখে তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা হিসাবে খাজা স্যার নাজিম উদ্দীন অতঃপর প্রদেশের দ্বিতীয় লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, জনাব ফজলুল হকের বিরোধিতা করিতে না হইলে বাংলা দেশে মুসলিম লীগ একটি পকেট সংস্থা হিসাবেই থাকিয়া যাইত। তেমন এক অবস্থায় মুসলিম সংখ্যাগুরু অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এই প্রদেশেরও পূর্ণ সমর্থন কায়েদে আজম জিন্নাহ লাভ করিতেন কিনা তাহা খুব সন্দেহের বিষয়।

জনাব ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার আমলে বাংলার উপর তিনটি অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছিল। জাপানীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মনিপুর ও কক্সবাজার সীমান্তে হাজার হাজার সৈন্য, রসদপত্র, ভারী ও হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইতে থাকায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভীষণ

চাপ পড়ে। ইহার ফলে যাত্রী সাধারণ এবং ব্যবসায়ী মহল দারুণ অসুবিধায় পতিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আগস্ট বিপ্লবের দরুন বাংলার কয়েকটি জেলায় পুলিশ ও সৈন্যদের জুলুমে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট জেলার জনসাধারণের নিরাপত্তাবোধ প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বিধাতাও যেন সে সময় এই প্রদেশের উপর হঠাৎ অপ্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে মেদিনীপুর জেলা এবং আরও কতিপয় এলাকার শস্য, গবাদি পশু ও বেশ কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ছাড়াও, অগণিত বাড়ীঘর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার উপদ্রুত এলাকায় সে সময় যদি গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে অনাহারে কতলোক যে প্রাণ হারাইত, তাহা অনুমানেরও উর্ধে। উল্লেখ্য যে এই গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির অবসানের পূর্বেই স্যার নাজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে এবং তফশিলী ও বর্ণহিন্দু কিছু সংখ্যক সদস্যের সমর্থন এবং সহ-যোগীতায় লীগ-কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গদীতে সমাসীন হন। ইহা কয়েক-মাস পরেই বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছাড়া এইরূপ খাদ্যাভাব এই প্রদেশে আর কখনও ঘটে নাই। ইহার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী বৃটিশ সরকার এবং গদীলোভী ফজলুল হক মন্ত্রি-সভা। জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এই প্রদেশে লক্ষ লক্ষ সৈন্য আনীত হয়। অথচ বাহির হইতে তাহাদের প্রয়োজন অনুরূপ রসদ না আনিয়া স্থানীয়ভাবে উহা সংগৃহীত হইতে থাকে। একে ইহা ছিল একটি ঘাটতি প্রদেশ, তদুপরি ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এবং আগস্ট বিপ্লবের সময় পুলিশ ও সৈন্যদের দৌরাত্মে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রেফতার ও অত্যাচারের ভয়ে হাজার হাজার কৃষক চাষাবাদের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আত্মগোপন করায় উৎপাদনের পরিমাণ বেশ হ্রাস পাইয়াছিল।

জাপানীদের হাতে পড়িতে পারে আশঙ্কা করিয়া সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার নৌকা, যান-বাহন ইত্যাদি ছিনাইয়া লইয়া তাহাদের উপার্জনের পথও বিঘ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইত্যাকার আরও কতিপয় কারণে জনাব ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের আমলেই খাদ্যসঙ্কট অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়ে। এ কারণে জনসাধারণের এক বিরাট অংশের অনাস্থা-ভাজন এবং পরিস্থিতির মোকাবিলায় অসমর্থ মন্ত্রিসভাকে গভর্ণর পদত্যাগে বাধ্য করেন। ইহা জানিয়া শুনিয়া স্যার নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। এই কারণে দুর্ভিক্ষের জন্য জনসাধারণ সঙ্গতভাবে তাঁহাকেও দায়ী করিয়া থাকে। বেসরকারী হিসাবে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে এই দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ এবং সরকার নিয়োজিত উডহেড কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ১৫ লক্ষ নরনারীর প্রাণহানি ঘটে। পরে রোগে-শোকে আরও প্রায় ৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।

যুদ্ধ পরিস্থিতির অজুহাতে সংবাদ প্রকাশের উপর নানা বাধানিষেধ আরোপিত থাকায় কোন সংবাদপত্রের পক্ষে যানবাহনের অভাবে নিয়মিত খাদ্যশস্য সরবরাহে অব্যবস্থাজনিত প্রদেশে খাদ্য পরিস্থিতির ক্রমাবনতির সংবাদ প্রকাশ করা বহুদিন সম্ভবপর হয় নাই। কলিকাতার ফুটপাতের উপর যখন প্রত্যহ বহু কঙ্কালসার নরনারীর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইতে থাকে, তখন শ্বেতাঙ্গদের মুখপত্র স্টেট্সম্যান পত্রিকা সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া দুর্ভিক্ষের সংবাদ ও ছবি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই মানবতাবোধের জন্য স্টেট্সম্যান পত্রিকা সে সময় সমগ্র ভারতের যে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা এদেশে নাই। স্টেট্সম্যান পত্রিকার অনুকরণে অতঃপর অন্যান্য সংবাদপত্রেও দুর্ভিক্ষের সংবাদ এবং ছবি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তখন হইতে সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সত্যিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৎপূর্বেই বহু লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটায় জনসাধারণের মন নাজিম মন্ত্রিসভার প্রতি বিক্ষুব্ধ থাকে। পক্ষান্তরে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বাধ্যতামূলক গদী ত্যাগ তাঁহার জন্য শাপে বর প্রতিপন্ন হয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

নূতন করিয়া আবার আগস্ট বিপ্লবের ন্যায় একটি গণ-অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করিতে হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বৃটিশ সরকার আগস্ট বিপ্লবের সময় কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও তৎসঙ্গে ধৃত হাজার হাজার কর্মীকে এই সময় বিনা শর্তে ছাড়িয়া দেন। মুক্তির পর ইঁহাদের অনেকে দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এদিকে কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিশেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির পর লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আবার একটা আপোষের কথা উঠে। দেশের প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্র আপোষ-মীমাংসা সম্পর্কে জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। কারাগারে অবস্থান-কালে মহাত্মা গান্ধীর পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পর তাঁহার বিশ্বস্ত সেক্রেটারী শ্রী মহাদেব দেশাইর মৃত্যু হয়। এই মানসিক বেদনার উপশম না হইতেই তিনি কায়েদে আজম (কাথিয়াবার মুসলিম বণিক সমিতি কর্তৃক সর্বপ্রথম উচ্চারিত উপাধি) জিন্নাহ্‌র সহিত আপোষ-মীমাংসা আলোচনার জন্য বোম্বাই গমন করেন।

মালাবার হীলে অবস্থিত কায়েদে আজমের বাসভবনে উভয়ের মধ্যে গোপন আলোচনা চলিতে থাকে। আলোচনার অগ্রগতি ও ফলাফল জানিবার জন্য সে সময় সমগ্র দেশ উৎসাহ, উদ্বেগ এবং সংশয়জনিত ব্যাকু-লতার সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বোম্বাই গমন করিয়াছিলেন। আলোচনা শেষে একটি যুক্ত বিবৃতিতে যখন জানান হয়, তাঁহারা কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, তখন সমগ্র দেশের উপর বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া নামিয়া আসে।

বলা অনাবশ্যক, কায়েদে আজম অন্য কিছুরই বিনিময়ে পাকিস্তানের দাবী ত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় আপোষের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতিতেও আপোষ-মীমাংসার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ায়, ইহা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া পড়ে যে, জোর-ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের উপর একটা সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেওয়া না হইলে এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান সুদূর পরাহত।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে, সাম্প্রদায়িক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য ১৯২৮ সালে কলিকাতায় আহূত সর্বদল সম্মেলন ছাড়াও ১৯৩১ এবং ১৯৩৩ সালে মওলানা শওকত আলির উদ্যোগে এলাহাবাদে দুইবার ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনটিই উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত আরও একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা স্মরণযোগ্য। ১৯৪৪ সালে যখন কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের একমাত্র শ্রী ভুলাভাই দেশাই ছাড়া অপরাপর সকলে কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস পার্টির নেতা হিসাবে ইনি লীগ সেক্রেটারী জনাব লিয়াকত আলি খানের সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর জ্ঞাতসারে এই আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। তত্রাচ এই অপরাধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ শ্রী ভুলাভাই দেশাইর উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁহাকে কংগ্রেস টিকেট পর্যন্ত দেওয়া হয় না। দুঃখ ও ক্ষোভে তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙিয়া পড়ে এবং মাত্র কিছু দিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাধারণতঃ মওলানা মোহাম্মদ আলির ঐক্য ফর্মুলা এবং সি. আর. ফর্মুলাকে ভিত্তি করিয়া দেশাই লিয়াকত আলোচনা চলিয়াছিল। ইহার ব্যর্থতার জন্য এককভাবে কংগ্রেসই দায়ী।

সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং আরও কতিপয় রাজনৈতিক সংস্থা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ হয়। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনসমূহের অধিকাংশ লীগ-মনোনীত প্রার্থিগণ পান। প্রাদেশিক পরিষদগুলির মোট ৪৯২টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ মনোনীত প্রার্থিগণ ৪২৮টি আসনে জয়ী হন। নির্বাচনের পর লীগ পার্টিতে যোগদানকারী কতিপয় সুযোগ-সন্ধানী সদস্যসহ ইঁহারাই জনাব জিন্নাহর নির্দেশে দিল্লীতে একটি কনভেনশনে সমবেত হইয়া সে সময় ভারতে উপস্থিত মন্ত্রী

মিশনকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে লাহোর প্রস্তাবের সরাসরি বরখেলাপ এবং লীগ গঠনতন্ত্র বিরোধী এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, পাকিস্তান একক ইউনিট সম্পন্ন রাষ্ট্র হইবে।

নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বোম্বাই মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এবং বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পাঞ্জাবে মুসলিম আসনগুলির বেশীর ভাগ লীগ-মনোনীত প্রার্থিগণই লাভ করিয়াছিলেন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলেও দল হিসাবে তাঁহারা ছিলেন পরিষদে সর্ববৃহৎ দল। এই অবস্থায় পার্লামেণ্টারী রীতিনীতি অনুসারে গভর্ণর লীগ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাইবেন, ইহাই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের চাপে তিনি তাহা না করিয়া ইউনিয়নিস্ট দলের নেতা স্যার খিজির হায়াত খান তিওয়ানাকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেন। স্যার খিজির অন্যান্য অ-কংগ্রেসী ও নির্দলীয় সদস্যগণের সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তাহা শেষ পর্যন্তও পাকিস্তান দাবীর তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এজন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ন্যায় স্যার খিজিরের মন্ত্রিসভাকেও বরখাস্ত করিয়া দিতে হয়। পাকিস্তানের জন্য মুসলিম সংখ্যাগুরু সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের দানের পরিমাণ ইহা হইতে সহজে অনুমিত হইতে পারে।

নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে ছিলেন জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম এবং হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও যুব কর্মী। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা হিসাবে জনাব ফজলুল হক অতি অল্প কয়জন সমর্থক সহ নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া পরিষদের বাহিরের ন্যায় পরিষদের ভিতরেও লীগের সফল বিরোধিতার ক্ষমতা তাঁহার আর ছিল না। স্যার নাজিম উদ্দীন নির্বাচনে প্রার্থী হন নাই। দলীয় কোন্দলে কংগ্রেস দলও অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলিম লীগের নির্দেশে বাংলার জনসাধারণ যোগ্য-অযোগ্য নির্বিচারে লীগ-মনোনীত প্রার্থিগণকে ভোট দিয়াছিলেন বলিয়া ইহা 'ল্যাম্প পোস্ট' ইলেক্শন নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী দলের নির্বাচিত নেতা হিসাবে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে জনাব হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী নির্ভয়ে তাই বাংলায় নূতন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। জনাব নূরুল আমিন হন পরিষদের স্পীকার।

নৌ-বিদ্রোহ

প্রদেশসমূহে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত না হইতেই বোম্বাই বন্দরে সর্বপ্রথম নৌ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। এদেশে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার উপর ইহাই সম্মিলিত ভারতবাসীদের সর্বশেষ আঘাত। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কর্তৃক ভারত সীমান্ত আক্রমণ এবং আগস্ট বিপ্লবের কথা বাদ দিলে সিপাহী বিদ্রোহের পর এদেশে বৃটিশ সরকারকে এরূপ একটি জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন আর হইতে হয় নাই। বস্তুতঃ এই তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুক্তভাবে বহুলাংশে দায়ী।

প্রয়োজনের তাগিদে বৃটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদাংক অনুসরণে ভারতবর্ষের অল্প কয়টি এলাকা হইতে তাঁহাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলির জন্য লোকজন সংগ্রহ করিতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর, আত্মমর্যাদা-বোধহীন দরিদ্র লোকজনই সশস্ত্র বাহিনীতে গৃহীত হইত। কারণ, বিদেশী সরকারের নিকট ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই ব্যবস্থা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রবর্তিত হয় এবং প্রায় দেড়শত বৎসর চালু থাকে। কিন্তু প্রথম মহাসমরের সময় হইতে ভারতবর্ষের অভিজাত, অস্বচ্ছল অথবা বৃটিশ অনুগ্রহাশ্রিত কিম্বা অহেতুক ভক্ত ব্যক্তিগণের সন্তানদিগকে সামরিক বিভাগের কোন কোন অফিসারের পদে গ্রহণ করার নীতি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ইহাদের প্রতিও তাঁহারা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে থাকেন। মৌখিক প্রতিবাদে যেমন কোন ফল হইত না তেমনি প্রতিকারেরও কোন উপায় না থাকায় অসহায় ভারতীয় সৈন্য এবং অফিসারগণ নীরবে উহা সহ্য করিতেন। দ্বিতীয় মহাসমরে অনুরূপ অথচ ততোধিক প্রয়োজনের তাগিদে ভারতীয়দিগকে আরও অধিক সংখ্যায় সামরিক বিভাগে গ্রহণ করা হয়।

মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে উহার দুর্ধর্ষ সৈন্যদের অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য বহু ভারতীয় সৈন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। কিন্তু জাপানী সৈন্যদের নিকট ক্রমাগত পরাজিত হইয়া বৃটিশ সৈন্যরা যখন উত্তর দিকে পলায়ন করিতে থাকে, তখন ভারতীয় সৈন্যদিগকে অনুরূপ সুযোগ না দিয়া নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে পশ্চাতের সামরিক ঘাঁটিগুলি আগলাইয়া রাখার জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখা হইত। সমস্ত বৃটিশ সৈন্যদের নিরাপত্তার বিধান করিতে গিয়া এইরূপে বহু সাহসী ভারতীয় সৈন্যকে জাপানীদের কামানের শিকার হইতে হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম কয় মাসেই একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে বিনা রসদপত্রে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য পরিত্যক্ত হয়। ইহারা তখন উপলব্ধি করিতে পারে, বৃটিশ সরকারের নিকট পরাধীন ভারতীয় সৈন্যদের না আছে কোন মর্যাদা, না আছে তাহাদের প্রাণের কোন দাম। এই সত্যটি উপলব্ধি হওয়ার পর হইতে ভারতকে বৃটিশের শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য তাহারাও ব্যগ্র হইয়া উঠে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন এই উপলব্ধির বাস্তব প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

নৌ-বাহিনীর লোকজনেরও বহু অভাব-অভিযোগ ছিল। তাহাদিগকেও ইংরেজদের তুলনায় নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইত। মাহিনাও ছিল তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম অথচ অধিক পরিশ্রমের কাজগুলি তাহাদিগকেই করিতে দেওয়া হইত। যুদ্ধাবসানে যখন নির্বিচারে ভারতীয়দিগকে নৌ-বিভাগ হইতে ছাঁটাইর উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন এই অসন্তোষ তীব্রতর হইয়া উঠে। ভারতীয় নৌবহরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ভাইস্-এড্‌মিরাল গড্‌ফ্রে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নৌবহরের 'তলোয়ার' নামক একখানি জাহাজ পরিদর্শনে গমন করিলে, উক্ত জাহাজের টেলিগ্রাফিস্ট শ্রী পি. সি. দত্ত তাঁহার কতিপয় মুসলমান সহকর্মীসহ উহার গায়ে 'ভারত ছাড়', 'জয় হিন্দ্', 'বৃটিশ বরবাদ' প্রভৃতি শ্লোগান লিখিয়া দেন। এই অপরাধে তাঁহারা গ্রেফতার এবং নির্যাতিত হন। ইহার প্রতিবাদে 'তলোয়ার' জাহাজের প্রায় ১১ শত নৌবিদ্যা শিক্ষার্থী ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ধর্মঘট শুরু করে।

বৃটিশ সরকার ধর্মঘটী নৌ-শিক্ষার্থীদের অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান কিম্বা তাহা নিবারণের কোন চেষ্টাই করিলেন না। উপরন্তু তাহাদিগকে শাস্তি

প্রদানের চিন্তায় প্রবৃত্ত রহিলেন। ইহা দেখিয়া 'কলাবতী', 'আউধ' 'নিলাস', 'নাসিক', 'ফিরোজ', 'মাসলিমার, 'আকবর' প্রভৃতি জাহাজের শিক্ষার্থী ও লোকজনেরা ধর্মঘটে যোগদান করে। অতঃপর বোম্বাই ডকের শ্রমিকরাও আসিয়া ইহাদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এইরূপে দুই দিনের মধ্যে ধর্মঘটীদের সংখ্যা কুড়ি হাজারে গিয়া দাঁড়ায়। তখন তাহারা আর জনসাধারণের ন্যায় অহিংস থাকিতে পারিল না। শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সৈনিক ও পুলিশ অফিসার প্রকাশ্য স্থানে প্রহৃত হইতে লাগিলেন। কোন কোন স্থানে ইউরোপীয়দের দোকানপাটও আক্রান্ত হইতে থাকে। ধর্মঘটের চতুর্থ দিবসে বোম্বাইয়ে অবস্থিত নৌ-বহরের প্রায় সব কয়টি জাহাজ ধর্মঘটীদের কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যায়। নৌ-অধ্যক্ষের জাহাজ 'নর্মদা'র উপরেও কংগ্রেস এবং লীগের পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকে। তবে ধর্মঘটীরা তাঁহার কিম্বা অন্যান্য ইংরেজ অফিসারগণের কোন ক্ষতি করে না।

বিদ্রোহের বিস্তৃতি

ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য বোম্বাইয়ের জনসাধারণ গিরগাঁও এবং কলবাদেবী অঞ্চলে ট্রাম ও বাসে আগুন ধরাইয়া এবং সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসের জিনিসপত্র লুঠ করিয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর পুলিশ ও মিলিটারীর সহিত লড়াই করিবার জন্য বহু জায়গায় ব্যারিকেড্ রচিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের ঘন ঘন সংঘর্ষ হইতে থাকে। এই সময় করাচীতে 'হিন্দুস্থান', 'চমন' প্রভৃতি জাহাজ নোঙ্গরে ছিল। যথাসময়ে এ সকল জাহাজের লোকজনেরাও ধর্মঘটে যোগ দেয়। বোম্বাইয়ের ন্যায় এ স্থানেও মিলিটারী ও পুলিশের সহিত ইহাদের ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। 'হিন্দুস্থান' স্বীয় কামান হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া মিলিটারী পুলিশের আক্রমণ কয়েকবার প্রতিহত করে। সর্বশেষে কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত বেহালা-মাঝের হাট প্রভৃতি শিবিরের নৌ-শিক্ষার্থী ও সৈন্যগণ এবং মাদ্রাজে অবস্থিত 'আদিয়ার' নামক যুদ্ধ-জাহাজের লোকজনেরাও ধর্মঘটে যোগদান করে।

নৌ-বহরের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছা মাত্রই তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী ঘোষণা করেন, ভারতকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিবার জন্য শীঘ্রই একটি মন্ত্রীমিশন তথায় প্রেরিত হইতেছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই কথায় নৌ-বিদ্রোহীরা কিন্তু তাহাদের দাবী-দাওয়ার এক চুল পরিমাণও ত্যাগ করিতে রাজী হইল না। উপরন্তু তাহারা মিঃ এট্‌লীর ঘোষণাকে একটি রাজনৈতিক টোপ মনে করিয়া লইয়া ধর্মঘট অব্যাহত রাখে। একুশে ফেব্রুয়ারী মিঃ এট্‌লী কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান, অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বহরের কয়েকখানি রণপোত প্রচুর সৈন্যসহ ভারতাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। এদিকে ভাইস-এড্‌মিরাল গডফ্রে সেই দিন বোম্বাই বেতার-কেন্দ্র হইতে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তাহাদিগকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই প্রতিশ্রুতিও দান করেন, তাহাদের অভাব-অভিযোগের তদন্ত করা হইবে এবং ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইলে যথাশীঘ্র তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা হইবে। উপসংহারে তিনি এই মর্মে এক সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন যে, বিদ্রোহ দমনের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে বৃটিশ সরকার গোটা ভারতীয় নৌ-বহরকে ধ্বংস করিয়া দিতে মোটেই দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। এই দুইটি ঘোষণার দরুন পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হইয়া পড়ে।

সেই রাত্রিতে নৌ-বহরের শ্বেতাঙ্গদের একটি দল বন্দর এলাকায় পাহারা দিতে যায়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকখানি জঙ্গী এবং বোমারু বিমান সারারাত্রি উক্ত এলাকায় পর্যবেক্ষণ চালায়। এই অবস্থায় মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলীও বিনিময় হয়। প্রাতে এ সংবাদ প্রচারিত হইলে জনসাধারণ ভয়ানক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ফলে উত্তেজিত জনতার সহিত কয়েক স্থানে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। জনতা সে সময় বহু সামরিক লরী জ্বালাইয়া দেয়, ১০টি রেশন দোকান, ১২টি ছোট বড় ডাকঘর এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা-অফিস আক্রমণপূর্বক উহা লুঠ করে। ইহা ছাড়া অন্যভাবেও তাহারা সরকারের বিস্তর ক্ষতিসাধন করে। পুলিশের গুলী বর্ষণে সেদিন ৬০ জন নিহত এবং প্রায় এক হাজার লোক আহত হয়। সরকার পক্ষে নিহতদের সংখ্যা জানা যায় নাই।

তবে তাহাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দেড়শতের কাছাকাছি ছিল বলিয়া পরে প্রকাশ পায়।

এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কলকারখানা প্রধান প্রায় প্রত্যেকটি শহরে শ্রমিক সম্প্রদায় ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। অসংখ্য কারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ হইয়া যায়। উত্তেজিত শ্রমিকদের দমনের জন্য পুলিশ বহু ক্ষেত্রে গোলাগুলীর আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না। উপরন্তু শত শত কল-কারখানায় ধ্বংসাত্মক কার্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সংগ্রামরত শ্রমিকদের সাহায্যার্থ জনসাধারণ আসিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পুলিশ ও সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইহার ফলে অনেক স্থানে অবস্থা সরকারের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে। অগত্যা বৃটিশ সরকার উপদ্রুত এলাকাসমূহে কারফিউ ও সামরিক আইন জারীর বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন।

বিদ্রোহের অবসান

বোম্বাইর এই হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হইয়া রক্তক্ষয় নিবারণের জন্য শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, শ্রীপুরুষোত্তম দাস ত্রিকমদাস প্রমুখ নেতৃবর্গ আত্মসমর্পণের জন্য বিদ্রোহীদের নিকট আবেদন জানান। এদিকে ২২শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে উভয় পক্ষে এক ভীষণ লড়াই হয়। বিদ্রোহীদের জয়ের মুহূর্তে বৃটিশ ছত্রীবাহিনী আসিয়া যুদ্ধে যোগদান করে। ইহাদের আগমনে যুদ্ধের মোড় হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া যায়। আরও কিছুক্ষণ গোলাগুলী বিনিময়ের পর 'হিন্দুস্থান' জাহাজ হইতে আত্মসমর্পণের সিগ্‌ন্যাল দেওয়া হইলে, বিদ্রোহী জাহাজগুলি একে একে আত্মসমর্পণ করে। সেই রাত্রে কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি নেতৃবর্গের আবেদন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য 'তলোয়ার' জাহাজে সমবেত হন। বৈঠকে আত্মসমর্পণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুসারে পর দিবস প্রাতে শহর এলাকায় সংগ্রামরত বিদ্রোহীরাও আত্মসমর্পণ করে। তবে আত্মসমর্পণের সময় তাহারা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেয়, তাহারা বৃটিশের কাছে নয়, বরঞ্চ ভারতীয় নেতৃবর্গের আহ্বানে জনসাধারণেরই নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে।

বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর বৃটিশ সরকার ইহার তদন্তের জন্য পাটনা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি জনাব ফজলে আলিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখার সময় বৃটিশ সরকারের আর হইয়া উঠে নাই। কারণ, তৎপূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া তাহাদিগকে সাগর পাড়ি দিতে হয়।

নৌ-বিদ্রোহ বৃটিশ সরকারকে এদেশে তাঁহাদের সর্বজননিন্দিত এবং নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার চাপে বিপন্ন অস্তিত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ করিয়া দেয়। তাঁহাদের সশস্ত্র বাহিনী দফ্‌তর নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে স্থল-বাহিনী ও নৌ-বিভাগে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, তাহা রোধ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। সুতরাং এদেশবাসীর হাতে আরও অধিক ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া মান-ইজ্জত এবং সেই সঙ্গে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ যতটা সম্ভব রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকার অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠেন। কি উপায়ে এবং কত অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্ভবপর করিয়া তোলা যায়, তাহা নিরূপণের জন্য বৃটিশ সরকার তাড়াতাড়ি তাঁহাদের প্রতিশ্রুত মন্ত্রি-সভার তিনজন বিশিষ্ট সদস্য সমবায়ে গঠিত একটি মন্ত্রী মিশন ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ পর্যায়ে জাপানের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বেই শ্রমিকদলের পীড়াপীড়িতে ইংলণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে শ্রমিক দল জয়ী হইয়া মিঃ এট্‌লীর নেতৃত্বে মহাসমরোত্তর প্রথম শ্রমিক সরকার কায়েম করেন। শ্রমিক দল বরাবরই ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে তাঁহারা কংগ্রেসকেই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন। তবু অনেকের মনে এই ধারণা জন্মে যে, তাঁহাদের মধ্যস্থতায় কংগ্রেস-লীগ দ্বন্দ্বের একটা সন্তোষজনক অবসান ঘটিবে। কাজেই মন্ত্রী মিশন নিযুক্তির ঘোষণাটি মোটামুটিভাবে সব মহল কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিল বলা চলে। তবে কেহ কেহ তাহাদের এই আশংকার কথা গোপন রাখেন নাই যে, ক্রীপ্‌স মিশনের ন্যায় ইহাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইবে। কারণ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা কম।

মন্ত্রী মিশন

নৌ-বিদ্রোহের পরিসমাপ্তির পর ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লিমেণ্ট এট্লী পার্লামেণ্টে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়, ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে কোন অবস্থায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি ব্যাহত করিতে দেওয়া হইবে না। কংগ্রেসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দাবী জানান। এই ঘোষণায় মিঃ এটলী ভারতবাসীদের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া আরও বলেন, ভারতের ভাবী শাসনব্যবস্থা কিরূপ হইবে না হইবে, তাহা ভারতবাসীরাই স্থির করিবে। ক্ষমতা যাহাতে দ্রুত ও শৃঙ্খলতার সহিত হস্তান্তরিত হয়, বৃটিশ সরকার শুধু তৎপ্রতিই লক্ষ্য রাখিবেন।

ইহার মাত্র এক সপ্তাহ পরে বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিন জন সদস্য, যথা— ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স এবং নৌ-সচিব মিঃ আলেকজাণ্ডার ভারতে আগমন করেন। ইঁহারা তিন-জনই ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী ছিলেন। এইজন্য ইহাকে ক্যাবিনেট মিশনও বলা হয়। তাঁহারা ভারতে পৌঁছার পূর্বেই মিঃ এট্লীর ঘোষণার শেষাংশের ব্যাখ্যা লইয়া ভারতের রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। মন্ত্রী মিশন উহার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন, ভারতকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার করিলে যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথায় তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবেই পরিগণিত হইবেন।

মন্ত্রী মিশনের এই কথায় লীগ মহলে উল্লাসের সঞ্চার হয়। ১৯৪৬ সালের ৩রা এপ্রিল হইতে শুরু করিয়া দেড় মাসের উর্ধকাল মন্ত্রী মিশন এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়, দল এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত দীর্ঘ এবং জোরালো আলোচনা চালাইলেন। কিন্তু অপরাপর দল ও মতের কথা দূরে থাক, এমন কি তাঁহারা কংগ্রেস ও লীগ উভয় পক্ষ-সম্মত কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে ১২ই মে বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। দেড় মাসের পরিশ্রম এরূপে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার জন্য কম বেশী কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ই দায়ী ছিল।

মন্ত্রী মিশনের উদ্দেশ্য

আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত অন্ধ দৈত্যের ন্যায় বৃটিশ জাতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাঁধে ভর করিয়া দ্বিতীয় মহাসমরে জার্মানী ও তাহার মিত্রগুলিকে পর্যুদস্তপূর্বক আপাততঃ তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষয়-ক্ষতির তুলনায় এই বিজয়ের বিশেষ কোন দাম ছিল না। যুদ্ধের কয় বৎসর সাম্রাজ্যের প্রায় সব অংশে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের অগ্রগতি, পশ্চাদপসরণ এবং শত্রুপক্ষ কর্তৃক কোন কোন অংশ অধিকারের ফলে পরাধীন জাতিগুলির হাতে বহু অস্ত্রশস্ত্র পতিত হয়। এ সকল অস্ত্রশস্ত্র অদূর ভবিষ্যতে যে তাহাদেরই উপর প্রযুক্ত হইতে পারে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, আগস্ট বিপ্লব, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি বৃটিশকে বারংবার তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

ইহার উপর ছিল তাহাদের কমিউনিজম ভীতি। পাছে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ন্যায় এশিয়ায়ও কমিউনিজম বিস্তার লাভ করিয়া ধনতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের অবসান ঘটায়, এ ভয়ে সদা শঙ্কিত যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া বৃটিশ সরকার যতটা সম্ভব তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থ হেফাজতের বিনিময়ে ভারতীয়দের হাতে অধিকতর পরিমাণে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন, মন্ত্রী মিশন ভারতে রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই এদেশে আসিয়াছিলেন। এই কারণে আলোচনা ব্যর্থ হইলেও তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন না। তাঁহারা জানাইলেন, পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে শীঘ্রই তাঁহারা এক ঘোষণা প্রকাশ করিবেন।

চারি দিন পর তাঁহাদের এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনায় মন্ত্রী মিশন মসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ভারতবর্ষ বিভাগের বিকল্পে উহাকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির জন্য ব্যাপক ক্ষমতাসম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে ইহাও বলা হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রুপ তিনটি গঠিত হওয়ার পর প্রত্যেকটি গ্রুপ উহার নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবে। তিনটি গ্রুপের সমবায়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকিবে। পরোক্ষ নির্বাচন অর্থাৎ আইন পরিষদ-

সমূহের সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা ভারত ইউনিয়নের সংবিধান পরিষদ গঠিত হইবে। গ্রুপিং ব্যবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর কোন অঙ্গ-প্রদেশ ইচ্ছা করিলে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ-পরিষদে ভোটের মাধ্যমে ইহার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে হইবে। ইহা ছাড়া মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে আরও বলা হয়, অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য কেবলমাত্র ভারতীয় সদস্য লইয়া কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করিতে হইবে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

মন্ত্রী মিশনের এই প্রস্তাবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইহা কার্যকর হইলে 'খ' এবং 'গ' গ্রুপে মুসলমানদের এবং 'ক' গ্রুপে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিত। গ্রুপগুলি নিম্নোক্তরূপে গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল : 'ক'—মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার এবং যুক্ত প্রদেশ ; 'খ'—সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান ; 'গ'—বাংলা এবং আসাম। এই ব্যবস্থানুসারে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৪ ভাগ এবং দুইটি প্রধান এবং তিনটি ক্ষুদ্র ও বসতি-বিরল প্রদেশে সংখ্যাধিক্য হইয়া মুসলমানরা তিনটি গ্রুপের দুইটিতে প্রাধান্য লাভ করিত। পক্ষান্তরে জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ হইয়াও হিন্দুরা মাত্র একটি গ্রুপে সংখ্যাধিক্য লাভ করিত। অবশ্য ইহা ঠিক যে, কেন্দ্রে মুসলমানরা পূর্ববৎ সংখ্যালঘুই থাকিয়া যাইত।

মন্ত্রী মিশন কর্তৃক মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও লীগ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৬ সালের ৬ই জুন এই চিন্তা করিয়া গ্রুপিং প্রস্তাবটি গ্রহণে সম্মত হন যে, ইহার চেয়ে উত্তম কিছু ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতিতে মন্ত্রী মিশনের নিকট হইতে আশা করা যায় না। অপর পক্ষে মন্ত্রী মিশনের এই পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রণশ্রান্ত কংগ্রেস মহলও এই ভাবিয়া আশ্বস্ত ও উল্লসিত হয় যে, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইতেছে না এবং কেন্দ্রে হিন্দুদেরই প্রাধান্য থাকিয়া যাইতেছে।

কিন্তু তাহাদের এই উল্লাস শীঘ্রই পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। কংগ্রেস মহলে ইহা লইয়া মতবিরোধ দেখা দেয়। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষিত হয়, তাহারা বাংলার সহিত গ্রুপ করিতে অনিচ্ছুক। হিন্দু-প্রধান 'ক' গ্রুপে যোগদানের অনুকুল কোন বিকল্প ব্যবস্থাও মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে ছিল না। এই কারণে আসামের এই অস্বীকৃতির দরুন এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। মাত্র কিছু দিন পূর্বে যিনি মন্ত্রী মিশনের গ্রুপিং প্রস্তাবকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা গান্ধী আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসকে উহার অসম্মতির জন্য তাঁহার বলিষ্ঠ সমর্থন যোগাইতে থাকেন। ইহার ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। বস্তুতঃ গ্রুপিং ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে গ্রহণে কংগ্রেসের অসম্মতি এবং উহার পরিণামফল হিসাবে ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাগের জন্য আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধীই অধিক দায়ী। কারণ কংগ্রেসের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতা প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিরোধিতার কারণ

প্রথমে গ্রুপিং ব্যবস্থার প্রতি কংগ্রেস মহলের সম্মতি ও উল্লাস এবং পরে বিরোধিতার কারণ স্বরূপ বলা হয়, মন্ত্রী মিশন কর্তৃক পাকিস্তান দাবী বাতিলই ছিল কংগ্রেস মহলের সম্মতি এবং উল্লাসের ভিত্তি। কিন্তু পরে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন, ভারতবর্ষের জনসংখ্যার চারি ভাগের তিন ভাগ হইয়াও তাহারা একটি মাত্র গ্রুপে সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে যাইতেছেন, তখনই তাহাদের মধ্যে মুসলিম আতঙ্ক প্রবল হইয়া উঠে। তদুপরি কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার ক্ষমতা অঙ্গ প্রদেশকে প্রদানের প্রস্তাব থাকায়, কংগ্রেস মহলে এই সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে থাকে যে, অদুর ভবিষ্যতে মুসলিম সংখ্যাগুরু 'খ' এবং 'গ' গ্রুপ কেন্দ্র হইতে আলাদা হইয়া যাইবে এবং ভিন্ন হইয়া পাকিস্তান দাবী মোতাবেক ভারতবর্ষের দুই অংশে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পত্তন করিবে। সেই অবস্থায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম প্রদেশের গ্রুপভুক্তির দরুন তাহাও তাহাদের হাতছাড়া হইয়া পড়িবে। তাই তাহারা আসামের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রী গোপী-

নাথ বড়দলইকে সম্মুখে রাখিয়া গ্রুপিং প্রস্তাবের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন। শ্রী গোপীনাথ বড়দলই বলিতে থাকেন, যেহেতু 'গ' গ্রুপ-পরিষদে মুসলমানরা একটি অধিক ভোটের অধিকারী, সুতরাং ইহা ধরিয়া লইতে হইবে কেন্দ্র হইতে আলাদা হওয়ার প্রশ্নে তাহাদেরই মতামত প্রাধান্য লাভ করিবে। উল্লেখ করা যায়, 'গ' গ্রুপ পরিষদে মোট ৬০টি সদস্য ভোটের মধ্যে অমুসলমান ভোটের সংখ্যা ছিল ৩৪টি। এই একটি ভোটের পার্থক্য মন্ত্রী মিশনের গ্রুপিং প্রস্তাবকে বানচাল করিয়া দেয়।

মহাত্মা গান্ধী, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল এবং আরও কতিপয় নেতা শ্রী বড়দলইকে সমর্থন করিতে থাকা সত্ত্বেও, শ্রী জওয়াহের লাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ মন্ত্রী মিশনের মূল প্রস্তাব গ্রহণের অনুকূল মত প্রকাশ করিতে থাকেন। এক দিকে মহাত্মা গান্ধীর সন্তুষ্টি বিধান অন্য দিকে অপমৃত্যু হইতে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবকে রক্ষার মানসে এই উভয় দলের মধ্যে একটা গোপন সমঝোতার ফলে, পণ্ডিত নেহেরু অতঃপর ঘোষণা করেন, প্রস্তাবিত গণপরিষদে তাঁহারা প্রয়োজনবোধে মন্ত্রী মিশনের মূল পরিকল্পনায় সংশোধন করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত পরিকল্পনার আরও কোন কোন অংশ, বিশেষ করিয়া পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য, শুল্ক ব্যবস্থা এবং মুদ্রা সংযুক্তির দাবীও তিনি উত্থাপন করেন। ইহার ফলে দুইটি মৌলিক প্রশ্নে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে আবার মতভেদ প্রকট হইয়া উঠে এবং মুসলিম লীগ গোটা প্রস্তাবটির উপর নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া পণ্ডিত নেহেরুর বক্তব্যের অযৌক্তিকতা তুলিয়া ধরেন।

মন্ত্রী মিশন যথাসময় মুসলিম লীগের ব্যাখ্যার অনুকূলে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করা সত্ত্বেও, কংগ্রেস তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানাইতে থাকায়, অত্যন্ত সঙ্গতভাবে মুসলিম লীগ গোটা পরিকল্পনা সম্পর্কিত তাহার পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস পরিকল্পনার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কিত অংশ ছাড়া অবশিষ্টাংশ অগ্রাহ্য করে। তবে শর্তাধীনে গণপরিষদ গঠনে সম্মতি জানায়। এইরূপে কার্যতঃ মন্ত্রী মিশনের গোটা প্রস্তাবটিই অকেজো হইয়া পড়ে। কারণ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন চলিবে না।

গণপরিষদের নির্বাচন

এতদসত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রদেশসমূহ হইতে পরোক্ষ ভোটে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস ২১১ এবং মুসলিম লীগ ৭৩টি আসন লাভ করে। অতঃপর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য উদ্যোগী হন। এরূপ একটি সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস মহলে ইতি-মধ্যে বেশ তোড়জোড় শুরু হইয়া গিয়াছিল। মুসলিম লীগও হয়ত প্রথম সুযোগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের জন্য আগাইয়া যাইত। কিন্তু এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে আবার গুরুতর মতানৈক্য দেখা দেয়। অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারে আসন বণ্টন ব্যাপারে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব ছিল. কংগ্রেস পাইবে ৫, মুসলিম লীগ ৫ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেওয়া হইবে ২টি আসন। কংগ্রেস উপরোক্ত সংখ্যা মানিয়া লইতে দৃঢ়তর অসম্মতি প্রকাশ করে। লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের সন্তুষ্টির জন্য এই বলিয়া উক্ত সংখ্যার সঙ্গে আরও একটি আসন যোগ করেন যে, কংগ্রেসে যে বিপুল সংখ্যক অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক রহিয়াছে তাহাদেরও একজন প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় থাকা অত্যন্ত সঙ্গত। ইহাতেও কংগ্রেস সন্তুষ্ট নয় দেখিয়া বড়লাট অতঃপর মোট আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৪ করেন। এই বর্ধিত সংখ্যা অনুসারে তিনি প্রস্তাব করেন. কংগ্রেস ৬, লীগ ৫ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাইবে ৩টি আসন।

বড়লাটের এই তোষণ নীতিতে বিরক্ত এবং দুঃখিত হইয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল ১৯৪৬ সালের ১৭ই জুলাই তাহাদের বোম্বাই অধিবেশনে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী-কালীন মন্ত্রিসভায় যোগদানের পরিবর্তে পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বৃটিশের খেতাবধারী মুসলিম লীগ সদস্যগণকে খেতাব ত্যাগ করিতে আহ্বান জানান হয়। তদনুসারে স্যার নাজিম-উদ্দীন, স্যার ফিরোজ খান নুন, মামদোতের নওয়াব, মাহমুদাবাদের রাজা, রাজা গজনফর আলি প্রমুখ ব্যক্তিগণ সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার-প্রদত্ত খেতাব ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরও কিছু সংখ্যক

খেতাবধারী সদস্য সভাস্থলে এবং পরবর্তী পক্ষকালের মধ্যে তাঁহাদের খেতাব ত্যাগের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত করেন। জনাব লিয়াকত আলি খানের কোন সরকারী খেতাব ছিল না। তিনি নামের পূর্বে নওয়াবজাদা শব্দ ব্যবহার করিতেন। তিনিও জানান, অতঃপর তিনি আর উপরোক্ত শব্দটি ব্যবহার করিবেন না এবং করেন নাই।

লীগ সদস্যগণ কর্তৃক সরকারী খেতাব ত্যাগের ফলে বৃটিশ সরকার কিম্বা কংগ্রেস ভীত হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু ইহার ফলে লীগের মর্যাদা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লীগ বিরোধী মহলগুলি মুসলিম লীগকে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষিত নওয়াব-রাজা, খান বাহাদুর ও খান সাহেবদের একটি ক্লাব হিসাবে এযাবৎ প্রচার এবং ব্যঙ্গ করিয়া আসিতেছিল। এই ঘটনার পর হইতে তাহাদের প্রচারের যথার্থতা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বটে, তবে লীগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কাগজী সংগ্রামে পর্যন্ত ইহার ভূমিকা অস্পষ্ট ও অবোধ্য থাকে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ কাহারা, হিন্দুরা না বৃটিশ সরকার, তাহা উক্ত আবেদনে বলিয়া দেওয়া হয় না। লীগ কাউন্সিল এবং ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা ও নির্দেশে এই অস্পষ্টতা ছিল বলিয়া হিন্দুরা এই মর্মে প্রচারণার একটা সুযোগ লাভ করে যে, তাহাদেরই বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালিত হইতে যাইতেছে, যেহেতু তাহারা ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাগের দাবীর বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। এই প্রচারণার দরুন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহের হিন্দু জনসাধারণ প্রথমে অত্যন্ত ভীত হয় এবং পরে উগ্রপন্থী হিন্দুদের অভয় বাণীতে ভয় দূরীভূত হইলে, ভীষণ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় কিছু সংখ্যক হিন্দু

এবং কোন কোন সংবাদপত্র এই সময় লীগ-মহলের নিকট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস পালনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার দাবী জানাইয়া বিশেষ কোন সাড়া পান নাই। ইহার ফলে তাহাদেরও সন্দেহ স্বাভাবিকভাবে এই বিশ্বাসে পরিণত হয় যে, উহা হিন্দুদেরই বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবে।

কাজেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উদ্‌যাপনে বাধা দানের জন্য হিন্দুরা গোপনে প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহারা ধারণা করিয়া লইয়াছিল, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মুসলমানদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহেও বৃটিশ সরকার মুসলমানদেরই পক্ষাবলম্বন করিবে। এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তাহারা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পুলিশ বাহিনীর হিন্দু লোকজনদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে। বলা বাহুল্য, পুলিশ বাহিনীর সব স্তরেই হিন্দুদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কলিকাতার অবাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়ীরা, তাহাদের কল্পিত মুসলমানদের আক্রমণ হইতে নিজেদের জানমালের নিরাপত্তার নামে প্রচুর অর্থব্যয়ে যথাসময়ে বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে বহু ভাড়াটিয়া গুণ্ডা আমদানী করে। যে সকল বিপ্লবী হিন্দু তাহাদের বিপ্লব-জীবনে সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া কোন দিন মাথা ঘামান নাই, ইংরেজ বিতাড়নই ছিল যাহাদের পরম ও চরম লক্ষ্য এবং যাহারা প্রায় দশ বৎসর পূর্বে বোমা ও রিভলভারের চর্চা ছাড়িয়া দিয়া স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, হিন্দুদের তথাকথিত এই ঘোর বিপদের দিনে তাঁহারাও নিরপেক্ষ এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। রিভলভার, স্টেনগান ইত্যাদি নিজেদের কাছে রাখিয়া দিয়া রাতারাতি তৈরী বোমাগুলি তাহারা তুলিয়া দেন হিন্দু যুবকদের অপরিপক্ক হাতে।

এদিকে কলিকাতার হিন্দু অস্ত্রশস্ত্র ব্যবসায়ীরা স্থির করিয়া রাখিলেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হইলেই তাহারা মজুদ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলী হিন্দু যুবকদিগকে দিয়া প্রচার করিবেন, উহা দাঙ্গাকারী মুসলমান কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার অসংখ্য হিন্দু ছাত্রাবাস, মেস্, ক্লাব, পাঠাগার শরীরচর্চা কেন্দ্র প্রভৃতি রূপান্তরিত হয় দাঙ্গা সাংগঠনিক কেন্দ্রে। গবাক্ষ এবং ছাদের উপর হইতে মুসলমান পথচারীদের উপর নিক্ষেপের জন্য হিন্দু

নারী, বালক-বালিকাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় ইট, পাথর, এসিডপূর্ণ বাল্‌ব, বোতল ইত্যাদি। অসতর্ক পথচারী মুসলমানদের উপর নিক্ষেপের জন্য রন্ধনশালায় মজুদ রাখা হয় তৈল ও কয়লা। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স-ধারী হিন্দুরা আগেভাগে প্রচুর কার্তুজ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া লয় এবং কামারশালায় হাজার হাজার রামদা, ছোরা, বল্লম ইত্যাদি তৈরী হইয়া বিতরিত হইতে থাকে বস্তি এলাকার হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু এই সাংগঠনিক তৎপরতা এত গোপনে চলিতে থাকে যে, মুসলমানরা ঘুণাক্ষরেও ইহার কিছু জানিতে পারে না। দাঙ্গার বেশ কিছু দিন পর জানিতে পারা গিয়াছিল, ১৫ই আগস্ট রাত্রি ১২টার পর অন্যূন বিশ হাজার হিন্দু যুবক ও গুণ্ডা নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

কলিকাতার মহাদাঙ্গা

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবসের সাফল্যের জন্য লীগ হাই কমাণ্ডের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র বাংলার উপর। বাংলা ও সিন্ধু ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে সে সময় লীগ-মন্ত্রিসভা কায়েম ছিল না। আত্মকেন্দ্রিক মীর, ভূমিহীন হারি, অপরাধপ্রবণ হুর এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পীর ও পীরজাদাদের দেশ, সিন্ধুর মন্ত্রিসভার উপর লীগ কর্তৃপক্ষ এমন একটি সঙ্কটপূর্ণ সময়েও নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তখন ছিল ডাঃ খান সাহেবের কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার খিজির হায়াৎ খান সদলবলে মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধিতা করিতেছিলেন। কাজেই লীগ হাই কমাণ্ড তাঁহাদের ভ্রমাত্মক এবং বিভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীরই উপর চাপ প্রয়োগ করিতে থাকেন। হিন্দুরাও বাংলা সম্পর্কেই অধিক চিন্তিত ছিল। কারণ, তাহারা জানিত, অন্যান্য প্রদেশে লীগ-বিরোধী মুসলমান এবং কংগ্রেসী জনসাধারণ ও মন্ত্রিসভাগুলি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' সাফল্যজনক উদ্‌যাপিত হইতে বাধা দিবেন। কিন্তু ইহাদের কাহাকেও সেই সকল প্রদেশে পর্যন্ত বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। কারণ, বাংলা ছাড়া মুসলিম সংখ্যাগুরু অন্যান্য প্রদেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস আপনা-আপনিই একটা বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছিল।

ইহার মাত্র এক মাস পূর্বে বোম্বাই শহরে হিন্দুরা কোন একটি তুচ্ছ ব্যাপারে দলবদ্ধভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া ১৭ জন পাঠান সহ শতাধিক মুসলমান নাগরিককে হত্যা এবং বহু নিরপরাধ মুসলমানের দোকানপাট ও বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা সত্ত্বেও, ১৬ই আগস্ট প্রাতঃকাল পর্যন্ত কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানরা নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল। অতি বড় সাবধানী মুসলমান পর্যন্ত ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই যে, ১৬ই আগস্ট তাঁহাদের রক্তে কলিকাতা মহানগরীর রাজপথ রঞ্জিত করিবার জন্য হিন্দু অধ্যুষিত পুলিশ বাহিনী হিন্দু জনসাধারণের সহিত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। ১৯৪৬ সালে কলিকাতার মোট অধিবাসীর শতকরা ২৩.৪ ভাগ মাত্র ছিল মুসলমান। নিম্নপদস্থ পুলিশের চাকুরীতে মুসলমানের হার ছিল শতকরা ১৩ ভাগ। উচ্চপদগুলির শতকরা ৯৬ ভাগ ছিল অমুসলমানদের হাতে। কোটারী-কবলিত কলিকাতা মুসলিম লীগ ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের অপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সর্বোপরি কলিকাতার বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় সব কয়টি প্রসিদ্ধ দোকান ছিল হিন্দুদের। দাঙ্গাকারীরা ইহাদের নিকট প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চরম বিপদের সময়েও অসতর্ক ও অদূরদর্শী মুসলমানরা কাহারও নিকট হইতে সত্যিকারের কোন সাহায্যই পায় নাই। লীগ হাই কমাণ্ডের নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৬ই আগস্ট সরকারী ছুটি ঘোষণা করিয়া ইউরোপীয়দেরও বিরাগভাজন হন। ছুটি ঘোষণার পশ্চাতে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি ছিল না। হিন্দুরা বৃথাই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, ছুটির দিন ছিল বলিয়া চাকুরীজীবী অগণিত হিন্দু যুবক দাঙ্গায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। ইহা হিন্দু দোকান কর্মচারী ও হিন্দু শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দাঙ্গার সূচনা

১৬ই আগস্ট প্রাতে মানিকতলা বাজারে দোকানপাট বন্ধ করা লইয়া গোলমালের সূত্রপাত হয়। লীগের একদল কর্মী বাজারের হিন্দু ও

মুসলমান ব্যবসায়ীদিগকে আপন আপন দোকানপাট বন্ধ করিতে বলিলে, হিন্দু ব্যবসায়ী এবং খরিদ্দাররা তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করে। মুসলমান দোকানদার ও খরিদ্দাররা আহতদিগকে হাসপাতালে এবং কলিকাতা-লীগ অফিসে এই সংবাদ পৌঁছাইবার আগেই মানিকতলা অঞ্চলে মুসলমান বস্তিগুলি আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যথা—বোমা রিভলভার, স্টেন্‌গান ইত্যাদি সহ কয়েক হাজার হিন্দু অংশ গ্রহণ করে। মানিকতলার পর শোভাবাজার, শ্যামবাজার, বাগবাজার এবং দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর, কালীঘাট ও টালীগঞ্জের মুসলমান এলাকা ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলি আক্রান্ত হয়। দ্বিপ্রহরের মধ্যে হিন্দুরা এই সকল এলাকায় বহু মুসলমানকে হত্যা এবং বাড়ী-ঘর নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

সেদিন প্রাদেশিক লীগের উদ্যোগে কলিকাতার গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের পাদদেশে আহুত জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর ইত্যাদি এলাকা হইতে হাজার হাজার মুসলমান শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হইতে থাকিলে, সশস্ত্র হিন্দু জনতা কর্তৃক পথিমধ্যে আক্রান্ত হয়। নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর যখন বেদম লাঠি-সোটা, ছোরা এবং রিভলভার ইত্যাদি চলিতেছিল, তখন রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত হিন্দু বাড়ীগুলি হইতে গরম তৈল, ইট-পাটকেল, এসিড্ এবং জলন্ত কয়লা বর্ষিত হইতে থাকে। অতর্কিত আক্রমণের দরুন নিরস্ত্র শোভা-যাত্রীদের ছত্রভঙ্গ দলগুলির বেশীর ভাগ সভায় যোগদান করিতে পারে নাই। পাঞ্জাবের রাজা গজনফর আলি গড়ের মাঠের এই সভায় সভা-পতিত্ব করিয়াছিলেন।

সেদিন সকাল হইতেই কলিকাতায় সমস্ত যানবাহন বন্ধ ছিল। ইহার ফলে রাস্তায় পথচারীর ভীড় অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পায়। প্রায় সব কয়টি থানার অফিসার-ইন্‌চার্জ ছিলেন হিন্দু। টেলিফোন অফিসটিও ছিল কার্যতঃ হিন্দুদের পরিচালনাধীন। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কণ্ট্রোলরুমের প্রধান কর্তাও ছিলেন অমুসলমান। এক কথায় সোহ্‌রা-ওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ছাড়া সেই ঘোর বিপদের দিনে মুসলমানদের আপন বলিতে বা তাহাদিগকে অনুমাত্রও সাহায্য করিতে পারে এমন কেহ তাহাদের ছিল না।

এদিকে এক তরফা হত্যা ক্রমশঃ সমগ্র কলিকাতা ও উপকণ্ঠে ছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য তাঁহার সঙ্গে রহিলেন কুষ্টিয়ার জনাব শামসুদ্দীন আহমদ এবং ফরিদপুরের জনাব চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন। কখন কণ্ট্রোল রুমে, কখন থানায়, কখন বসতি এলাকায়, কখন হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং কখন সেক্রেটারিয়েটে তিনি নির্ভয়ে এবং বিদ্যুৎ বেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। দুইবার রাস্তায় তিনি হিন্দু জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অল্পের জন্য রক্ষা পান। সেই সময় তিনি যেন অসুরের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য বিরতিসহ ৩৬ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর পরিস্থিতি কতকটা আয়ত্তাধীনে আসে। এই সময় প্রথম প্রকাশ পায় হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান পকেটগুলির অধিকাংশই নাই। হিন্দু পরিবেষ্টিত মুসলমান অধ্যুষিত ছোট ছোট এলাকাগুলিও দাঙ্গাকারীদের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। আক্রান্ত পকেট ও বস্তি এলাকায় নির্বিচারে হত্যা ছাড়াও অগ্নিসংযোগে বহু কাঁচা এবং আধা-পাকা বাড়ী নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দাঙ্গায় ক্ষয়-ক্ষতি

তিন দিন ভীষণ দাঙ্গা চলে। একটি মোটামুটি হিসাব হইতে জানা যায়, প্রথম দিনের দাঙ্গায় নিহতদের শতকরা ৭৫ ভাগ, দ্বিতীয় দিনে ৬০-৬৫ এবং তৃতীয় দিবসে শতকরা ৫০ ভাগ ছিল মুসলান। কলিকাতার এই দাঙ্গায় হাজার হাজার নয়, চারি লক্ষাধিক মুসলমান নরনারীর প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে অতুলনীয় সাহস ও সমাজহিতৈষণার জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। দাঙ্গার চতুর্থ দিবসে উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেশ হ্রাস পায়। কিন্তু ছোরা ইত্যাদির সাহায্যে ব্যক্তিগত হামলা অব্যাহত থাকে আরও প্রায় এক মাস।

হত্যাকাণ্ডের পুনরাভিনয় যতটা সম্ভব রোধের জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী অতঃপর পাঞ্জাবে লোক পাঠাইয়া সৈন্য বিভাগ হইতে ছাঁটাইকৃত

সাত শতাধিক মুসলমানকে আনাইয়া কলিকাতার পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকার থানাগুলিতে মুসলমান অফিসার এবং লালবাজার পুলিশ হেড্ কোয়ার্টার্সে জনৈক মুসলমানকে একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি মুসলমানদের রক্ষার আংশিক ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আরও দুই মাস কাল কয়েকটি বিশেষ এলাকায় ইতঃস্তত: হত্যা চলে। অনেকে মনে করেন, কলিকাতার দাঙ্গায় উভয় পক্ষে ১৫-২০ হাজার লোক প্রাণ হারায়। সর্বজনীন দাবীর প্রেক্ষিতে ভারত সরকার দাঙ্গার কারণ নির্ণয়ের জন্য পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ফজলে আলির নেতৃত্বে যেই কমিশন গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাজ সমাপ্তির পূর্বেই ভারতবর্ষ বিভাগ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় রিপোর্ট-খানি চাপা পড়িয়া যায়। স্মরণ করা যাইতে পারে, স্যার ফজলে আলি নৌ-বিদ্রোহের কারণ তদন্তের জন্যও তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

কলিকাতার দাঙ্গার সময় লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা ছাড়াও, লীগ নেতৃবর্গের বেশীর ভাগেরই মনোবলের নগ্ন প্রকাশ পায়। যে সকল নেতা মাঠে-ময়দানে শত শত বার জানমাল কোরবানী দিয়া আরও কোরবানীর সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিতেন, মুসলমান জনসাধারণের এই দারুণ বিপদের সময় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বাস করিয়াও তাঁহাদের কেহ কেহ সপ্তাহকাল ঘরের বাহির হন নাই। মজার কথা, ইঁহারাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং দাঙ্গা প্রশমনের পর ইঁহারাই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর নিন্দা-মুখর ছিলেন।

কলিকাতার এই নরমেধ যজ্ঞে নোয়াখালী জেলার বহু মুসলমান নিহত হইয়াছিল। কাজেই সর্বাগ্রে তথায় ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া অক্টোবর মাসে সেস্থানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রথমে মনোমালিন্য এবং পরে দাঙ্গা বাধে। এক্ষেত্রে দাঙ্গার উস্কানী যোগায় হিন্দুরা, দাঙ্গা শুরু হয় মুসলমানের হাতে। দাঙ্গায় পাশাপাশি দুইটি থানার একশতেরও কিছু কম হিন্দু হতাহত হয়। কিন্তু নোয়াখালী জেলার এই দাঙ্গার খবর এমন ফলাও করিয়া কলিকাতার হিন্দু দৈনিক পত্রিকাগুলি প্রকাশ করিতে থাকেন যে, ভয়াবহতার দিক দিয়া যেন ইহা

কলিকাতার মহা-হত্যাকাণ্ডকেও অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের এই মিথ্যা প্রচারের ফলশ্রুতি স্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তিও বিভ্রান্ত এবং বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ শীর্ণ দেহখানি লইয়া তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ নোয়াখালীর দাঙ্গা-উপদ্রুত পল্লী অঞ্চলে অবস্থান করিতে হয়। সেই সময় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং নেতৃ-স্থানীয় বহু হিন্দু ও মুসলমান সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।

উপরোক্ত মিথ্যা প্রচারণার মূলে যে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহ পর উহা প্রকাশ পায় বিহারে।

বিহারে একতরফা দাঙ্গা

ব্যাপকতা, স্থায়িত্ব এবং ভয়াবহতার দিক দিয়া বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। বিহারে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ১৪ জন মাত্র। এই কয়টি লোককে হত্যার জন্য তিন মাস ব্যাপী সেখানে প্রস্তুতি চলে। বিহার মন্ত্রিসভার একাধিক কংগ্রেসী সদস্য এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা শুধু যে দাঙ্গার উৎসাহী উস্কানীদাতা ছিলেন এমন নয়, অধিকন্তু দাঙ্গার সময় ইঁহাদের কেহ কেহ মুসলমান নিধন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পর্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনটি জেলায় একই দিন এবং প্রায় একই সময়ে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করা হয়। বিনা কারণে এবং বিনা উত্তেজনায় এক দুই জনকে নয়, হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে যে হত্যা করা যায়, বিহারের দাঙ্গা সম্ভবতঃ তাহার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মুসলমান-হত্যা বন্ধের জন্য প্রেরিত সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ বিদেশী অফিসারগণের রিপোর্টে জানা যায়, কোন কোন মুসলমান এলাকা আক্রমণের জন্য ১৫-২০ হাজার দাঙ্গাকারী অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। ইহাও প্রকাশ, বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার চাপে মিলিটারীরা দাঙ্গাকারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারে নাই। নরহত্যার যত জঘন্য রকমের কলাকৌশল মানুষের দুষ্টবুদ্ধি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, কলিকাতার ন্যায় বিহারেও

তাহার সব কয়টিই অসহায় মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছিল। অবশ্য ইহাও সত্য যে, হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানরাও কোন কোন ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দান করিয়াছিল। তবে তাহা কলিকাতায়—বিহারে নয়। বিহারে প্রথম তিন দিনের দাঙ্গায় ২৫-৩০ হাজার মুসলমান শিশু ও নরনারীর প্রাণহানি ঘটে। এমন বহু গ্রাম আছে যেস্থানে দাঙ্গার পর একটি মুসলমানকেও জীবিত পাওয়া যায় নাই। বিস্ময়ের বিষয় যে, কোন খ্যাতনামা কংগ্রেসী নেতার মুখে বিহারের এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি শব্দও প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয় নাই। বিহারের পর মধ্য প্রদেশেও কোন কোন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মুসলমানদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

সীমান্ত গান্ধীর প্রয়াস

বিহারের মুসলমানদের দুর্ভাগ্যবশতঃ দাঙ্গা সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবার পরও সর্ব-ভারতীয় লীগ নেতৃবৃন্দের একজন ব্যতীত অপর কেহ তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা দর্শনের জন্য বিহারে গমন করেন নাই। কংগ্রেস নেতা খান আবদুল গফ্ফার খান প্রায় এক মাস বিহারের দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতির ফলে ভয়ার্ত মুসলমানদের বাস্তুভিটা ত্যাগের হিড়িক উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। তা' ছাড়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাহারা অন্যত্র গমন করিয়াছিল, তাহাদেরও অনেকে এই সময় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

লীগের পাকিস্তান দাবীকে যে সকল মুসলমান অবাস্তব ও অসমীচীন বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, বিহারের দাঙ্গা তাঁহাদের মতের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দেয়। তাঁহারা উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিক কারণে যতটা নয়, ততোধিক ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের অস্তিত্ব এক শ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে একটা অসহনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ ধারণার পশ্চাতে একটা সঙ্গত যুক্তিও ছিল। বিহারের মুসলমানেরা কংগ্রেস ও লীগ দলে বিভক্ত ছিল। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলি মধ্যে একমাত্র বিহারেই মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলির একটা বড় অংশ কংগ্রেস মনোনীত এবং সমর্থক

মুসলমান প্রার্থিগণ অধিকার করিতে সমর্থন হন। এতদসত্ত্বেও হিন্দু দাঙ্গাকারীদের হাত হইতে সেখানে কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানরা পর্যন্ত রেহাই পান না।

ইংলণ্ডের তদানীন্তন শ্রমিক সরকারের নিকটও অতঃপর ইহা পরিষ্কার হইয়া পড়ে যে, লীগের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবীর বিরোধিতা অব্যাহত রাখা হইলে শুধু যে তাঁহাদের নিজেদেরই কায়েমী স্বার্থের হানি হইতে পারে তাহাই নয়, উপরন্তু ব্যাপক আকারে মুসলিম নিধনের জন্য বিশ্ব জনমতের নিকটও তাঁহাদিগকে জওয়াবদিহি হইতে হইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে, সৈন্য-সামন্তের উপস্থিতিতেও বিহারের দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমানের নৃশংস হত্যার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই বৃটিশ সরকারের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা শুরু হইয়া গিয়াছিল। এই সমালোচনার প্রধান উৎস-স্থান ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। স্বাধীন ভারতবর্ষকে উন্নয়নের নামে বিরাট অঙ্কের ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া বহুকাল শোষণ করিতে পারিবে, এই আশায় যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাসমরের শেষের দিকে ভারতবাসীদের স্বাধীনতা দাবীর প্রতি জোর সমর্থন জানাইতে থাকে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

উপরে বলা হইয়াছে, মন্ত্রী মিশন তাঁহাদের প্রস্তাবে একটি গণপরিষদ এবং কেন্দ্রে শুধু ভারতীয় সদস্যগণের সমবায়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া লর্ড ওয়াভেল একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগ উহাতে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকায় যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রী মিশন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা কার্যতঃ অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। ফলে কংগ্রেস-লীগ দ্বন্দ্বপ্রসূত রাজনৈতিক অচলাবস্থা পূর্ববৎ চলিতেই থাকে। এই পরিস্থিতির দ্রুত অবসানের জন্য লর্ড ওয়াভেল পুনরায় লীগ-প্রেসিডেণ্ট জনাব জিন্নাহর সহিত গোপন আলোচনা চালান। এবারের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়। লীগ কর্তৃপক্ষ বিনাশর্তে অন্তর্বর্তী-

কালীন সরকারে লীগ-প্রতিনিধি প্রেরণে সম্মতি প্রকাশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঁহার প্রতিনিধিগণের নামের একটি তালিকাও পেশ করেন। তবে তাঁহারা জানান, ইহা দ্বারা মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাটি অন্য কথায়, গ্রুপিং ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে, তাহা মনে করা যাইবে না।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে বিনাশর্তে যোগদান সম্পর্কিত লীগ কর্তৃপক্ষের এই সর্বশেষ সিদ্ধান্তের পশ্চাতে বলিষ্ঠ কোন কারণ যে ছিল না, তাহা নয়। বিহারের ভয়াবহ দাঙ্গার বেশ কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হইয়াছিল এবং বিহারে কংগ্রেসের প্রভাবও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। তত্রাচ দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং বিহারের কংগ্রেসী সরকার কার্যকর তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায়, লীগ কর্তৃপক্ষ মনে করিয়া লইতে বাধ্য হন, কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁহাদের অনুপস্থিতিরই দরুন দাঙ্গা এতটা ব্যাপক ও ভয়াবহ হইতে পারিয়াছে। মুসলিম সংখ্যালঘু অন্যান্য প্রদেশে তখনও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতেছিল। পাছে সে সকল প্রদেশেও বিহারের অনুরূপ গণহত্যা সংঘটিত হয়, এজন্যই লীগ কর্তৃপক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে বিনাশর্তে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মুসলিম লীগ মনোনীত সদস্যগণ গোটা সরকারের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলা শক্ত। তবে বিনাশর্তে নেহেরু মন্ত্রিসভায় যোগদানের দরুন লীগের মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

লীগ প্রতিনিধিত্ব

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের জন্য লীগের পক্ষ হইতে মনোনীত হন জনাব লিয়াকত আলি খান (যুক্তপ্রদেশ), জনাব গজনফর আলি (পাঞ্জাব), জনাব ইসমাইল চুন্দ্রীগড় (বোম্বাই), শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল (বাংলা) এবং জনাব আবদুর রব নিশতার (সীমান্ত প্রদেশ)। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইজনকে লইয়া এক নূতন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল সম্পর্কে কংগ্রেস এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করে যে, মুসলিম

লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কোন অমুসলমান যেমন ইহার সদস্য হইতে পারেন না, তেমনি কোন অমুসলমান ইহার প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারও দাবী করিতে পারেন না। কাজেই লীগের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস তাঁহার মনোনয়ন স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। স্বয়ং শ্রী যোগেন্দ্র মণ্ডলও লীগের সাধারণ কিম্বা অসাধারণ সদস্য ছিলেন না এবং লীগের গঠনতন্ত্রে তেমন কোন বিধানও ছিল না।

জনাব আবদুর রব নিশতার সম্পর্কে কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল তাঁহার আপন প্রদেশেও জনাব নিশতারের কোন জনপ্রিয়তা ইতিপূর্বে কোন কালেও ছিল না। তা'ছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন আইন সভার সদস্য নহেন এবং সর্বোপরি মাত্র কয়মাস পূর্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট বহু ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হইয়াছেন। জনসাধারণের অনাস্থাভাজন এহেন ব্যক্তিকে কংগ্রেস মন্ত্রী হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। এই দুইজনের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা সম্পর্কে কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব দর্শনে এবং তাহাদের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া লর্ড ওয়াভেল ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়েন। সমস্যা সমাধানের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাহায্যপ্রার্থী হন। তাঁহারই হস্তক্ষেপের ফলে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের আপত্তি প্রত্যাহার করিয়া লইলে পর, ১৯৪৬ সালের ২৬শে অক্টোবর লীগ-মনোনীত সদস্যগণ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। মোট ১৪ জন সদস্যের সমবায়ে গঠিত নেহেরু মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগ সদস্য সংখ্যা হয় ৫ জন।

মুসলিম লীগের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় দুর্গ হিসাবে বিবেচিত, বাংলা হইতে কোন মুসলমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে স্থানলাভ না করায় প্রাদেশিক লীগ মহলে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ফাটিয়া পড়ে না। তা'ছাড়া জনাব লিয়াকত আলি খান ব্যতীত অবশিষ্ট চারিজনের মধ্যে কাহারও সর্বভারতীয় মর্যাদা ছিল না বলিয়া এই মনোনয়ন কোন মহলেই উৎসাহ এবং আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে নাই।

কংগ্রেসের জুনিয়ার পার্টনার হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগের যোগদান একাধিক কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার ফলে

উহার মর্যাদার কিছু হানি হইয়া থাকিলেও, অস্তিত্বটা রক্ষা পায়। কলিকাতা ও বিহারের দাঙ্গার পর মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, লীগ-প্রীতি ততটা বৃদ্ধি পায় নাই। বরঞ্চ দাঙ্গা প্রপীড়িত মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত নামিয়া পড়িতেছিল। দাঙ্গার সময় লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা ছাড়াও লীগ নেতৃবর্গের নিষ্ক্রিয়তা জনসাধারণের বিরূপ সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। লীগ নেতৃবর্গের ন্যায় মুসলমান জনসাধারণও মন্ত্রীত্বকেই লীগের সমস্ত শক্তির উৎস এবং আপৎকালে প্রধান অবলম্বন হিসাবে মনে করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ কারণে দেশের কোথাও লীগ-সমর্থিত অথবা লীগ পরিচালিত একটি শক্তিশালী সংস্থাও তাহারা গড়িয়া তোলে নাই।

কিন্তু মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে কোন কালেও লীগ-মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা নাই, শেষ পর্যন্ত ইহা উপলব্ধি হওয়ায় মুসলিম লীগের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ দাঙ্গার পর হইতে দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লীগের যোগদান এই ভাঙ্গন রোধে এবং মুসলমান জনসাধারণের মনে উৎসাহ সঞ্চারিত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগ অংশ গ্রহণ না করিলে, ক্রমে ক্রমে সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরা দাঙ্গার ভয়েই হোক কিম্বা কংগ্রেস মন্ত্রি-সভার চাপেই হোক, মুসলিম লীগ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। তেমন অবস্থায় শুধু বাংলার সাহায্যে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারকে দেশ বিভাগের দাবী মানিয়া লইতে সম্মত করানো লীগের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে বলা আবশ্যক যে, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভা প্রথমাবধি ইহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রতি সিন্ধু আইন পরিষদ এবং জনসাধারণের আনুগত্য সম্পর্কে যত কম আলোচনা করা যায়, ততই উত্তম।

গণপরিষদের অধিবেশন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগের বিনাশর্তে যোগদানে উৎসাহিত হইয়া লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহাতে যোগদানের জন্য লীগ টিকেটে

নির্বাচিত সদস্যগণ যথাসময়ে দিল্লী উপনীত হন। কিন্তু লীগ-কর্তৃপক্ষের একটি আকস্মিক নির্দেশ অনুসারে তাঁহারা গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদান হইতে বিরত থাকেন। লীগ-কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, তাহাদের এই পদক্ষেপের ফলে কংগ্রেস গ্রুপিং সম্পর্কিত উহার মনোভাব পরিবর্তন করিয়া উহা বিনাশর্তে গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। লর্ড ওয়াভেল আপোষের মাধ্যমে এই নূতন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়া এবার আর সফলকাম হইলেন না। অতঃপর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য হইলেন না। পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিকতর ঘোরালো হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া মন্ত্রী মিশনের গোটা পরিকল্পনার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি সংগ্রহের মানসে মিঃ এটলী ডিসেম্বর মাসে ভাইসরয়, পণ্ডিত নেহেরু, কায়েদে আজম জিন্নাহ, সরদার বলদেব সিংহ এবং জনাব লিয়াকত আলিকে লণ্ডন গমনের আমন্ত্রণ জানান। লণ্ডনে তাঁহাদের সহিত আলোচনার পর মিঃ এটলী সরকারীভাবে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশ সম্পর্কে লীগের ব্যাখ্যার প্রতি তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন পূর্বক কংগ্রেসকে উহা মানিয়া লইতে অনুরোধ করেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ প্রথমে ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইয়া পরে ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। এই ইতস্ততঃতা শীঘ্রই অসম্মতির রূপ লাভ করে।

কংগ্রেস-লীগ আপোষ-মীমাংসার আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টে এক বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করেন, ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষের শাসনভার এক বা একাধিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাসনক্ষমতা ত্যাগের ইচ্ছা-সম্বলিত এই ঘোষণা সকল রাজনৈতিক মহলে নূতন এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। কেহ কেহ মনে করেন, এই ঘোষণার পশ্চাতে ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতি বৃটিশ সরকারের সহানুভূতি ও সদিচ্ছার চেয়ে তাঁহাদের হিন্দু-ভীতিই অধিক সক্রিয় ছিল। ইহার সমর্থনে তাঁহারা বলেন, লণ্ডন বৈঠকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার কোন কোন অংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুসলিম লীগের সমর্থনসূচক অভিমত প্রকাশ করায়, তাহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তখনই তাহারা স্থির করে, একটা

নির্দিষ্ট দিন ভারতব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান ঘটাইয়া তাহারা বৃটিশ শাসনব্যবস্থার উপর তাহাদের চরম আঘাত হানিবে। গোপন সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত ঘোষণা প্রচার করেন। ইহার মূলে আংশিক সত্যতা থাকা বিচিত্র নহে।

এদিকে ইত্যবসরে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন আহুত হয়। অধিবেশনের প্রারম্ভে আবার এক সমস্যা দেখা দেয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ সচিব জনাব লিয়াকত আলি খান সেই বারের বাজেট রচনা করিয়াছিলেন। বাজেটে তিনি এমন কতিপয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যাহা গৃহীত হইলে ধনীক শ্রেণীর উপর ধার্য বর্ধিত হারের ট্যাক্সে দরিদ্র জনসাধারণের কিঞ্চিৎ কল্যাণ সাধিত হইত। কিন্তু দরিদ্রের বাজেট, এই কথা শুনা মাত্রই কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীর দল ইহার পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর উপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে জনাব লিয়াকত আলি খানও ইহার পরিবর্তনে দৃঢ়তার সহিত অসম্মতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার দরুন মন্ত্রিসভায় পর্যন্ত এক অচলাবস্থার উদ্ভব ঘটে। অবশেষে বড়লাটের চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মতবিরোধ নিরসনকল্পে যে মধ্যপন্থা আবিষ্কৃত হয়, তদনুসারে বাজেটটি সংশোধিত হওয়ার পর পরিষদে উত্থাপিত এবং যথারীতি গৃহীত হয়। সংশোধনের পর বাজেটের অভিনবত্ব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিলেও, জনসাধারণের চোখে জনাব লিয়াকত আলির মর্যাদা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

রাজন্যবর্গের উপর চাপ

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষে এ সময় একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তিনি স্বরাষ্ট্র, প্রচার ও দেশীয় রাজ্য দফতরের মন্ত্রী হন। ক্ষমতা লাভের পর তাঁহার হঠকারিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে তিনি মুসলিম লীগ সম্পর্কে এমন সব অসত্য ও বক্রোক্তি করিতে থাকেন যাহা হইতে মুসলমানদের এই প্রতীতি জন্মে যে,

তিনিই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার একজন উৎসাহী উস্কানীদাতা। এ সময় ইহাও প্রকাশ পায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক নামক লক্ষ যুবকের সশস্ত্র দলটির সাথে তাঁহার পরোক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে তাঁহারই নির্দেশে বিহারে দাঙ্গার সময় পুলিশ ও সৈন্যরা নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য হয়।

অধিকন্তু দেশীয় রাজ্য-দফতরের মন্ত্রী হিসাবেও তিনি এ সময় মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবিত ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানের জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের উপর চাপ জোরদার করেন। সম্ভাব্য সকল প্রকারে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী বানচাল করিয়া দেওয়াই ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি তাঁহার এই অশোভন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের উদ্দেশ্য। লীগের পক্ষ হইতে ইহার পাল্টা কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম পাকিস্তান সংলগ্ন যশলমীর, যোধপুর, কপূরতলা প্রভৃতি সামন্ত রাজ্যগুলি পরবর্তীকালে পাকিস্তানে যোগদান করিতে পারে নাই। অথচ দেশ বিভাগ পরিকল্পনায় বলা ছিল, দেশীয় রাজ্যগুলি উহাদের নৃপতিগণের ইচ্ছানুসারে পাকিস্তান অথবা ভারত ইউনিয়নে যোগদান করিতে পারিবে, তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। অনুরূপ ঔদাসীন্যের জন্যই লীগ কর্তৃপক্ষ দেশবিভাগের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে আন্দামান, নিকোবর, মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপের উপর পাকিস্তানের দাবী জোরের সহিত পেশ না করায় সব কয়টি স্থান উহাকে হারাইতে হইয়াছে। অথচ এই সব কয়টি দ্বীপে সে সময় মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। তা ছাড়া সমুদ্র পথে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ছিদ্র পথ বন্ধের জন্য এ সকল দ্বীপের গুরুত্ব কোন সময় হ্রাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস ও লীগের আদর্শগত মত-বিরোধ অল্পদিনের মধ্যে নগ্নভাবে প্রকট হইয়া পড়ে। বৃটিশ সরকার তাই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া ভারত বিভাগের অনুকূলে তাঁহাদের মনস্থির করিয়া লইয়া ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহাতে

স্পষ্টভাবে বলা হয়, বৃটিশ সরকার তাঁহাদের পূর্ব ঘোষণার ব্যতিক্রমে উক্ত বৎসরেরই জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ শাসনের সকল দায়িত্ব ভারতীয়দেরই হাতে ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য তাঁহারা লর্ড ওয়াভেলের স্থলে বড়লাটের পদে লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের নিয়োগের কথাও সেই সঙ্গে প্রকাশ করেন। ইহাতে আরও বলা হয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি যাহাতে উক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য যথোচিতভাবে প্রস্তুত হইতে পারেন, তজ্জন্য তখন হইতে তাঁহাদিগকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইতে থাকিবে। অপর পক্ষে বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি উক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ঐক্যমত হইতে না পারিলে, বৃটিশ সরকার তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে যে কোন দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া দায়িত্ব হইতে যথাসময়ে নিজেদের মুক্ত করিয়া লইবেন।

বৃটিশ সরকারের এই ঘোষণাটি মুসলিম লীগকে ভীষণ অসুবিধার মুখে ঠেলিয়া দেয়। কারণ, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইহাতে নির্দিষ্ট করিয়া কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নাম না করা হইলেও, ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ ছিল না যে কংগ্রেসকেই দৃষ্টিপথে রাখিয়া তাহা বলা হইয়াছে। ক্ষমতা একবার কংগ্রেসের নিকট হস্তান্তরিত হইলে তাহা হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করা যে একটা সাধ্যাতীত ব্যাপার হইবে, তাহা লীগ-কর্তৃপক্ষের অনুমানের ঊর্ধে ছিল না। এদিকে কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার পথও ইতিমধ্যে আরও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই উভয় সঙ্কটের মুখে পড়িয়া লীগ-কর্তৃপক্ষ ধৈর্য এবং সাহস হারান নাই বলিয়াই খণ্ডিত আকারে হইলেও, শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে মুসলমানদের জন্য দুইটি এলাকা চিহ্নিত করিয়া লইতে পারিয়াছেন।

প্রদেশ বিভাগের দাবী

ভারতবর্ষের বড়লাটের পদে নিয়োগের পূর্বে লর্ড মাউন্টব্যাটেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। রক্ষণশীল বৃটিশ রাজ-পরিবারের সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়াও তিনি শ্রমিক দলেরই একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এদেশের বিচিত্র অবস্থার

সহিত পূর্ব হইতে কিছুটা পরিচিত ছিলেন বলা চলে। শাসনভার গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথম সুযোগে ভারতীয় নেতৃবর্গকে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত অভিপ্রায়ের কথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন। মুসলিম লীগের ভারতবর্ষ বিভাগের দাবী সম্পর্কেও বৃটিশ সরকারের মনোভাব তিনি সে সময় তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখেন না।

ভারত বিভাগ দাবীর প্রতি বৃটিশ সরকারের অনুকূল মনোভাবের কথা জানিতে পারিয়া শিখ সম্প্রদায় পাঞ্জাব বিভাগের দাবী উত্থাপন করে। এই অসঙ্গত দাবীর সমর্থনে তাহারা মাস্টার তারা সিং নামক তাহাদের জনৈক নেতার পরামর্শক্রমে পাঞ্জাব পরিষদের অভ্যন্তরে পর্যন্ত নানা অশোভন আচরণের অভিনয় শুরু করিয়া দেয়। আবেদন নিবেদন এবং নিরুপদ্রব আন্দোলনের মাধ্যমে দাবীর অনুকূলে বৃটিশ সরকার ও লীগের স্বীকৃতি আদায় সম্ভব নয় মনে করিয়া অতঃপর তাহারা পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া তোলে। স্যার খিজির হায়াৎ খান তিওয়ানার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা ছিলেন মুসলিম লীগ বিরোধী। তাঁহাদের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্তির আশঙ্কা তেমন না থাকায় এবং পাঞ্জাবের হিন্দুদের সর্বপ্রকার সাহায্যের ভরসা পাইয়া শিখদের ঔদ্ধত্য এতটা চরমে উঠিয়াছিল যে, সংখ্যায় পাঞ্জাবের সব জেলায় কম হওয়া সত্ত্বেও, তাহারা মুসলমানদের উপর জুলুম করিতে থাকে। অগত্যা মুসলমানেরা রুখিয়া দাঁড়াইতেই মন্ত্রীদের গদী টলটলায়মান হইয়া উঠে এবং শিখরা নিরুপদ্রব আন্দোলনের পথে ফিরিয়া আসে।

শিখদের দেখাদেখি বাংলার হিন্দুরা বাংলা বিভাগের দাবী উত্থাপন করে। সভাসমিতি করিয়া, সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রচারকার্য চালাইয়া এবং লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করিয়া তাহারা অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে বলিষ্ঠ হিন্দু জনমত গঠন করিতে সমর্থ হয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ হইতে সে সময় বড়লাটের নিকট বিশ সহস্রাধিক টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছিল। হিন্দুদের এই দাবীর পশ্চাতে কংগ্রেসের দৃঢ় সমর্থন ছিল বটে, কিন্তু নেতৃত্বদান করে হিন্দু মহাসভা।

সামগ্রিকভাবে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তবে পূর্ব পাঞ্জাব ও বাংলার বর্ধমান বিভাগে অমুসলমানদেরই ছিল

সংখ্যাধিক্য। পাঞ্জাবের কোন জেলায় শিখদের সংখ্যাধিক্য ছিল না। তথাপি উভয়ে প্রদেশ বিভাগের সমর্থনে শিখ ও হিন্দুরা এমন এক আন্দোলনের সৃষ্টি করে যাহার মোকাবিলা করিতে লীগ কর্তৃপক্ষ সাহসই পাইলেন না। শুধু তাহাই নয়, হিন্দু ও শিখদের দাবীর পাল্টা দাবী হিসাবে তাঁহারা মালাবার, যুক্তপ্রদেশ ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার উপরও কোন দাবী উত্থাপন করিলেন না। অথচ তেমন কোন দাবী সে সময় উত্থাপিত হইলে হিন্দু এবং শিখরা হয়ত দাবী প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইত অথবা প্রদেশ বিভাগের বিনিময়ে আসামের একটা বেশ বড় অংশ, যুক্ত প্রদেশের কয়েকটি এলাকাসহ বিহারের মুঙ্গের ও পূর্ণিয়ার একটি অংশ এবং সমগ্র মালাবার মুসলমানদের ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইতে হইত। ইহা হিন্দু ও শিখদের স্বার্থের অনুকূল হইত না। সেই অবস্থায় প্রদেশ বিভাগের অন্যায় দাবীরও হয়ত অপমৃত্যু ঘটিত।

কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে এরূপ একটি জীবন-মরণ প্রশ্নে পর্যন্ত লীগ কর্তৃপক্ষ বড়লাট এবং বৃটিশ সরকারের সদাশয়তার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন। ইহার ফলে বাংলার হিন্দু ও পাঞ্জাবের শিখদের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া লর্ড মাউন্টব্যাটেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় প্রদেশকে বিভক্ত করিয়া দিতে সম্মত হন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রী রাজাগোপালাচারিয়া এবং সেই বৎসরেরই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দু মহাসভার বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং রাজা মহেশ্বর দয়াল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচলাবস্থার পরিসমাপ্তির জন্য প্রথমোক্ত ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদসহ এবং শেষোক্ত দুইজন হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে যে ফর্মুলা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের সমর্থন লাভ করে নাই। এক্ষণে তাহা অপেক্ষা মুসলমানদের জন্য সব দিক দিয়া ক্ষতিকর এবং অবমাননাজনক ব্যবস্থা মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষকে মানিয়া লইতে আহ্বান জানাইয়া, লর্ড মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ সরকারের সহিত সলা-পরামর্শের জন্য ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে লণ্ডন যাত্রা করেন।

প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কিত তাঁহার পরিকল্পনার অনুকূলে বৃটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন সংগ্রহ করিয়া লর্ড মাউন্টব্যাটেন যথাসময়ে ভারতবর্ষে প্রত্যা-

বর্তন করেন। কংগ্রেস ও লীগ-কর্তৃপক্ষের সহিত পৃথক পৃথক এবং যুক্ত আলোচনার পর ২রা জুন তিনি প্রদেশ বিভাগের পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ছাড়া লীগ কর্তৃপক্ষের সম্মুখে তখন আর কোন পথ খোলা ছিল না। তাই তাঁহারা পরিকল্পনাটি মানিয়া লওয়ার জন্য মুসলিম জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া কার্যতঃ পাকিস্তান সংগ্রামের অবসান সূচিত করেন। অবশ্য, ইহার পরও আসামের সিলেট জেলায় এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট গ্রহণের সময় মুসলিম লীগকে প্রচুর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

স্বাধীন বাংলা

বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষে প্রদেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতির কথা চিন্তা করিয়া প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তদানীন্তন প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম সঙ্গে সঙ্গে কায়েদে আজম জিন্নাহর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহারই সম্মতিক্রমে হিন্দুদের নিকট স্বাধীন ও অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেই সময় কলিকাতার অদূরে সৈয়দপুরে অবস্থানরত মহাত্মা গান্ধীর সহিতও এ সম্পর্কে যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছিল। তিনিও ইহার বিরোধিতা করেন নাই। কংগ্রেসের শ্রী শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁহার সমর্থক দল প্রস্তাবটির প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি অত্যন্ত বিলম্বে উত্থাপিত হওয়ায়, শ্রী শরৎচন্দ্র বসুর চেষ্টা সত্ত্বেও, হিন্দুদের একটা বিরাট অংশ বঙ্গভঙ্গের দাবী প্রত্যাহার করিয়া লইতে সম্মত হয় না। পক্ষান্তরে গোপন আলাপ-আলোচনার বিষয় প্রাদেশিক লীগে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরোধী দলটির কানে পৌঁছামাত্রই তাঁহারা ইহাকে পাকিস্তান দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা অভিহিত করিয়া পাল্টা আন্দোলন ও প্রচারণা চালাইতে থাকে। একদিকে হিন্দু মহাসভাপন্থী এবং অন্যদিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরোধী দলটির তীব্র বিরোধিতায় নিরাশ হইয়া শ্রী শরৎচন্দ্র বসু এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহাদের আলাপ-আলোচনার অবসান ঘটাইতে বাধ্য হন।

এই অসমাপ্ত আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু সাধারণ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িলে, আসামের হিন্দুদের একটি অংশ উহাকেও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। এমন কি তাঁহারা স্বাধীন বাংলার স্থলে উহার নূতন নামকরণ করেন, 'বঙ্গাসাম'। কিন্তু এই প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য গ্রহণের পূর্বেই বসু-সোহরাওয়ার্দী আলোচনা ব্যর্থতার পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছিল বলিয়া এ ব্যাপারে আর কোন অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে নাই। প্রস্তাবিত স্বাধীন বঙ্গাসামে মুসলমানদের সামান্য সংখ্যাধিক্য থাকিত। কিন্তু উহার চেয়ে বড় কথা ছিল, ইহাই হইত সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এলাকা। বাঙ্গালী হিন্দুদেরই জেদের জন্য এরূপ একটি মহাপরিকল্পনা নস্যাৎ হইয়া যায়। অনুরূপ উদ্দেশ্যে রচিত অপর কোন পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে অতঃপর প্রদেশ বিভাগ সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

হাস্যকর ব্যবস্থা

পাকিস্তান বা ভারত ইউনিয়নে যোগদানের বিতর্কমূলক প্রশ্নটি বিবেচনা এবং তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাসময়ে বাংলা ও পাঞ্জাব পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উভয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যগণ পাকিস্তানে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলমান সদস্যবৃন্দ একযোগে ভারত ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। ইউরোপীয় সদস্যগণ ভোট দানে বিরত থাকেন। পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রথানুসারে ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে উভয় প্রদেশ অখণ্ডিত আকারে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে যোগদানেরই কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার মেজরিটি ও মাইনরিটি ভোটকে সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করেন। ইহার ফলে উভয় প্রদেশের একটা অংশ অমুসলমানদের হাতে চলিয়া যায়।

ইহার পর পরই মুসলিম অধ্যুষিত অথচ কংগ্রেস শাসিত সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের একমাত্র সিলেট জেলায় গণভোট গ্রহণ করা হয়। এই দুই স্থানেও মোটামুটিভাবে মুসলমানরা পাকিস্তানে এবং অমুসলমানরা ভারত ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে তাহাদের ভোট প্রদান করে। ভোটের

ফলাফল অনুসারে সমগ্র বাংলা, সমগ্র পাঞ্জাব, সমগ্র সিলেট জেলা এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু একমাত্র সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া উপরোক্ত এলাকাসমূহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এই হাস্যকর ব্যবস্থাধীনে মুসলমান অধ্যুষিত বাংলার কয়েকটি জেলা এবং কোন জেলার অংশ-বিশেষ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমাটিও আসামের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই কারণে পূর্ব বাংলা কর্তৃক প্রায়-পরিবেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্যটি আসামের সহিত যোগাযোগের একটি পথ লাভ করে। যেই দাবী বলে হিন্দুরা সিলেট জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া লইতে পারিয়াছে, তদপেক্ষা বলিষ্ঠ দাবী ও যুক্তি বলে মুসলমানরা রংপুর জেলা সংলগ্ন আসামের গোয়ালপাড়া জেলা বিভক্ত করিয়া লইতে পারিত। তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গ হইতে আসাম গমনের সরাসরি কোন পথই থাকিত না। কিন্তু এক্ষেত্রেও লীগ কর্তৃপক্ষের নীরবতার দরুন শুধু যে পূর্ব বাংলা কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হারাইয়াছে তাহাই নয়; উপরন্তু ইহা ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক তিন দিক দিয়া পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রদেশের নিরাপত্তার পক্ষে ইহা চিরকাল একটি হুমকি স্বরূপ হইয়া থাকিবে।

র‍্যাডক্লিফ্ রোয়েদাদ

খণ্ডিত বাংলা, পাঞ্জাব ও সিলেট জেলায় পাকিস্তানী ও ভারতীয় অংশ চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত আইনজীবী স্যার র‍্যাডক্লিফ্ একমাত্র শালিস নিযুক্ত হন। তিনি উভয় পক্ষের দাবী ও পাল্টা দাবীর প্রেক্ষিতে যথাসময়ে তাঁহার রোয়েদাদ প্রদান করেন। এই রোয়েদাদে তিনি বাংলার এমন কতিপয় এলাকা ভারত ইউনিয়নকে প্রদানের প্রস্তাব করেন, যেখানে মুসলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়াও তাহা পূর্ব বাংলারই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। পাঞ্জাবেও তিনি অনুরূপ অন্যায়ভাবে কয়েকটি এলাকা ভারতকে প্রদানের প্রস্তাব করেন। তন্মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত গুরুদাসপুর জেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশ বিভাগের মাত্র চারি মাস পর ভারত সরকার গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট নামক স্থানের সংকীর্ণ এবং

দুর্গম পথে সৈন্য পাঠাইয়া মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। স্মরণ করা যাইতে পারে, আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান সাপেক্ষে কাশ্মীরের মহারাজা দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিত স্থিতিবস্থা চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

স্যার র‍্যাড্‌ক্লিফের পক্ষপাতিত্বমূলক রোয়েদাদের দরুন পাকিস্তানের আয়তন দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ মাইল। পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনার চেয়ে ইহা লক্ষাধিক মাইল কম। পাকিস্তানের এক অংশের সহিত অন্য অংশের সমুদ্রপথে যোগাযোগের জন্য মালদ্বীপ, লক্ষাদ্বীপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইহারই ন্যায্য প্রাপ্য ছিল। এই দ্বীপগুলি শুধু ভারত ইউনিয়নের মূল ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্নই নয়, উপরন্তু দেশ বিভাগের সময় ইহার অধিবাসীর শতকরা ৮০ ভাগ ছিল মুসলমান। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অন্যায়ভাবে এই স্থানগুলি ভারত ইউনিয়নকে প্রদান করায়, স্থল ও আকাশ পথের ন্যায় জলপথেও পাকিস্তানের উভয় অংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য পাকিস্তানকে সব সময় ভারত ইউনিয়নের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে অথবা ভারত ইউনিয়নের তুলনায় পাকিস্তানের নৌবহরকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা একটি অবাস্তব ব্যাপার।

র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই ইংলণ্ডের কমন্স সভায় শ্রমিক সরকার 'ভারতবর্ষ স্বাধীনতা' বিল উত্থাপন করেন। দশ দিন পর ইহা গৃহীত হয়। লর্ড সভার অনুমোদনের পর ১৮ই জুলাই ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ উহাতে স্বীয় স্বাক্ষর প্রদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা কার্যকরী হয়।

ইহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব বাংলার পার্লামেণ্টারী দলের নেতৃত্বের প্রশ্ন উঠে। ইহার মীমাংসার জন্য আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে প্রাদেশিক লীগ পার্লামেণ্টারী দলের একটি সভা আহূত হয়। কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং কিছুটা আক্রোশ বশতঃ সদস্যগণের এক বৃহদংশ উক্ত সভায় জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্থলে জনাব নাজিমউদ্দীনকে নেতা নির্বাচিত করে। দলত্যাগী সদস্যগণের বিশেষ করিয়া ভাবী মন্ত্রিসভার ১১টি পদের

মধ্যে ৭টির দাবীদার সিলেট জেলা হইতে নির্বাচিত সদস্যগণের এই আচরণে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী অতঃপর ভারতেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জনাব নাজিমউদ্দীন সেই সময় পরিষদের সদস্য ছিলেন না। এই নির্বাচনের ফলে বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার তিনিই হন প্রথম প্রধান মন্ত্রী। সরকারী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বণ্টন ব্যবস্থা তদারকতা এবং লীগ মন্ত্রিসভার নিকট হইতে পশ্চিম বঙ্গের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিম বঙ্গের জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল দুইটির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের নিকট ভারতের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিনি আইনতঃ আর ইংলণ্ডের রাজার প্রতিনিধি থাকেন না বলিয়া সে সময় এই মর্মে আর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে, ১৪ই আগস্ট তিনি ভাইসরয় হিসাবে মুসলিম লীগের নিকট করাচীতে এবং ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের নিকট নয়াদিল্লীতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন। ভাইসরয়ের নিকট হইতে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য লীগ কর্তৃপক্ষ কায়েদে আজম জিন্নাহর এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নাম অনুমোদনের জন্য ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারত সম্রাট উভয় নাম অনুমোদন করেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গতভাবে আশা করিয়াছিলেন. তিনি একই সময় অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হইলেও, উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর-জেনারেল থাকিবেন। কায়েদে আজম তাঁহাকে সেই সুযোগ প্রদান না করায় তিনি ক্ষুণ্ণ হন। পাকিস্তানের প্রতি তাঁহার পরবর্তীকালীন মনোভাব দুঃখজনক হইলেও অনেকটা স্বাভাবিক এবং বোধগম্য।

চাকুরী ও সম্পদ বণ্টন

বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড দেশরূপে গড়িয়া তুলিয়া শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ইহাকে এগারটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই এগারটি প্রদেশের বাহিরে ছিল ছোট বড়

প্রায় পাঁচশত দেশীয় রাজ্য, বেলুচিস্তান, আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষা, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থান। মন্ত্রী মিশনের গ্রুপিং সম্পর্কিত সুনারিশে বলা হইয়াছিল গ্রুপিং ব্যবস্থা কার্যকর হইলে পর দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব-ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদান করিবে। ফেডারেল পরিষদে উহাদের আসন সংখ্যা কত হইবে তাহাও সেই সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পাকিস্তান দাবী সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভের কয়েক মাস পূর্বে কেন্দ্রে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। স্বরাষ্ট্র এবং দেশীয় রাজ্য দফতরের ভার পান সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একের পর এক ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানে সম্মত হয়।

দুই মাসকাল বহু চিন্তাভাবনার পর অবশেষে মুসলিম লীগ যখন অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় যোগদান করে তখনও দেশীয় বড় বড় রাজ্যগুলি ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদান হইতে বিরত ছিল। ইহার পর দেশ বিভাগ পরিকল্পনা সম্পর্কিত ঘোষণায় বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে বলা হয়, তাঁহারা আশা করেন, দেশীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া ভারত ইউনিয়ন বা পাকিস্তানে যোগদান করিবেন। কংগ্রেস ও লীগের সম্মতিক্রমে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে বলা হয়, সর্ব-ভারতীয় চাকুরীক্ষেত্রে কর্মচারীদের যে কোন রাষ্ট্রে চাকুরী করিবার অধিকার থাকিবে। পক্ষান্তরে প্রাদেশিক পর্যায়ের চাকুরী সম্পর্কে বলা হয়, বিভক্ত প্রদেশগুলিতে সরকারী চাকুরীরত কর্মচারীরা তাহাদের চাকুরী এক অংশ হইতে অন্য অংশে বদল করিতে পারিবেন। তবে বদলের কথা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পূর্ব-নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জানাইতে হইবে। সর্ব-ভারতীয় চাকুরীক্ষেত্রে চাকুরী বদলের মেয়াদকাল ছিল বৃটিশ সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন হইতে সর্বাধিক ছয় মাস।

সরকারী চাকুরীজীবিদের এই অপশন প্রদানের ফলে হিন্দু কর্মচারীরা প্রথম সুযোগে পাকিস্তান এবং মুসলমান কর্মচারীরা ভারত ইউনিয়নে

ত্যাগ করেন। যেহেতু বিভক্ত অবিভক্ত সকল প্রদেশে হিন্দু কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ছিল, এ কারণে প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রয়োজন অনুপাতে অভিজ্ঞ কর্মচারীর অপ্রতুলতার জন্য পাকিস্তানকে প্রথম কয় বৎসর কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষে অসুবিধার মোকাবিলা করিতে হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন সম্পর্কে স্থিরীকৃত হয়, আপন আপন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা ভারতে স্ব স্ব পদে থাকিতে বা পাকিস্তানের চাকুরীতে যাইতে পারিবেন। সশস্ত্র বাহিনীগুলিতে সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৪ ভাগের সামান্য বেশী। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক পাকিস্তানে আসে নাই। মজুদ অস্ত্রশস্ত্রের এক-চতুর্থাংশ পাকিস্তানকে প্রদানের যেই সিদ্ধান্ত সেই সময় গৃহীত হইয়াছিল, পরবর্তীকালে ভারত তাহা পালন করে নাই। অর্থ বণ্টনের ব্যাপারেও ভারত সরকার একই মনোভাব প্রদর্শন করিতে থাকিলে মহাত্মা গান্ধী হস্তক্ষেপ করেন। ইহার ফলে বিলম্বে হইলেও, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান মোট প্রাপ্যের একটা অংশ লাভ করে।

যাহা হোক, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৪ই আগষ্ট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন করাচীতে লীগ-প্রেসিডেণ্ট ও নবনিযুক্ত গভর্ণর-জেনারেল কায়েদে আজম জিন্নাহর নিকট পাকিস্তান অংশের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাটের নিকট হইতে নিয়োগপত্র পৌঁছার পূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার জন্য কায়েদে আজম জিন্নাহ নয়াদিল্লী হইতে সদলবলে করাচী চলিয়া যান। দেশ এবং প্রদেশ বিভাগ হইতে উদ্ভূত শাসনতান্ত্রিক এবং প্রশাসনিক বহু জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান অংশ হইতে ভারতবর্ষের গণপরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণের একটি জরুরী অধিবেশন আহুত হয়। ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় লীগ-মনোনীত আইন সচিব শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল পাকিস্তান গণপরিষদের এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

এই অধিবেশনে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ব্যতিক্রমে গভর্ণর-জেনারেল কায়েদে আজম জিন্নাহ সর্বসম্মতিক্রমে গণপরিষদেরও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। এরূপে তিনি একই সময় গভর্ণর-জেনারেল, গণপরিষদ ও মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট হন। একই হাতে সংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং দলীয়

রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নাভিঃশ্বাস তখনই আরম্ভ হইয়া যায়। বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য সপ্রমাণের জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল না করা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারত ইউনিয়নের সহিত চুক্তি অনুসারে এবং ইংলণ্ডের রাজার সম্মতিক্রমে পাকিস্তানের সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদটি পান ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক্। তিনি একই সময় ভারত ইউনিয়নেরও প্রধান সেনাপতি থাকেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট প্রাতে তোপধ্বনি সহকারে কায়েদে আজম জিন্নাহর নিকট পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করাচীর আনন্দমুখর অগণিত নরনারী সমস্বরে বলিয়া উঠে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ! সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে কোয়েটায়, পেশোয়ারে, লাহোরে এবং সুদূর ঢাকায়। পর দিবস অনুরূপ উৎসব ও আনন্দের মধ্যে ভারত ইউনিয়নের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তবে বিদায়ী ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে এক্ষেত্রে কাহারও নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হয় না। নূতন গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে তিনি নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করেন মাত্র।

পরাধীনতার অবসান

একশত নব্বই বৎসর স্থায়ী পরাধীনতার অবসান ঘটাইয়া এরূপে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ-সৃষ্ট একটি অখণ্ড ভারতবর্ষকে দুইটি অন্যায্য এবং অসম অংশে বিভক্ত করিয়া অমীমাংসিত মূল সমস্যাগুলির সহিত আরও বহুদিন নূতন নূতন সমস্যা যুক্ত এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলিম বিবাদ-বিসম্বাদকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করিয়া এবং সর্বোপরি ভারত ইউনিয়ন হইতে সব মুসলমান এবং পাকিস্তান হইতে সব হিন্দুকে প্রয়োজনবোধে স্থানান্তরের ব্যবস্থা না রাখিয়া ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রদেশ বিভাগ ও সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁহার পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও, ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হয়, ক্ষমতা হস্তান্তরই শুধু নয়, অধিকন্তু স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারেও তিনি যে আন্তরিকতা, ক্ষিপ্রতা, সদিচ্ছা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি উভয় রাষ্ট্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

মোটামুটিভাবে ইহাই এই বিশাল উপমহাদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার এবং দেশ বিভাগের ইতিহাস। বিদেশীয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আয়োজিত ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদেরই দান ছিল অত্যধিক। এ কারণে ইংরেজ ও তাহাদের হিন্দু দালালদের হাতে সে সময় মুসলমানদিগকে বর্ণনাতীত ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মুসলমানদিগকে সব দিক দিয়া নিষ্পিষ্ট এবং পঙ্গু করিয়া রাখার জন্য ইংরেজরা তাহাদের শাসনামলের প্রথম একশত বৎসর মানবতা-বিরোধী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাহার সামান্য আভাস মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ভেদনীতিরূপ মহাস্ত্রের সুকৌশল প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারা সহস্রাধিক বৎসরের প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন এক সর্বনাশা বিবাদ-বিসম্বাদ জাগাইয়া তোলেন, যাহার ফলে শাসনের নামে নির্মমভাবে শোষণরত বিদেশীয়দের পরিবর্তে হিন্দুরা মুসলমানকে এবং মুসলমানরা হিন্দুকে তাহাদের পরম শত্রু ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে।

বস্তুতঃ এই উপমহাদেশের উপর ইংরেজদের নিষ্ঠুরতম আঘাত ও তাহাদের শাসনামলের সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ ছিল হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য। এই আঘাতজনিত ক্ষতের উপশম এবং অভিশাপ বিমোচন কখন ঘটিবে, কিম্বা আদৌ ঘটিবে কিনা, তাহা আপাততঃ কাহারও পক্ষে বলা সহজ তো নয়ই, সম্ভবপরও নয়। তবে ইহা একটি রূঢ় সত্য যে, Time is the best healer and even the longest dark night has its dawn—অর্থাৎ কালক্রমে মানুষ সবই ভুলিয়া যায়, অমাবস্যার রাত্রি যত দীর্ঘ হোক না কেন উহারও প্রভাত থাকে।

ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায়টি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দানে সমৃদ্ধ। কিন্তু চতুর্থ অর্থাৎ সর্বশেষ পর্যায়ে সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের দান যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। শোষণপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে এদেশ হইতে বিতাড়নের জন্য হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে না হোক্, স্বতন্ত্রভাবেও তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া দীর্ঘ দুই যুগ মুসলমানরা যে বন্ধ্যানীতি অনুসরণ করে, উহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী হিন্দু জনসাধারণের দ্বি-মুখী

আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত বিদায়োন্মুখ ইংরেজ সরকারের কৃপায় ফলদান করিয়াছে সত্য। কিন্তু উহা মুসলমানদের দেশপ্রেম, ত্যাগ ও সাধনার কোন সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ও সহজবোধ্য নিদর্শন বহন করিতেছে না। ধর্মীয় উন্মাদনা ও রেষারেষি হইতে উদ্ভূত দাঙ্গা-হাঙ্গামা যত ব্যাপক এবং রক্তক্ষয়ী হোক্ না কেন, ইহা স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে পড়ে না।

সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭-৫৮) পর সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরা ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে বিশেষ কোন দানের জন্য গর্ববোধ করিতে পারে না। পাকিস্তান আন্দোলনটি ছিল মূলতঃ ভাগাভাগির আন্দোলন। এই আন্দোলনে যাহারা নেতৃত্ব দান করিয়াছেন, সম্মানজনক কতিপয় ব্যতিক্রমকে গণনার বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্টদের সম্পর্কে বলা যায়, ইঁহাদের বৃটিশ-বিরোধী কোন ভূমিকা কখনও ছিল না। অথচ বৃটিশই ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রকার দুর্ভোগের জন্য সর্বতোভাবে দায়ী। বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ঝুঁকি ছিল অনেক। সেই ঝুঁকি গ্রহণ করার মত সাহস ও মনোবলের অভাব মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে ছিল বলিয়াই মুসলিম লীগ ইহার আন্দোলনটি পরিচালিত করে বৃটিশের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামরত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন হিন্দুদের বিরুদ্ধে। রণশ্রান্ত হিন্দুরা দ্বিমুখী সংগ্রামের অবসান ঘটাইবার একমাত্র উদ্দেশ্যে পাকিস্তান দাবী স্বীকার লইতে বাধ্য হয়। সেই হিসাবে পাকিস্তান হিন্দুদের হাতে প্রায়-পরাজিত বৃটিশের অকৃপণ হাতেরই দান। পাকিস্তান অর্জনের জন্য মুসলিম লীগের প্রথম সারির কোন নেতাকে উল্লেখযোগ্য কোন ত্যাগই স্বীকার করিতে হয় নাই। পৃথিবীর কোন পরাধীন দেশ বা স্বাধীনতা প্রয়াসী কোন জাতির ইতিহাসে ইহার নজীর নাই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—Independence got without a real struggle must have something wrong with it—অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ স্বাধীনতার কোন না কোন জায়গায় গলদ থাকিবেই।

পরাধীনতা কখনও অত্যাচার-অবিচার এবং শোষণমুক্ত হয় না। ইংরেজরা এদেশবাসীর উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছেন এবং সারা দেশকে নির্মমভাবে শোষণও করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে তাঁহাদের দানের পরিমাণও মোটেই তুচ্ছ নয়। তাঁহারাই এদেশে মধ্যযুগীয় শাসন-ব্যবস্থার

অবসান ঘটাইয়া একটা বিধিবদ্ধ আইনের শাসন প্রবর্তন করেন। তাঁহাদেরই হাতে এদেশের জনসাধারণের মৌলিক অধিকারসমূহ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পায়। বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তাঁহাদেরই দান। সভ্য জগতে সর্বোৎকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত, পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া তাঁহারাই এদেশ হইতে রাজা-বাদশাহ্, নওয়াব-ডিক্টেটরদের স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই এদেশে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রবর্তন, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে গুণানুসারে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ এবং বিচারকার্যে নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করেন। বস্তুতঃ পরাধীনতার বিনিময়ে ভারতবাসীরা তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছে, উহার মূল্যায়ন এক কথায় সম্ভবপর নয়। তিক্ত অতীতকে ভুলিয়া তাই এই উপমহাদেশে কোটি কোটি লোক চিরকাল তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

